বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

৩১ জানুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

৩১ জানুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কার্যালয়
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: ***bangladeshjrc@gmail.com***; ***info@jrc.gov.bd***

<u>বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ</u>

১.	বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান সাবেক বিচারক আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	কমিশন প্রধান	
২.	বিচারপতি মোঃ এমদাদুল হক সাবেক বিচারক হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য	
৩.	বিচারপতি মোঃ ফরিদ আহমদ শিবলী সাবেক বিচারক হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য	
৪.	মোঃ মাসদার হোসেন সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং *মাসদার হোসেন মামলা*'র বাদী	সদস্য	
৫.	সৈয়দ আমিনুল ইসলাম সাবেক জেলা ও দায়রা জজ ও সাবেক রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য	
৬.	কাজী মাহফুজুল হক সুপণ সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য	
৭.	তানিম হোসেইন শাওন ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য	
৮.	আরমান হোসাইন শিক্ষার্থী আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য (শিক্ষার্থী প্রতিনিধি)	

সংস্কার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোহাম্মদ ফারুক, জেলা ও দায়রা জজ, সচিব, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মোঃ জসিম উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

আফসানা আবেদীন, যুগ্ম জেলা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও উপ-পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মোঃ শামীম সুফী, যুগ্ম জেলা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

মোঃ আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও রিসার্চ এন্ড রেফারেন্স অফিসার, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মোঃ শরিফুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা জজ, কমিশন প্রধানের একান্ত সচিব ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

তানিয়া ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

সংস্কার কমিশনকে সহায়তাকারী শিক্ষার্থী-গবেষকবৃন্দ

মো শাহীন আলম, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ রাব্বি হোসেন, আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সাবা সিদ্দিকী, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবদুর রহিম, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমেনা আক্তার বৃষ্টি, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংকেত-সূচি

a2i	Aspire to Innovate
ADR	Alternative Dispute Resolution
AI	Artificial Intelligence
AJC	Assistance to Justice Commission
API	Application Programming Interface
AR	Augmented Reality
CDMS	Criminal Data Management System
CIS	Criminal Investigation Service
CJM	Chief Judicial Magistrate
CMM	Chief Metropolitan Magistrate
DNA	Deoxyribonucleic Acid
DPP	Development Project Proposal
GIS	Geographic Information System
GP	Government Pleader
GRO	Grievance Redressal Officer
IoT	Internet of Things
JAO	Judicial Administrative Officer
JATI	Judicial Administration Training Institute
JRP	Judicial Enterprise Resource Planning
KOICA	Korea International Cooperation Agency
NAS	National Attorney Service
NOC	No Objection Certificate
ODR	Online Dispute Resolution
PP	Public Prosecutor
TO&E	Table of Organization and Equipment
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
UNDP	United Nations Development Programme
VR	Virtual Reality

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে গঠিত বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং কার্যক্রম বিষয়ক নানা সংস্কার-চিন্তার অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রতিবেদনের পরিসর একটু বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রতিবেদন কমিশনের সদস্যগণের চিন্তা, মেধা, মনন এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল; তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন।

বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে কমিশনের মতবিনিময় সভায় ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে অংশ নেন ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার জেলা পর্যায়ের বিচারকবৃন্দ, সুপ্রীম কোর্টসহ জেলা পর্যায়ের আইনজীবীগণ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণ, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি, কারাগার ও প্রবেশন সেবার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধি, মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, প্রমুখ। তাছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং পেশাজীবী সংগঠন, আমেরিকান দূতাবাসের উদ্যোগে সে দেশের প্রসিকিউশন সার্ভিসের বিশেষজ্ঞগণ এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশাজীবী সংগঠন তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যবান মতামত দিয়ে সংস্কারের অনেক নতুন ধারণার অবতারণা করে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। কমিশন প্রকাশিত প্রশ্নমালা পূরণ করে, ইমেইলের মাধ্যমে এবং ডাকযোগে দেশের সাধারণ নাগরিক, আইনজীবী, বিচারক ও আদালতের সহায়ক কর্মচারিবৃন্দ তাঁদের সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষেত্র প্রকাশ করে আমাদের সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

নিরবচ্ছিন্ন দাপ্তরিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনকে সহায়তা দিয়ে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভা আয়োজনে এবং গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)-কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যেসব কর্মকর্তা আমাদের সাচিবিক, দাপ্তরিক এবং গবেষণা সেবা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের সদস্যদের যাঁরা তাঁদের সংস্কারের ধারণা বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং একই সাথে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন। পারস্পরিক মতবিনিময়ের এই উদ্যোগে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের বিভিন্নমুখী সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ এবং দেশের জনগণ উপকৃত হলে কমিশনের প্রচেষ্টা অর্থবহ হবে। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সংস্কারের হাত ধরে ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন সংস্কারের ক্ষেত্র তৈরি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান
সাবেক বিচারক, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
প্রধান, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

সূচিপত্র

১.		সংস্কার প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ	১
২.	*প্রথম অধ্যায়*	ভূমিকা	৯
৩.	*দ্বিতীয় অধ্যায়*	বিচার বিভাগ সংস্কারের ধারণা	১১
৪.	*তৃতীয় অধ্যায়*	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও শৃঙ্খলা	১৫
৫.	*চতুর্থ অধ্যায়*	অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি	২৭
৬.	*পঞ্চম অধ্যায়*	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়	৩৩
৭.	*ষষ্ঠ অধ্যায়*	আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ	৪৩
৮.	*সপ্তম অধ্যায়*	স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস	৪৯
৯.	*অষ্টম অধ্যায়*	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন	৬৩
১০.	*নবম অধ্যায়*	স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস	৬৭
১১.	*দশম অধ্যায়*	বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী	৭৯
১২.	*একাদশ অধ্যায়*	অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো	১০৭
১৩.	*দ্বাদশ অধ্যায়*	বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা	১২৭
১৪.	*ত্রয়োদশ অধ্যায়*	বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১৩৫
১৫.	*চর্তুদশ অধ্যায়*	অধস্তন আদালতের ভৌত অবকাঠামো	১৪৯
১৬.	*পঞ্চদশ অধ্যায়*	আদালত ব্যবস্থাপনা	১৫৭
		প্রথম পরিচ্ছেদ: সুপ্রীম কোর্ট ব্যবস্থাপনা	১৫৭
		দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অধস্তন আদালতের ব্যবস্থাপনা	১৬৭
১৭.	*ষোড়শ অধ্যায়*	বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব	১৭৫
১৮.	*সপ্তদশ অধ্যায়*	বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ	১৮৩
১৯.	*অষ্টাদশ অধ্যায়*	আইনগত সহায়তা কার্যক্রম	১৮৯
২০.	*ঊনবিংশ অধ্যায়*	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি	২০৩
২১.	*বিংশ অধ্যায়*	মামলাজট হ্রাস	২১৩
২২.	*একবিংশ অধ্যায়*	গ্রাম আদালত	২১৯
২৩.	*দ্বাবিংশ অধ্যায়*	মোবাইল কোর্ট	২২৫
২৪.	*ত্রয়োবিংশ অধ্যায়*	আইনের সংস্কার	২২৯
২৫.	*চতুর্বিংশ অধ্যায়*	বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণ	২৪১
২৬.	*পঞ্চবিংশ অধ্যায়*	আইন পেশার সংস্কার	২৪৫
২৭.	*ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়*	আইন শিক্ষার সংস্কার	২৫১
২৮	*সপ্তবিংশ অধ্যায়*	মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ	২৫৩
২৯.	*অষ্টাবিংশ অধ্যায়*	বিচারহীনতার সংস্কৃতি	২৫৭
৩০.	*ঊনত্রিংশ অধ্যায়*	বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ	২৬১
৩১.	*ত্রিংশ অধ্যায়*	সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন	২৬৩
৩২.	*একত্রিংশ অধ্যায়*	জনমত জরিপের ফলাফল	২৬৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	২৮১
পরিশিষ্ট ২	বিচার বিভাগ স ংস্কার কমিশনের সাথে অংশীজনের সভা	২৮২

পরিশিষ্ট ৩	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪ (খসড়া)	২৮৪
পরিশিষ্ট ৪	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (খসড়া)	২৯৪
পরিশিষ্ট ৫	আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)	৩০২
পরিশিষ্ট ৬	কমিশনের তিন জন সদস্যের ভিন্নমত	৩২৪
পরিশিষ্ট ৭	প্রশ্নমালা: সাধারণ নাগরিক	৩২৮
পরিশিষ্ট ৮	প্রশ্নমালা: বিজ্ঞ বিচারক	৩৩২
পরিশিষ্ট ৯	প্রশ্নমালা: বিজ্ঞ আইনজীবী	৩৩৮
পরিশিষ্ট ১০	প্রশ্নমালা: সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী	৩৪৩
পরিশিষ্ট ১১	প্রশ্নমালা: সহায়ক কর্মচারি	৩৪৮

সংস্কার প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ

১. সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও শৃঙ্খলা

১.১ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের প্রাধান্য এবং আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীনতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিধান প্রণয়ন।

১.২ যথাসম্ভব স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের জন্য প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট "সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন" গঠনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন।

১.৩ প্রণীত আইনের অধীনে গঠিত কমিশন কর্তৃক উন্মুক্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই এবং সুপারিশ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগ।

১.৪ সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, সাবেক বিচারক এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ।

১.৫ রাষ্ট্রপতির নিকট হতে প্রাপ্ত অনুরোধ ছাড়াও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা কাউন্সিলকে প্রদান।

২. অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪ বিধির অধীনে পে-কমিশন গঠন এবং বিচারকদের বেতন-ভাতাদি সংক্রান্তে নতুন সুপারিশ প্রণয়ন, বিচারকদের জন্য আচরণবিধি ও বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিচারকদের মর্যাদা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনক্রমে পৃথক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরিসহ শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে এসবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সুপ্রীম কোর্টের অধীনে আনয়ন। সে উদ্দেশ্যে বিচার-কর্মবিভাগের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন। সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের আওতায় বিচার-কর্মবিভাগের বিচারক ও কর্মচারিদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. আদালতের বিকেন্দ্রিকরণ

৪.১. সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধনীর মাধ্যমে রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। তবে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) এমনভাবে বজায় রাখতে হবে, যেন স্থায়ী বেঞ্চগুলো স্থাপনের কারণে দেশের সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার কোন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিভাজিত (fragmented) না হয়, এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুণ্ন না হয়।

৪.২. উপজেলা সদরের ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, জেলা-সদর থেকে দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিন্যাস এবং মামলার চাপ বিবেচনা দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সিনিয়র সহকারি জজ ও প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত স্থাপন।

৫. স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস

৫.১ সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন এবং উক্ত সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব।

৫.২ অ্যাটর্নি সার্ভিসকে একটি স্থায়ী পেনশনযোগ্য সরকারি চাকরি হিসাবে প্রতিষ্ঠা। সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান সম্বলিত আইন প্রণয়ন। পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট বরাদ্দ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা রাখা।

৫.৩. প্রস্তাবিত সার্ভিসের দুটি শাখা থাকবে: (ক) সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং (খ) সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং জেলা অ্যাটর্নি সমন্বয়ে গঠিত জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস।

৫.৪ ক্রান্তিকালীন বিধান রাখা যেন প্রস্তাবিত রূপরেখা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেও অ্যাটর্নি সার্ভিস কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

আদালত কর্তৃক চূড়ান্তভাবে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি বা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শনের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বোর্ড প্রতিষ্ঠা, যার সুপারিশের ভিত্তিতে ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৭. স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস

৭.১ সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা বর্তমানে বিভিন্ন তদন্ত ইউনিটে নিয়োজিত জনবলের সমন্বয়ে একটি পৃথক তদন্ত সার্ভিস গঠন। সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত সার্ভিসকে কার্যকর করার জন্য যাবতীয় বিধান, যতদূর সম্ভব, মূল আইনেই অন্তর্ভুক্তকরণ। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং অন্যান্য যেসব আইনে ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের উল্লেখ আছে সেসব আইনে সংশোধনী আনয়ন এবং ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন ও ১৯৪৩ সালের পুলিশ প্রবিধানমালা সংস্কার।

৭.২ এই সার্ভিস হবে পুলিশ বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি, নিয়ন্ত্রণ, বাজেট, অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভুক্ত হবে। দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সার্ভিস স্বাধীন থাকবে।

৭.৩ এই সার্ভিস গঠনের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে পুলিশ কর্মকর্তাগণকে প্রেষণে নিয়োগ ও আত্মীকরণ।

৭.৪ তদন্ত সার্ভিস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দ্বারা পরিচালিত হলেও এর কর্মকর্তারা যাতে রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার না হন, তার জন্য একটি উচ্চতর কমিশনের পূর্বানুমোদন ছাড়া তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।

৮. বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী

৮.১ প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সংবিধানের বিধানগুলো সংশোধন, যার মধ্যে রয়েছে: অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) (রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমিত করে নিয়োগ কমিশনকে ক্ষমতায়িত করা), ৫৫(২) (প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা থেকে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের বিষয়কে পৃথক করা), ৯৪ (বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির মতকে প্রাধান্য দেয়া এবং আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন করা), ৯৫ (রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন, অর্থাৎ, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির কোনো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকবে না বা নির্বাহী বিভাগের কোনো প্রভাব থাকবে না।

৮.২ বিচারক হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতা পরিবর্তন, যথা: প্রার্থীকে কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর হতে হবে। বিচারকদের অবসরের বয়স বিদ্যমান ৬৭ বছরের পরিবর্তে ৭০ করা যা ভবিষ্যতে নিযুক্ত বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিদ্যমান ১০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে ১৫ বছরের পেশাগত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা)। সংবিধানে নতুন বিধান ৯৫ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ কমিশন এর বিধান করা।

৮.৩ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪ক অনুচ্ছেদ সংযোজনসহ বিচার বিভাগকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিধানাবলি সংশোধন।

৯. অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো

মামলা ও জনসংখ্যার আলোকে অধস্তন আদালতের বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। একই ধরনের আদালতের জনবল কাঠামো এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির ধরনে অভিন্নতা আনয়ন এবং বিচারকদের পদ সৃজনে পদ্ধতিগত জটিলতা দূরীকরণ। পৃথক বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা। একই গ্রেডভুক্ত সহায়ক কর্মচারিদের জন্য একই ধরনের যোগ্যতার ভিত্তিতে একই পদ্ধতিতে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক নিয়োগ।

১০. বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা

১০.১ বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি কমিটি থাকবে এবং সেই কমিটিতে নির্বাহী বিভাগের প্রতিনিধিরা সদস্য হিসাবে থাকবে। বরাদ্দকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করা এবং তা উপযোজন এবং পুনঃউপযোজনের পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদানসহ সুপ্রীম কোর্টের জন্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দকরণ। বিচার বিভাগের বাজেট বৃদ্ধি।

১০.২ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের পারিতোষিক, বিশেষাধিকার ও অন্যান্য ভাতা নির্ধারণ, পরিবর্তন ও সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন।

১০.৩ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনকে স্থায়ীরূপ দান।

১১. বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১১.১ প্রথম পর্যায়ে বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন। ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়ন। দেওয়ানি আদালতে ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম শুরু করা। ই-ফাইলিং এর মামলাগুলোকে কোর্ট-ফি হ্রাস/ছাড় ও ফাস্ট ট্রাকের মাধ্যমে দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ই-ফাইলিংকে উৎসাহিত করণ। সকল আদালতে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সহ সকল কোর্ট-ফি, খরচ, জরিমানা ও অন্যান্য ফি পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করণ। শতভাগ মামলার তথ্য ই-কজলিস্ট মডিউলের মাধ্যমে প্রদর্শন। সাক্ষ্যগ্রহণ, আসামীর হাজিরাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন।

১১.২ দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আদালতের কার্যক্রমের ৫০% ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ।

১১.৩ তৃতীয় পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায়দ্বয়ে চালুকৃত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহকে এই পর্যায়ে সময়োপযোগীকরণ (Update), বর্ধিতকরণ (Enhancement) এবং শতভাগ কার্যকর করা।

১২. অধস্তন আদালতের ভৌত অবকাঠামো

১২.১ ভবন নির্মিত হয়নি এমন ৩৭টি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ভবন নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্তে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ, এবং প্রকল্পের সুপারিশের ভিত্তিতে যেসব ক্ষেত্রে ভবনের ঊর্ধ্বমুখী

সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা।

১২.২ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যে ২৩টি জেলায় এখনো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়নি সেগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ; যে ৫ জেলায় অদ্যাবধি জমি অধিগ্রহণ হয়নি সেগুলোর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু।

১২.৩ দেশের ২০টি জেলার আওতাধীন ৩৪টি উপজেলায় অবস্থিত ৫১ টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ। জেলা জজ আদালতের আওতাধীন ৬৬টি এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতাধীন ৬৪টি আদালতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এজলাস নির্মাণ।

১২.৪ মহানগর দায়রা জজ এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য পৃথক আদালত ভবন স্থাপন। আদালতের নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ও জিআরও শাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ ও প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করা। বিচারকদের আবাসনের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স স্থাপন করা।

১২.৫ প্রতিটি আদালত প্রাঙ্গণে সাক্ষীদের অপেক্ষার জায়গা নির্ধারণ এবং এজলাসে বসার ব্যবস্থা করা। আদালতের হাজতে (পুরুষ ও মহিলা) হাজতিদের বসার ব্যবস্থা করা। প্রতিটি আদালত প্রাঙ্গনে নারী ও শিশুদের জন্য উপযোগী শৌচাগার ও অপেক্ষাগার স্থাপন করা। কোন এজলাসে আসামীদের জন্য এখনো লোহার খাঁচা থেকে থাকলে তা অপসারণ করা। বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে আদালত ভবনের নিচতলায় 'তথ্য ডেস্ক' স্থাপন করা।

১৩. আদালত ব্যবস্থাপনা

সুপ্রীম কোর্ট

১৩.১ আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বিশেষত আপীল বিভাগে সকল সময় ন্যূনতম ৩টি বেঞ্চ পরিচালনা নিশ্চিত করা।

১৩.২ যৌক্তিক সময়ের মধ্যে মামলার নোটিশ জারি ও শুনানির জন্য প্রস্তুতকরণ নিশ্চিত করার জন্য ডাক বিভাগের সাথে যৌথ আয়োজনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নোটিশ ফেরৎ আসা নিশ্চিত করা।

১৩.৩ অনলাইনে মেনশন–স্লিপ জমা নেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে এ কারণে আইনজীবীদের ও আদালতের সময় নষ্ট না হয় এবং আদালতের কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পায়। হাইকোর্ট বিভাগে মামলা নিবন্ধনে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ।

১৩.৪ বেঞ্চ পুনর্গঠন বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, যাতে করে বেঞ্চ পুনর্গঠনের আগে সংশ্লিষ্ট বিচারক বা বিচারকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবহিত করা যায়।

১৩.৫ আপীল বিভাগের চেম্বার আদালতের এখতিয়ারে পরিবর্তন আনা, যাতে সুনির্দিষ্ট ও অতি জরুরি বিষয় ছাড়া স্থগিতাদেশের আবেদন নিয়মিত বেঞ্চ থেকে নিষ্পত্তি হয়।

১৩.৬ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব পোর্টালের ব্যবহার সম্প্রসারণ করে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের প্রত্যেকটি আদেশ ও রায়ের ইলেকট্রনিক কপি অনলাইনে প্রাপ্তিযোগ্য করা।

১৩.৭ হাইকোর্টের মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

১৩.৮ আপীল বিভাগে আইনজীবী নিবন্ধনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা।

১৩.৯ প্রযোজ্য বিধিমালা, নির্দেশনা ইত্যাদি সমন্বয়ে বাংলায় ম্যানুয়াল প্রকাশ।

অধস্তন আদালত

১৩.১০ প্রকাশ্য আদালতে রায় ও আদেশ ঘোষণা এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ওয়েব সাইটে উক্ত রায় বা আদেশের কপি আপলোড করা।শতভাগ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিদের সাক্ষ্য সুপ্রীম কোর্টের গাইডলাইন অনুসারে অনলাইনে গ্রহণ।

১৩.১১ সমন জারি কার্যকর করার জন্য পোস্টাল এ্যাক্ট এর সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন। দেশের প্রতিটি আদালতে প্রোগ্রামারসহ অন্যান্য আইটি স্পেশালিস্ট এর পদ সৃজন এবং উক্ত পদে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান।

১৩.১২ আদালতে Judicial Administrative Officer (JAO) এর পদ সৃষ্টি। আদালতের রেজিস্টারগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ।
১৩.১৩ সিকিউরিটি/মার্শাল সার্ভিসের প্রচলন।

১৪. বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব

বিচারকদের ছুটি, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, আদালতে প্রকাশ্যে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা না করা, আইনজীবীর মৃত্যুতে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিচারপ্রার্থীগণ যে হয়রানির শিকার হন, তার প্রতিকার বিধান।

১৫. বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ

১৫.১ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন সকল পর্যায়ের বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুর্নীতি বিরোধী সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আচরণবিধিমালা প্রণয়ন। প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ এবং তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা।
১৫.২ প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে এবং অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রে জেলা আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
১৫.৩ সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিখিতভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এর কাছে পৌছানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের জন্য ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা।
১৫.৪ অধস্তন আদালতে কর্মরত বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা। তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রতি ৩ মাস পর পর সিদ্ধান্ত প্রদান। তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ জানানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সকল অভিযোগ পর্যালোচনা করা এবং অভিযুক্ত কর্মকতা-কর্মচারির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।
১৫.৫ অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা এবং ই-মেইলের মাধ্যমে দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি যেন তাঁর অভিযোগ জানাতে পারে, সে জন্য জনসাধারণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস (যা প্রতিটি জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য আলাদা হবে) প্রদান করা।
১৫.৬ আইনজীবীগণের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় পৃথক পৃথক অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা।
১৫.৭ বিচারাঙ্গণে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু করা।

১৬. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

১৬.১ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিতক্রমে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার বিধান সম্বলিত একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সন্নিবেশিত করে আইনের একটি খসড়া সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১৬.২ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মেডিয়েশন কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিককরণের লক্ষ্যে সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তরকরণ।

১৭. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১৭.১ মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-Case Mediation) ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-Case Mediation) এর ক্ষেত্রে পরিচালনার কার্যপ্রণালীসহ অন্যান্য পদ্ধতিগত বিষয় নির্ধারণের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা। মধ্যস্থতাকারীদের ফি পরিশোধের বিধান ও নিয়মাবলি সম্বলিত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১৭.২ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অবিলম্বে বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রস্তাবিত সালিস আইনের সংশোধনীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অংশীজনদের সাথে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭.৩ সালিসের মূল ধারণা, তথা সালিস আইন ২০০১ এর সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও বিধানগুলোকে (যেমন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩-এর ৪০ ধারা, গ্যাস আইন, ২০১০ ও বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১-এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সগুলোর বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান) সংশোধন করা যাতে বাণিজ্যিক সালিসের সুযোগ সংকুচিত না হয়। সালিস আইন ২০০১ -এর অধীনে পরিচালিত সালিসের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিধিমালা প্রণয়ন করা ।

১৭.৪ এডিআর বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৮. মামলাজট হ্রাস

১৮.১ অধিক সংখ্যক ফৌজদারি আপীল, ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি আপীল ও দেওয়ানি রিভিশন নিষ্পন্নাধীন আছে এরূপ জেলায় অবসরপ্রাপ্ত সৎ, দক্ষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জেলা জজগণকে ২/৩ বছরের মেয়াদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা।

১৮.২ বিচার শুরু হয়ে গেছে অথচ দীর্ঘদিন সাক্ষী আসছে না বিধায় অনিষ্পন্ন আছে এরূপ মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৯ ও ২৬৫জ ধারা আইন অনুসারে সাক্ষ্য কার্যক্রম বন্ধ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

১৮.৩ পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ত্বরিত ও দক্ষ সেবা পাওয়ার জন্য পিপি/জিপি-গণের জন্য সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল এর সমমর্যাদার আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তার (এডিশনাল পিপি/জিপি ইত্যাদি) জন্য যুক্তিসঙ্গত হারে পারিশ্রমিক এর ব্যবস্থা করা। ভাড়ার ভিত্তিতে তাদের জন্য ভৌত অবকাঠামো, বিশেষত অফিসের ব্যবস্থা করা।

১৮.৪ সংশ্লিষ্ট আদালতের বাইরে অবস্থানরত সাক্ষীদের ই-টেকনোলজির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ রাখা। এ বিষয়ে সাক্ষ্য আইন ও সুপ্রীম কোর্টের ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৪৯০এ, এর মাধ্যমে প্রকাশিত প্র্যাকটিস ডাইরেকশন প্রতিপালন করা।

১৯. গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ। গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মান রক্ষার জন্য করণীয় নির্ধারণ। গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা। গ্রাম আদালতের উপর বিচারিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এর সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা।

২০. মোবাইল কোর্ট

আপীল বিভাগের বিচারাধীন মামলার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে মোবাইল কোর্টের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা সংশোধন করে শুধুমাত্র জরিমানা প্রদানের বিধান করা এবং বিভিন্ন আইনে বর্ণিত ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

২১. আইনের সংস্কার

২১.১ ফৌজদারি আইনে বিদ্যমান জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের শাস্তি প্রদান ও জরিমানা করার এখতিয়ার বৃদ্ধিকরণ।

২১.২ বাদীর আরজি ও বিবাদীর জবাবের বক্তব্য এফিডেভিট এর মাধ্যমে প্রদানের বিধান করার উদ্দেশ্যে আইন সংশোধন। দেওয়ানি মামলার বিচারপূর্ব এবং বিচার শুরুর পরবর্তী স্তরগুলোর বিধান যথাযথ সংশোধন।
২১.৩ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি, আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ, সাক্ষী ও ভিকটিমের সুরক্ষা, দণ্ড শুনানি, সাজা প্রদানের নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন।

২২. বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণ

২২.১ বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষনের জন্য একটি জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা। আঞ্চলিক পর্যায়ে জুডিসিয়াল ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন। বিচারকগণের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ।
২২.২ বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন কোর্স চালু করা। বিদেশের জুডিসিয়াল একাডেমিগুলোতে বিচারকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি জুডিসিয়াল রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। গবেষণালব্ধ ফলাফল বিবেচনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আওতাধীনে পৃথক 'পলিসি রিসার্চ ও রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা।

২৩. আইন পেশার সংস্কার

২৩.১ আইনজীবীদের সনদপ্রাপ্তির পরীক্ষার সিলেবাসে নতুন আইন সংযোজন। পেশাগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন। পেশাগত বিধিমালা Canons of Professional Conduct and Etiquette কে যুগোপযোগী করা।
২৩.২ বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের সংজ্ঞা স্পষ্টীকরণ। ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঢাকায় স্থায়ীভাবে ৫ টি এবং ঢাকার বাইরে প্রতিটি জেলায় একটি করে ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা। ট্রাইব্যুনালের গঠন সংশোধন করে সেখানে একজন বিচারক এবং দুইজন আইনজীবী সদস্য নিয়োগদান।
২৩.৩ আইনজীবীর ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি লিখিত চুক্তি থাকা এবং এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবার ফি পরিশোধের পর মক্কেলকে একটি রসিদ প্রদানের বিধান করা।
২৩.৪ আইনজীবী সমিতিগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা যেন তারা রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

২৪. আইন শিক্ষার সংস্কার

২৪.১ আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন দেখভালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র আইন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা। উক্ত বোর্ড কর্তৃক আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২৪.২ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন (সম্মান) কোর্সে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালুকরণ। কোর্ট ভিজিট, মুটিং, ল' ক্লিনিকের পাশাপাশি গবেষণার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করে আইন শিক্ষার পাঠ্যসূচির আধুনিকায়ন। আইন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে উৎসাহিত করা, কিন্তু বাধ্য করা নয়।
২৪.৩ মাধ্যমিক শ্রেণিতে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা এবং উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে আইনকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

২৫. মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ

২৫.১ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ বিষয়ে একটি বাস্তবানুগ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিবিড় ও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২৫.২ ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারার অনুরূপ একটি বিধান উক্ত কার্যবিধির ২৩ অধ্যায়ে (দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার) সন্নিবেশ করা। ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারায় উল্লিখিত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করণ।
২৫.৩ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকলে (বিশেষতঃ এজাহারে অস্বাভাবিক সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম থাকলে), অপরাধ সংঘটনে কোনো আসামীর সুনির্দিষ্ট কোনো ভূমিকার উল্লেখ

এজাহারে না থাকলে সেই আসামীকে গ্রেফতার করা হবে না এই মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুলিশের প্রতি নির্দেশনা জারি।

২৫.৪ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করা যায় এরূপ মামলায় কোনো আসামী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলে পাবলিক প্রসিকিউটর বা ক্ষেত্রমত, কোর্ট ইন্সপেক্টর বা কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর, আদালতে ওই আসামীর জামিনের বিরোধীতা করবে না এই মর্মে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাবলিক প্রসিকিউটরদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান।

২৫.৫ কোন আইনজীবী বিচারিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে (যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট কোন কার্যধারা গ্রহণ করলে বা জামিনের আবেদন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করলে আদালতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়া বা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি) তার বিরুদ্ধে পেশাগত আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে কার্যধারা সূচনা করা হবে এই মর্মে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিটি বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সকল আইনজীবীকে সতর্ককরণ।

২৫.৬ ইতোমধ্যে যে সব মামলা পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দায়ের হয়েছে এবং তদন্তাধীন আছে সেগুলোর তদন্ত যাতে দ্রুত সম্পন্ন করে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হয় বা চার্জশীটে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার (নট সেন্ট আপ) আবেদন করা হয়, সে জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান।

২৫.৭ উল্লিখিত দফার কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতি বিভাগে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা যাতে কোনো প্রকৃত অপরাধী পুলিশের সাথে যোগ-সাজশের মাধ্যমে মামলা থেকে অব্যাহতি না পায়।

২৬. বিচারহীনতার সংস্কৃতি

রাষ্ট্রে এমন অনেক অপরাধ সংঘটিত হয় যার বিচার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই থাকে। এসব অপরাধের প্রতিকার বিধান না হওয়ায় অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে এবং আইন মানার প্রতি সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের কোন দায়িত্ববোধ জন্মে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

২৭. বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণের উদ্দেশ্যে আদালত প্রাঙ্গনে আইনজীবী বা অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল কর্তৃক সব ধরনের সভা-সমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং বিচারাঙ্গনে আইনজীবীদের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিরুৎসাহিতকরণ। বার সমিতি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করা।

২৮. সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন

অপরাধ সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সামগ্রিক অধঃপতন। তাই অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনতে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পরিবার, স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নত নৈতিকতার চর্চা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১. কমিশন গঠন, দায়িত্ব ও মেয়াদ

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ ছিল আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর পার্থক্য। এই বাস্তবতায় ৩ অক্টোবর ২০২৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি গেজেট প্রজ্ঞাপনের[১] মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং বিচার বিভাগকে *'স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর'* করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রজ্ঞাপনে সুনির্দিষ্টভাবে কমিশনের কার্যকাল নির্দিষ্ট করা হয় কমিশন গঠনের তারিখ হতে ৯০ দিন। পরবর্তীতে গত ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের অপর একটি প্রজ্ঞাপন[২] দ্বারা কমিশনের মেয়াদ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

২. কমিশনের বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ

বিচার বিভাগের বহুমাত্রিক ও জটিল কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে কমিশন বিচার বিভাগ সংস্কারের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নির্ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ বলতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচারিক কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠান এবং বিচার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, সংবিধানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত বিধান, সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জনবল, আর্থিক এবং ভৌত ও লজিস্টিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সমাজে বিরোধ যাতে নিম্নতম পর্যায়ে থাকে সেরূপ মানসিকতা গঠন ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

৩. কমিশনের কার্যক্রম

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কমিশন নিয়মিত সভায় মিলিত হয়।[৩] এছাড়া দেশি-বিদেশি অংশীজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, অন্য কয়েকটি সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময় করে, এবং ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটে বৃহৎ পরিসরে তিনটি অংশীজন মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।[৪] স্থানীয় পর্যায়ে কমিশনের প্রতিনিধিরা সিলেট ও রাজশাহীর জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁরা আদালতের অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ করেন ও বিচারপ্রার্থী জনগণ, আদালতের কর্মচারি, দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য এবং বিচারকগণের সাথে মতবিনিময় করেন। সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন ওয়েবসাইটে (www.jrc.gov.bd) প্রকাশিত পাঁচটি পৃথক প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংস্কার বিষয়ে সাধারণ নাগরিক, বিচারক, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, অন্যান্য আইনজীবী ও আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের মতামত

---

[১] এস.আর.ও. নম্বর ৩৩১-আইন/২০২৪, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০৩ অক্টোবর, ২০২৪

[২] এস.আর.ও. নম্বর৫-আইন/২০২৫, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০২ জানুয়ারি, ২০২৫

[৩] নিয়মিত সভার তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

[৪] মতবিনিময় সভার তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

সংগ্রহ করে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে, ডাকযোগে ও কমিশনের কার্যালয়ে সরাসরি অংশীজনদের লিখিত মতামত গ্রহণ করে[৫]।

৪. প্রতিবেদন প্রস্তুতি

কমিশনের নিজস্ব গবেষণা, প্রাপ্ত মতামতের বিশ্লেষণ, কমিশনের সদস্যদের মতামত ও সেসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে কমিশন বিষয়-ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সংস্কার বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবের সমন্বয়ে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে।

[৫] একত্রিংশ অধ্যায় দেখুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিচার বিভাগ সংস্কারের ধারণা

১. প্রশ্নবিদ্ধ বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের পরিধি

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুসারে কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে 'একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর' বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করা। স্পষ্টতই এর অর্থ হচ্ছে, উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে, দেশের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং, বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিচার সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলোর উপর এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা ও প্রস্তাব করা হয়েছে। ধারণাগুলো নিম্নরূপ:

(ক) ন্যায়বিচারের ধারণা
(খ) উদ্ভূত মামলার উৎস
(গ) মানব কল্যাণমুখী আইন
(ঘ) প্রযোজ্য আইন অবহিতকরণের সুযোগ
(ঙ) বিচারে অভিগম্যতা ও আদালতের বিকেন্দ্রিকরণ
(চ) বিবাদী বা অভিযুক্তকে শ্রবণ
(ছ) বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা
(জ) বিচারিক সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা, যৌক্তিকতা ও বৈধতা
(ঝ) বিচারকের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা
(ঞ) বাজেট, সহায়ক জনবল ও আদালত ব্যবস্থাপনা
(ট) বিচার বিভাগের কার্যকরতা

২. ন্যায়বিচারের ধারণা

একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন হয় বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদানের, যার লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বৃহত্তর আঙ্গিকে সেটা এক ধরনের সেবা। কিন্তু 'ন্যায়বিচার' (Justice) এর সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। দার্শনিক ও আইনবেত্তাগণ যুগ যুগ ধরে নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচারকে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ, যেমন- ন্যাচারাল জাস্টিস (Natural Justice), ইকুইটেবল জাস্টিস (Equitable Justice), সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice), ডিসট্রিবিউটিভ জাস্টিস (Distributive Justice), আইনানুগ বিচার (Justice according to Law), আইনের শাসন (Rule of Law) ইত্যাদি। এ সকল ধারণা (Concept) বিষয়ে রয়েছে নানান বিতর্ক।

তবে নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত এই দেশে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের প্রধান নির্দেশিকা হবে কোনো একটি তত্ত্বভিত্তিক ন্যায়বিচার নয়, বরং মানব কল্যাণমুখী ও বাস্তবসম্মত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় উল্লিখিত অভিব্যক্তিগুলোর মধ্যে 'Justice according to law' শব্দগুচ্ছ একটি বাস্তবমুখী ধারণা। এই অভিব্যক্তিতে নিহিত রয়েছে ন্যায়বিচার ও বাস্তবসম্মত বিচার ব্যবস্থার প্রধান আদর্শিক উপকরণগুলো, যথা– মানব কল্যাণমুখী আইন, বিচার প্রক্রিয়ায় আইন প্রয়োগে ন্যায্যতা (Fairness), স্বচ্ছতা, যৌক্তিকতা

(Reasonableness) এবং বাস্তবায়নযোগ্যতা। অর্থাৎ, বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে আইন অনুসারে সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন এবং বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটা অর্জনের জন্য বিচার প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করা।

৩. মামলার উৎস

এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অতিমাত্রায় ঘনবসতিপূর্ণ, স্বল্প আয়তন ও স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ বিশিষ্ট একটি দেশ। এখানে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, বন্যাজনিত ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ইত্যকার নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভাব হয় প্রায়শই। আবার বিপুল জনসংখ্যার অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং বেকার। এরকম একটি দেশে সাধারণ জীবন-যাপন এমনকি বেঁচে থাকাও প্রতিনিয়ত একটি চ্যালেঞ্জ। নৈতিকতার মানদণ্ডেও এদেশের অবস্থান পেছনের সারিতে। তাই অবধারিতভাবে দেখা দেয় নানা ধরনের স্বার্থের সংঘাত, আইনের লংঘন এবং অপরাধ। এসব পরিস্থিতির কিছু অংশ আদালতে আসে মামলা আকারে বিচারপ্রাপ্তির প্রত্যাশায়। সুতরাং বলা চলে, বর্তমানে বিচারাধীন প্রায় ৪৩ লাখ মামলার উদ্ভব হয়েছে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, এর একটা অংশের উৎপত্তি হয় বিচার প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে।

৪. মানবকল্যাণমুখী আইন

একটি আধুনিক ও ইপ্সিত বিচার প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানব কল্যাণমুখী আইন এবং তার সঠিক প্রয়োগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা। আমাদের দেশে সংবিধান দ্বারা এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রধানত সংসদের উপর। । সর্বোচ্চ আইন হিসাবে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চিহ্নিতকরণ এবং তৃতীয়ভাগে মৌলিক অধিকারের ঘোষণাসহ অন্যান্য বিধানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবকল্যাণ সাধনের জন্য নানা ধরনের বিধান সন্নিবেশিত আছে। অন্যান্য অনেক আইনেও রয়েছে এর প্রতিফলন। সাধারণভাবে বলা যায়, মানবকল্যাণমুখী আইনের ঘাটতি বাংলাদেশে খুব একটা নেই। কিন্তু ঘাটতি রয়েছে এসব আইনের সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগে; অপপ্রয়োগের সংখ্যাও কম নয়। এছাড়াও রয়েছে কিছু কিছু আইন বা বিধান যার বিষয়বস্তু মানবকল্যানের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলোকে সাধারণত বলা হয় কালাকানুন।

৫. প্রযোজ্য আইন অবহিতকরণের ব্যবস্থা

আইনের শাসন ও আইনানুগ বিচার প্রক্রিয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এই যে, প্রযোজ্য আইন সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। এই মৌলিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নানাবিধ অবহিতকরণ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে, যেমন- গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে প্রণীত আইন, বিধি বা আইনগত দলিল প্রকাশ। এসব আইনের কপি সংগ্রহ করাও খুব একটি দুরূহ নয়।

৬. বিচারে অভিগম্যতা (Access to Justice)

এই মৌলিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে বিচারপ্রার্থীগণ যেন সহজে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং স্বল্প সময়ে ও খরচে বিচার পেতে পারেন। এই শর্তটি পূরণের জন্য আমাদের দেশে রয়েছে নানা ধরনের আদালত ও প্রতিষ্ঠান, যেমন: গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম আদালত, থানা পর্যায়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের আদালত, বিশেষায়িত আদালত এবং রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্ট। প্রশাসনিক বিষয়েও অভিযোগ গ্রহণ, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে নানা ধরনের প্রশাসনিক, আধা বিচারিক (Quasi-judicial) কর্তৃপক্ষ, কমিশন ইত্যাদি। এমনকি বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষকে সহায়তা দানের জন্য রয়েছে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম। কিন্তু বাস্তবে অসংখ্য বিচারপ্রার্থী বিচারের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেন না অথবা পারলেও সম্মুখীন হন নানাবিধ জটিলতা, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতা এবং বিপুল অর্থব্যয়ের। ফলে সৃষ্টি হয় বিচার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশের অনাস্থা। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ এবং হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্ত একটি বিচার ব্যবস্থা।

৭. বিবাদী পক্ষ বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ

ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের অন্যতম মূলসূত্র হচ্ছে *Audi Alteram Partem*, যার অর্থ হচ্ছে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে মামলার অপর পক্ষ বা অভিযুক্তকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে। এই নীতি বাস্তবে অনুসরণের জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইনসহ অন্যান্য পদ্ধতিগত আইনে রয়েছে বিস্তারিত ও পর্যাপ্ত বিধান, যেমন- দেওয়ানি কার্যবিধিতে আছে বাদীর আরজিসহ সমন ও নোটিশ প্রেরণ এবং অনুরূপ অন্যান্য বিধান; ফৌজদারি কার্যবিধিতে রয়েছে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদসহ সাক্ষীদের বক্তব্য গ্রহণ এবং তদন্ত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান; আদালত কর্তৃক আসামীর প্রতি সমন, নোটিশ প্রেরণ এবং প্রয়োজনে তাঁর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ওয়ারেন্ট প্রেরণ; আনুষ্ঠানিক চার্জ গঠনের মাধ্যমে আসামীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সর্ম্পকে অবহিতকরণ; হাইকোর্ট বিভাগে রুল ইস্যুর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে উত্থাপিত দাবি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান।

৮. বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা

বিচার প্রক্রিয়ায় অবশ্যপালনীয় এই শর্তটি সম্পর্কে আমাদের দেশে প্রচলিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে, অধস্তন আদালতের কাজে অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কিত সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস, ক্রিমিনাল রুলস এন্ড অর্ডারস এবং সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের রীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত হাইকোর্ট ডিভিশন রুলস এবং অ্যাপীলেট ডিভিশন রুলস ইত্যাদি আইনে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব আইন-কানুন অনুসারে, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাজনিত বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে, উন্মুক্ত ও অবারিত আদালতে পক্ষগণের উপস্থিতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। তাছাড়াও আইনী বিধানকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সীমিত মাত্রায় সম্প্রতি যোগ হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা। তবে এসব আইন এবং আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত বিচার প্রক্রিয়ার সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিচারপ্রার্থী জনগণকে ঘুষ প্রদান এবং নানাবিধ হয়রানির শিকার হতে হয় মর্মে বিস্তর অভিযোগ আছে। সুতরাং, স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে প্রয়োজন দুর্নীতি প্রতিরোধ।

৯. বিচারিক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও বৈধতা

আদালতে দায়েরকৃত যে কোনো মামলার বিষয়ে বিচারপ্রার্থীসহ সকলের প্রত্যাশা হচ্ছে আদালত বিরোধীয় বিষয়ে যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও বৈধতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। আমাদের দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি এবং অন্যান্য কিছ কিছু আইনে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্ত পূরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধানও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সংক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক উর্দ্ধতন আদালতে আপীল, রিভিশন, ইত্যাদি দায়েরের সুযোগ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিদ্যমান আইনের এতসব বিধান সত্ত্বেও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা, যথাযথ সাক্ষ্যের অভাব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনজীবী ও বিচারকের দক্ষতার অভাবের ফলে মানুষের সুবিচার প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

১০. বিচারকের স্বাধীনতা

সামগ্রিকভাবে বিচার বিভাগ অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিচারকের স্বাধীনতা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর, যথা: ১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, ২. আর্থিক স্বাধীনতা এবং ৩. বিচারকের চাকরিকালের নিশ্চয়তা। বিচারকের স্বাধীনতার নীতিটি আমাদের সংবিধানের ৯৪(৪) এবং ১১৬ক অনুচ্ছেদে ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণার আংশিক প্রতিফলন দেখা যায় সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে। ওই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রজ্ঞা এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিধান রয়েছে। অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৫(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বিধান। বিচারপতিদের শৃঙ্খলা ও অপসারণ ইত্যাদি বিষয়ে ৯৬ অনুচ্ছেদেও রয়েছে প্রায় অনুরূপ বিধান। অধস্তন

আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের মূল ক্ষমতা থাকলেও তার সাথে যুক্ত আছে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ, এসব ক্ষেত্রে রয়েছে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যার অবসান হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতের নানাবিধ সিদ্ধান্তে বিস্তারিতভাবে এই নীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। একই নীতির প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৮৫ সালে ইতালির মিলান শহরে গৃহীত এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary নামক দলিলে। এসব নীতির আলোকে বিচার বিভাগের 'স্বাধীনতা'র বিষয়টিকে দেখা প্রয়োজন।

১১. বিচারকের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সততা

বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিচারকদের ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন, যেমন সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ, বিচারকদের শপথ, সিভিল কোর্টস এ্যাক্ট ১৮৮৭ এর ৩৮ ধারা, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৬ ধারা সত্ত্বেও প্রাতষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা না হলে ওই সব বিধানের অর্থবহ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। অনেক বিচারকের দক্ষতা ও সততাও প্রশ্নের উর্দ্ধে নয়। সুতরাং, বিচার ব্যবস্থার এ সকল অপরিহার্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী আইন-কানুনসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার প্রয়োজন।

১২. বিচার বিভাগের সামগ্রিক কার্যকরতা

বিচার বিভাগের সামগ্রিক কার্যকরতা অনেকাংশে নির্ভর করে আর্থিক স্বাধীনতা, অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি, সহায়ক জনবল ইত্যাদি প্রাপ্তির উপর। আবার বিচারিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয় নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তা। এ বিষয়গুলো মূলত সরকারের নির্বাহী বিভাগ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিচারিক কার্যক্রমের কার্যকরতার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি ভূমিকা পালন করে থাকেন, তাঁরা হলেন: (ক) বিচারক; (খ) আইনজীবী; (গ) সরকারি আইন কর্মকর্তা; (ঘ) বিভিন্ন তদন্ত সংস্থা; (ঙ) আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারি; (চ) মামলার পক্ষগণ; ও (ছ) সাক্ষী।

এ সকল ব্যক্তির মধ্যে আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারি ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাদের যথাযথ অবদান নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচলিত আইন-কানুন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো পর্যাপ্ত নয়।

বিচার বিভাগের কার্যকরতার আর একটি শর্ত হচ্ছে যথাযথ আদালত ব্যবস্থাপনা, যা মূলত বিচারকগণের নিয়ন্ত্রণভুক্ত। এ বিষয়ে রয়েছে নানাবিধ আইন ও বিধিমালা, যেমন সিভিল রুলস এন্ড অর্ডার্স, ক্রিমিনাল রুলস এন্ড অর্ডার্স, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে আদালত ব্যবস্থাপনায় রয়েছে নানান দুর্বলতা।

বিচার প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী এসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সুসমন্বিত ও কার্যকর ভূমিকা যথাসম্ভব নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে অন্যান্য অধ্যায়ে।

১৩. আইন সংস্কার ও বাস্তব পদক্ষেপ

বিচার বিভাগ সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন শিরোনামে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার এর প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হবে বিদ্যমান সংবিধানসহ কিছু কিছু আইন সংশোধন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রনয়ন এবং সুপ্রীম কোর্টসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশনা জারি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তব পদক্ষেপ।

তৃতীয় অধ্যায়
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও শৃঙ্খলা

১. ভূমিকা

প্রধান বিচারপতি পদে এবং সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারকদের নিয়োগকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত। একই সাথে, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এর জবাবদিহিতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা আবশ্যক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাগ বিভাগ সংস্কার কমিশন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার অর্থবহ সংস্কার প্রস্তাব করছে।

২. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

২.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা এবং কার্যকরতা নিশ্চিত করা অনেকাংশে নির্ভর করে বিচার বিভাগের নেতৃত্বদানকারী ও শীর্ষব্যক্তি প্রধান বিচারপতির উপর। বিদ্যমান সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারো পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব প্রজ্ঞা অনুসারে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অতীতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নানা সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

২.২ কমিশন মনে করে যে, বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা বজায় রাখার জন্য প্রধান বিচারপতির নিয়োগকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সংবিধানে এই মর্মে বিধান থাকা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। অর্থাৎ, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতি রাখা যাবে না। এর ফলে প্রধান বিচারপতির নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগের সুযোগ বহুলাংশে লোপ পাবে। সেই লক্ষ্যে সংবিধানের ৪৮(৩), ৫৫(২) এবং ৯৫(১) অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে[৬]।

৩. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ

৩.১ বিচারিক ও অন্যান্য দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের কার্যপরিচালনার বিষয়ে এবং আদালতে নিষ্পত্তির জন্য সময়ে সময়ে জমে থাকা মামলার সংখ্যা, অর্থাৎ মামলাজটের বিষয়ে, সম্যক অবগত থাকেন, সেহেতু আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণে প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩.২ আপীল বিভাগে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ২৬,৫১৭ টি। মামলা নিষ্পত্তির বিদ্যমান হার বজায় থাকলে এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, বিদ্যমান মামলাজট থেকে উত্তরণ এবং একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য আপীল বিভাগে সকল সময় দুই বা ততোধিক বেঞ্চ পরিচালনা করা আবশ্যক। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারিকৃত একটি প্রজ্ঞাপনে[৭] আপীল বিভাগের

---

[৬] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

[৭] প্রজ্ঞাপন নং বিচার-৪/১এইচ-৪/২০০৯/৭২৯, তারিখ ৯ জুলাই ২০০৯

বিচারকদের সংখ্যা **১১** (এগার)-তে উন্নিত করা হলেও আপীল বিভাগের বিচারকদের ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারিত নেই। কমিশন মনে করে যে, সংবিধানে আপীল বিভাগে বিচারকের ন্যূনতম সংখ্যা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন নিশ্চিত করা সম্ভব।

৩.৩ উপরিউক্ত কারণে কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান করার প্রস্তাব করছে:

(ক) আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা হবে ৭ (সাত) জন, এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আরো অধিক সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হবে;

(খ) প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হবে।

অর্থাৎ, বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংবিধানে বিদ্যমান নির্বাহী বিভাগের একক ক্ষমতার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে।

৪. প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য বিচারক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন গঠন

৪.১ সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগ বিষয়ে বিদ্যমান সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের বিধান আছে। বাস্তবে হাইকোর্ট বিভাগে কখনই ৯৫(১) অনুচ্ছেদের অধীনে নতুন "বিচারক" নিয়োগ করা হয় না, বরং সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের অধীনে "অতিরিক্ত বিচারক" নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে নিয়োগের মেয়াদ শেষে উপযুক্ত বিবেচিত হলে ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁকে স্থায়ীভাবে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়।

৪.২ বিদ্যমান পদ্ধতিতে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ, অতিরিক্ত বিচারককে স্থায়ী নিয়োগ না দেয়া, হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণ বিচারককে আপীল বিভাগে নিয়োগ না দেয়া, ইত্যাদি বিষয়ে বারংবার প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য বা দলীয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ যে অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে তা বলাই বাহুল্য।

৪.৩ বিচার বিভাগের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্রমহ্রাসমান আস্থার পিছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে অস্বচ্ছ ও অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উচ্চ-আদালতে বিচারক নিয়োগ। তাছাড়া, নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য না দেয়া হলে বিচারকাজের মান ও মামলার ফলাফলও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ, একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি একটি প্রধান অন্তরায়।

৪.৪ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত প্রধান বিচারপতির একক পরামর্শ প্রদান পদ্ধতির পরিবর্তে একটি সম্মিলিত এবং প্রতিনিধিত্বশীল সুপারিশ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা যৌক্তিক এবং বাঞ্ছনীয় বলে কমিশন মনে করে। যথাসম্ভব স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মেধা, সততা ও দক্ষতার মূল্যায়নকারী একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিশনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নিয়োগ-পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন" নামে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (অর্থাৎ, হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক ও স্থায়ী বিচারক এবং আপীল বিভাগের বিচারক) নিয়োগে কমিশনের মতামতই প্রাধান্য পাবে। এই কমিশনের গঠন হবে নিম্নরূপ:

<u>কমিশন প্রধান</u>
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

<u>সদস্য (আটজন)</u>
(ক) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম ২ (দুই) জন বিচারক;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম ২ (দুই) জন বিচারক (যার মধ্যে একজন হবেন বিচার-কর্মবিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন);

(গ) উপরিউক্ত ৪ (চার) বিচারক-সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

(ঘ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল;

(ঙ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি;

(চ) ক্রমিক (১) ও (২) এ উল্লিখিত ৪ (চার) বিচারক-সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী।

৪.৫ লক্ষণীয় যে, প্রস্তাবিত নিয়োগ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য রয়েছে। কমিশনে এই দৃষ্টিকোন থেকে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে যে, তিনি হবেন অভিজ্ঞতায় প্রধান বিচারপতি বা অন্য বিচারকদের চেয়েও প্রবীণ, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। তাছাড়া, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন, তাই কমিশন মনে করে যে নিয়োগ কমিশনে এমন একজন আইনজীবীকে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকা উচিৎ যিনি সরাসরি দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকবেন না।

৪.৬ আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত ও স্থায়ী বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সততা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ পদ্ধতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করতে হবে[৮]।

৫. নিয়োগের যোগ্যতা

৫.১ বর্তমানে সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদে কোনো ব্যক্তিকে সুপ্রীম কোর্টে বিচারক হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার যে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

(ক) তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং

(খ) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন ১০ (দশ) বছর এ্যাডভোকেট হিসাবে থাকতে হবে, অথবা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অন্যূন ১০ (দশ) বছর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে, অথবা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তবে, সর্বশেষে উল্লিখিত শ্রেণির ব্যক্তিদের যোগ্যতা সংক্রান্ত কোন আইন এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি।

৫.২ লক্ষণীয় যে, সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের অধীন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন যোগ্যতার উল্লেখ করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে যে, "যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন" ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে, বাস্তবে এই অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৫(২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যোগ্যতার শর্তগুলোকেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৫.৩ সংস্কার কমিশন মনে করে যে, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানের ৯৫(২) এবং ৯৮ অনুচেছদ সংশোধন করে সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা আরো সুনির্দিষ্ট ও সময়োপযোগী করা প্রয়োজন। যেমন, সংবিধানের ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে যেভাবে একটি অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রেও

[৮] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

অনুরূপ অযোগ্যতার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা বিচারক পদে শপথ গ্রহণকালে বিচারককে বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যের শপথ নিতে হয়, যা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে অটুট থাকে না। এছাড়াও, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের দায়িত্ব ও এখতিয়ারের গুরুত্ব বিবেচনায় দ্বৈত নাগরিকত্বধারী কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দেয়া বা বহাল রাখা সমীচীন নয় বলে কমিশনের অভিমত।

৫.৪ সংবিধানের ৪৮(৪) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ৩৫ বছর এবং ৬৬(১) অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর হওয়ার শর্ত থাকলেও সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে বর্তমানে ন্যূনতম বয়সের কোন শর্ত নাই। সংস্কার কমিশন মনে করে যে, হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ওই পদের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় একজন প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স ৪৮ বছর নির্ধারণ করা সমীচীন হবে।

৫.৫ বিচার বিভাগীয় পদ থেকে যাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসাবে নিয়োগ পান তাঁরা জেলা জজ পদমর্যাদার হয়ে থাকেন। বিচার বিভাগের প্রবেশ পদ থেকে শুরু করে কোন ব্যক্তির জেলা জজ পদ পর্যন্ত উন্নিত হওয়া পর্যন্ত ন্যূনতম বয়স ৪৮ এর কম হওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। সুতরাং, সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা – এই দুই শ্রেণির প্রার্থীদের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিৎ।

৫.৬ নিয়োগ কমিশন গঠন সংক্রান্ত আইনে এই মর্মে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যে কমিশন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভারসাম্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখবে।

৫.৭ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনায় সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(ক) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী অবশ্যই শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক হবেন। যদি তিনি অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন বা অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন তবে তাঁর বিচারক হওয়ার বা বিচারক পদে থাকার যোগ্যতা থাকবে না।

(খ) হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর বয়স হতে হবে অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর। ন্যূনতম বয়স নির্ধারনের আলোকে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা ৭০ (সত্তর) বছর করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করছে। তবে, অবসরের নতুন এই বয়সসীমা প্রস্তাবিত সংশোধনীর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচাকেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(গ) অনুরূপ প্রার্থীর অবশ্যই নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকবে:

(অ) সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের সক্রিয় আইন পেশার অভিজ্ঞতা (কেবল আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তিই যথেষ্ট নয়); অথবা

(আ) জেলা জজ হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছর বিচার বিভাগীয় পদে চাকরিসহ বিচার বিভাগে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা; অথবা

(ই) যদি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে[৯] ভবিষ্যতে একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে উক্ত সার্ভিসে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ অ্যাটর্নি সাভিসে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা [১০]।

[৯] সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

[১০] এই বিষয়ে তিনজন কমিশন-সদস্যের ভিন্নমতের জন্য পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

(ঘ) ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে (অর্থাৎ, স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসে সর্বপ্রথম নিয়োগের ১৫ (পনের) বছর পূর্তির পূর্ব পর্যন্ত) উক্ত সার্ভিসের কোন প্রার্থী বিচারক হওয়ার যোগ্য হবেন যদি তাঁর সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে অভিজ্ঞতা এবং অ্যাটর্নি সার্ভিসে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অভিজ্ঞতার মোট সময়কাল অন্যূন ১৫ (পনের) বছর হয়।

৬. হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ

৬.১. বর্তমানে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী কোন প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়াই হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করে থাকে। একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একটি অন্তরায়।

৬.২ কমনওয়েল্থ লাটিমার হাউজ নীতিমালা (Commonwealth (Latimer House) Principles on the Three Branches of Government)[১১] অনুযায়ী একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সৎ এবং যোগ্য বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক, তার মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্যে ঘোষিত সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রয়োগ করে বিচারক নিয়োগ করা।

৬.৩ কমনওয়েলথ সচিবালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত "The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles - A Compendium and Analysis of Best Practice (2015)"[১২] প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ার শুরুতেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে করে আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন দাখিলের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৬.৪ কোন যোগ্য প্রার্থী নিজে আবেদন করার ক্ষেত্রে সংকোচ বোধ করে থাকলে তিনি যাতে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা থেকে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রার্থীর সম্মতিক্রমে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নেরও প্রচলন রয়েছে।

৬.৫ উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে, সংস্কার কমিশন হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব করছে, যথা:

(ক) ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ কমিশন হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে।

(খ) নিয়োগ কমিশন অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার আহ্বান জানাবে। কমিশন তৃতীয় পক্ষ থেকেও যোগ্যতাসম্পন্ন কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন আহ্বান করতে পারবে। তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর লিখিত সম্মতি সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) অতিরিক্ত বিচারক পদে আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে তপশিল "ক" -তে বর্ণিত তথ্য ও দলিল সংযুক্ত করতে হবে। প্রার্থীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্যাদি, শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা, আর্থিক অবস্থান ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ঘ) আবেদনের সাথে সংযুক্ত তথ্য ও দলিলপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিয়োগ কমিশন প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

---

[11] https://www.cpahq.org/media/dhfajkpg/commonwealth-latimer-principles-web-version.pdf
[12] https://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf

(ঙ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নাম ও তথ্যাদি জনসাধারণের কছে প্রকাশ করা হবে যাতে জনগণ কোন প্রার্থীর উপযুক্ততা বিষয়ে আপত্তি থাকলে তা কমিশনের নিকট তথ্য-প্রমাণসহ প্রেরণ করতে পারে।

(চ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীগণকে কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক তথ্য বা আপত্তি দাখিল হয়ে থাকলে সে বিষয়ে প্রার্থীর বক্তব্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে। কমিশন প্রয়োজন মনে করলে কোন প্রার্থীকে তপশিল "ক"-তে বর্ণিত তথ্য ও দলিলের অতিরিক্ত অন্য কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য ও দলিল প্রদানের অনুরোধ করতে পারবে।

(ছ) নিয়োগ কমিশন উপরিউক্ত প্রক্রিয়া শেষে প্রার্থীর শ্রেণিভেদে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে-

(অ) সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত কাজের মানসহ দক্ষতা, সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(আ) বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, উক্ত কর্মবিভাগে জ্যেষ্ঠতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(ই) (যখন প্রযোজ্য)[১৩] অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্য হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত কাজের মানসহ দক্ষতা, সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

(জ) কমিশন নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করবে, এবং নিয়োগযোগ্য বিচারকের সংখ্যার অতিরিক্ত ০২ (দুই) জন প্রার্থীর নামসহ চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশে উল্লিখিত শ্রেণিগুলোর যুক্তিসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হতে হবে।

(ঝ) কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারক(দের) নিয়োগ দান করবেন। রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র একবার লিখিতভাবে কারণ উল্লেখক্রমে সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের কাছে ফেরত পাঠাতে পারবেন। পুনর্বিবেচনার পরে কমিশন পরিবর্তিত সুপারিশ অথবা, পূর্বের সুপারিশ অপরিবর্তিতরূপে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

(ঞ) রাষ্ট্রপতি তাঁর কছে দ্বিতীয়বার প্রেরিত সুপারিশ উপস্থাপনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সুপারিশ অনুযায়ী বিচারক(দের) নিয়োগ দান করবেন।

৬.৬ উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য এবং নিয়োগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংবিধানে যথাযথ বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৭. হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক নিয়োগ

৭.১ হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত পরিহারের লক্ষ্যে কমিশনের কার্যক্রমে অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট বার এসাসিয়েশনের সভাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী-সদস্য অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকবেন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নিয়োগ কমিশন হবে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট।

[১৩] এ বিষয়ে কমিশনের তিন সদস্যের ভিন্নমতের জন্য পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

৭.২ একজন অতিরিক্ত বিচারকের মেয়াদপূর্তির অন্যূন ০২ (দুই) মাস পূর্বে, নিয়োগ কমিশন উক্ত বিচারকের নিয়োগযোগ্যতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে। এক্ষেত্রে কমিশন অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে তাঁর নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা, আচরণ ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করবে।

৭.৩ প্রয়োজন অনুভূত হলে, নিয়োগ কমিশন একজন অতিরিক্ত বিচারককে সাক্ষাতকারের জন্য সশরীরে কমিশনের সামনে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

৭.৪ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে কমিশন একজন অতিরিক্ত বিচারককে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ দানের সুপারিশ অথবা তাঁর নিয়োগের পরিসমাপ্তি ঘটানো অথবা অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে তাঁর কার্যকাল অনধিক ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৬.৫ এর দফা (ঝ) ও (ঞ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

৭.৫ উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য এবং নিয়োগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংবিধানে যথাযথ বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে[১৪], প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৮. আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ

৮.১ আপীল বিভাগে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ কমিশনের কার্যক্রমে স্বার্থের সংঘাত পরিহারের লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক-সদস্য, অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট বার এসাসিয়েশনের সভাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী-সদস্য অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকবেন । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কমিশন হবে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট।

৮.২ আপীল বিভাগে বিচারকের শূন্যপদে নিয়োগের জন্য কমিশন প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারকদের ক্রমানুসারে বিবেচনা করবেন । শুধুমাত্র দায়িত্বপালন, কর্মদক্ষতা এবং সার্বিক আচরণের প্রশ্নে জোরালো নেতিবাচক কারণ থাকলেই কমিশন জ্যেষ্ঠতার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে পারবেন।

৮.৩ আপীল বিভাগের বিচারক হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা, আচরণ ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করবে।

৮.৪ প্রয়োজন অনুভূত হলে, নিয়োগ কমিশন একজন বিচারককে সাক্ষাতকারের জন্য সশরীরে কমিশনের সামনে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

৮.৫ উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণের পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৬.৫ এর দফা (ঝ) ও (ঞ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

৮.৬ উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য এবং নিয়োগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংবিধানে যথাযথ বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

[১৪] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৯. অধ্যাদেশ প্রণয়ন

৯.১ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন। তবে, বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই বিচারক নিয়োগের জন্য একটি কমিশন গঠন করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অনুরোধে, সংস্কার কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার আগেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে একটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রস্তুত করে, এবং গত ১৯ নভেম্বর ২০২৪ খসড়াটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে প্রেরণ করে। খসড়া অধ্যাদেশটি এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হলো[১৫]।

১০. সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সংস্কার

১০.১ প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধান ও অপসারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুইটি মূলনীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য:

(ক) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির চাপে বা নির্বাহী বিভাগের খেয়াল-খুশিমতো বিচারকদের অপসারণ করা যাবে না, এবং শুধুমাত্র গুরুতর অসদাচরণের কারণেই বিচারকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে বা তাঁদেরকে অপসারণ করা যাবে;

(খ) উপযুক্ত কাঠামোর মধ্যে বিচারকদের জবাবদিহিতার আওতায় রাখতে হবে, যেন তাঁরা নিজেদেরকে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার উর্দ্ধে মনে না করেন।

এক্ষেত্রে "গুরুতর অসদাচরণ" বলতে এমন অসদাচরণকে বুঝাবে যার ফলে একজন বিচারক তার পদে থাকার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১০.২ কমনওয়েল্থ্ লাটিমার হাউজ নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, একজন বিচারককে শুধুমাত্র তখনই বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা বা অপসারণ করা যাবে, যখন তিনি শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে অথবা গুরুতর অসদাচরণের কারণে, তাঁর বিচারিক দায়িত্ব পালনে অযোগ্য হয়ে পড়েন। কমনওয়েল্থ্ভুক্ত বিভিন্ন দেশে বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত শৃঙ্খলামূলক কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারক অপসারণ প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে।

১০.৩ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী মামলার[১৬] রায়ের মাধ্যমে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করে। এর ফলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদটি পুনরায় বলবৎ হয়। গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ হাইকোর্ট বিভাগ পঞ্চদশ সংশোধনী মামলার[১৭] রায়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর কিছু বিধান সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী বলে বাতিল করলেও, ওই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত ৯৬ অনুচ্ছেদকে বাতিল ঘোষণা করেনি। সুতরাং, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

১০.৪ সংবিধনের অনুচ্ছেদ ৯৬(৩) অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর পরবর্তী কর্মে প্রবীণ ০২ (দুই) জন বিচারক সমন্বয়ে "সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল" গঠিত হবে। উপ-অনুচ্ছেদ (৩)-এর শর্তাংশে বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত তিনজন পদাধিকারীর কোন একজনের বিরুদ্ধে যদি কাউন্সিল তদন্ত করে বা কেউ যদি অনুপস্থিত থাকেন বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহলে কাউন্সিলের যারা সদস্য আছেন তাঁদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তাঁকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

---

[১৫] পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

[১৬] *বাংলাদেশ সরকার* বনাম *এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী ও অন্যান্য* [৭১ ডি এল আর (এডি) ৫২]

[১৭] *ড. বদিউল আলম মজুমদার ও অন্যান্য* বনাম *বাংলাদেশ ও অন্যান্য*, রিট পিটিশন নং ৯৯৩৫/২০২৪

১০.৫ এক্ষেত্রে ষোড়শ সংশোধনী মামলায় বিচারপতি ইমান আলী কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ প্রনিধাণযোগ্য। তিনি তাঁর মতামতে উল্লেখ করেন যে, কোনো বিভাগীয় তদন্তের নীতি হলো, যাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে তাঁর চেয়ে ঊর্দ্ধতন কোন ব্যক্তি তদন্তের দায়িত্বে থাকবেন। এই নীতি অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয় যে, দায়িত্বরত প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের অন্য কোনো বিচারক-সদস্য যদি তদন্তের বিষয়বস্তু হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারককে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে কাউন্সিল গঠন করবেন।

১০.৬ উপরিউক্ত প্রস্তাব এই কারণে বিবেচনার দাবি রাখে যে, কোনো বিচারকের পক্ষে তাঁর ঊর্ধ্বতন বা তাঁর থেকে প্রবীণ কোন বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন থাকা দুরূহ। পক্ষান্তরে, একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের ক্ষেত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা থাকার সম্ভাবনা কম। ফলে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের গঠন সম্পর্কে এই মর্মে বিধান করা যেতে পারে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে প্রধান বিচারপতির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারক তদন্তের বিষয়ে "সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে প্রধান বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হবেন। তবে, কাউন্সিলের অন্য কোন বিচারক-সদস্যের বিষয়ে তদন্তের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি যেহেতু কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, সেহেতু ওই ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারককে কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য নয় বলে কমিশন মনে করে। অর্থাৎ, এই ধরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৯৬ অনুচ্ছেদেও শর্তাংশ অনুযায়ী কাউন্সিলের গঠন বহাল রাখা যায়।

১০.৭ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬(৪)(ক) অনুযায়ী, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হলো সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা। ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে এবং তার পূর্বে *মোঃ ইদ্রিসুর রহমান* বনাম *বাংলাদেশ* মামলার[১৮] রায়ে আপীল বিভাগ পর্যবেক্ষণ আকারে বিচারকদের জন্য আচরণবিধি ঘোষণা করেন। তবে তা অনুচ্ছেদ ৯৬(৪)(ক)-এর অধীনে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের ঘোষিত আচরণবিধি কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই বিতর্ক এড়ানোর লক্ষ্যে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সভায় বিচারকদের জন্য আচরণবিধি নির্ধারণ করে একটি পৃথক দলিল তৈরি ও ঘোষণা আকারে তা প্রকাশ করা উচিৎ। আচারণবিধি সময়ে সময়ে হালনাগাদ করার জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়।

১০.৮ যেহেতু সুপ্রীম কের্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা তাঁদের নামের আগে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার করেন এবং রাষ্ট্রের অর্থায়নে বিভিন্ন সুবিধাও ভোগ করেন, সেহেতু তাদের জন্য পালনীয় একটি আলাদা আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা প্রয়োজন, যেন অবসরোত্তর সময়ে তাঁদের কোন আচরণের ফলে জনমানসে বিচারক থাকাকালে তাঁর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বিচারকদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়। উক্ত আচরণবিধি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তাঁদেরকে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করার বিধান থাকা প্রয়োজন।

১০.৯ অনুচ্ছেদ ৯৬(৪)(খ)-তে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্বও সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং, উক্ত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের জন্য পালনীয় আচরণবিধিও কাউন্সিল কর্তৃক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

১০.১০ সংবিধানে ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম সামরিক ফরমানের মাধ্যমে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা অনুমোদিত হয়। ২০০০ সালে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর

[১৮] ১৩ এ.ডি.সি. ২২০

বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হলে ওই মামলার রায়ে[১৯] পঞ্চম সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করা হলেও সংবিধানে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তিকে মার্জনা করা হয়। পরবর্তীতে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এসংক্রান্ত বিধান সামান্য পরিমার্জিতরূপে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১০.১১ সাধারণভাবে অভিযোগ রয়েছে যে, সংবিধানে দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের বিধান থাকা সত্ত্বেও কাউন্সিল কার্যকরভাবে বিচারকদের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং সুপ্রীম কোর্টের কার্য-পরিচালনায় তার প্রভাব। অনুচ্ছেদ ৯৬(৫) অনুযায়ী, কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনার জন্য নির্দেশ আসতে হয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি যদি কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র থেকে কোন বিচারপতির শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য বা গুরুতর অসদাচারণের তথ্য পান, তাহলে এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য কাউন্সিলকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না, বরং সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য। ফলে, কাউন্সিলকে তদন্তের বিষয়ে নির্দেশ দেয়া বা না দেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

১০.১২ সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল যে যথেষ্ট সক্রিয় নয় এবং একে আরো কার্যকর করার জন্য, অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা উচিৎ, সেটা ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়েই উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কার কমিশনের কাছে প্রেরিত মতামতেও সাধারণ নাগরিক, পেশাজীবীসহ অন্যান্য অংশীজনেরা বিচারকদের শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন।

১০.১৩ উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় সংস্কার কমিশন মনে করে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং যথাযথ কার্যপদ্ধতি প্রণয়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

(ক) সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ করবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা করবে ও প্রয়োজন মনে করলে তা হালনাগাদ করবে। অনুরূপভাবে, সাবেক বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের জন্য পালনীয় আলাদা আলাদা আচরণবিধিও কাউন্সিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে।

(খ) কোন বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করার বিষয়ে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল রাষ্ট্রপতি, তথা নির্বাহী বিভাগের, নির্দেশের পরিবর্তে নিজ সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে, এবং রাষ্ট্রপতিকে সে বিষয়ে অবহিত করবে। তবে, রাষ্ট্রপতি যদি এমন তথ্য পান যার ভিত্তিতে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন, তাহলে তিনি কাউন্সিলকে তদন্ত পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন। তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করবে এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ কাউন্সিলের একই ক্ষমতা থাকবে[২০]।

(গ) সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল বিচারকদের বিচারিক দক্ষতা, আদালত ব্যবস্থাপনা, মামলা ব্যবস্থাপনা, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আচরণসহ তাদের সার্বিক আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য

[১৯] *খন্দকার দেলোয়ার হোসেন* বনাম *বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস্ ও অন্যান্য* [৬২ ডি.এল.আর. (এ.ডি.) ২৯৮]

[২০] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

একটি চলমান প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে, এবং তার অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সময়ে সময়ে মতবিনিময় করবে।

(ঘ) প্রতি তিন বছর পরপর, এবং সর্বশেষে অবসর গ্রহণের ৬ (ছয়) মাস আগে, বিচারকদের ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ সংগ্রহ করে কাউন্সিল তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে ও প্রকাশ করবে।

(ঙ) বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মচারি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেন বিচারকদের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কাউন্সিলকে জানাতে পারেন সেজন্য কাউন্সিল একটি স্থায়ী অভিযোগ–গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। কাউন্সিল একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রাপ্ত অভিযোগগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করবে। বিষয়টি কাউন্সিলের কার্যবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(চ) কাউন্সিল বিচারকদের অপসারণের মতো চূড়ান্ত ব্যবস্থা ছাড়াও কোন বিচারকের নির্দিষ্ট কোনো আচরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদারকি, পরামর্শ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত যথাযথ বিধান আচরণবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ছ) উপরিউক্ত দফা (খ) থেকে (চ) পর্যন্ত বর্ণিত কার্যক্রম সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের জন্যও, যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকু, প্রযোজ্য হবে।

(জ) তদন্তে কোনো সাবেক বিচারকের বিরুদ্ধে তাঁর জন্য পালনীয় আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় প্রমাণিত হলে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে ।

তপশিল "ক"
প্রদেয় তথ্য ও দলিল

(ক) আবেদনকারীর ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত ও তথ্যাদি

১. আবেদনকারীর নাম
২. নাগরিকত্ব
৩. জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে)
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা (এসএসসি/সমমান ও উচ্চতর, যাতে কোনো স্বীকৃতি, বৃত্তি, ফেলোশিপ বা অন্য কোনা অর্জনেরও (প্রযোজ্য হলে) উল্লেখ থাকবে)
৫. পেশাগত প্রশিক্ষণ, যদি থাকে
৬. পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ, যদি থাকে
৭. কোনো ক্লাব বা অনুরূপ কোনো সংগঠনের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকলে তার তথ্য
৮. কোনো মামলা (তদন্ত চলমান এমন মামলাসহ) বা আদালত অবমাননার মামলায় পক্ষ হয়ে থাকলে, সে বিষয়ে তথ্য
৯. ইতোপূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ বা খণ্ডকালীন চাকরি করে থাকলে সে বিষয়ে তথ্য

১০. কোনো গুরুতর ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকলে তার বিবরণ (যেমন ক্যান্সার বা হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনী, যকৃত, অগ্নাশয়, স্নায়বিক ও দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত কোনো অসুস্থতা)

১১. গত তিন বছরের আয়কর রিটার্নের অনুলিপি

(খ) আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যদের তথ্যাদি

১২. আবেদনকারীর স্বামী/স্ত্রী'র নাম ও ঠিকানা

১৩. স্বামী/স্ত্রী'র পেশা

১৪. আবেদনকারীর সন্তানদের নাম ও ঠিকানা

১৫. আবেদনকারীর সন্তানদের পেশা

১৬. **আবেদনকারী এ্যাডভোকেট হলে**

(অ) এ্যাডভোকেট হিসাবে, হাইকোর্ট বিভাগে এবং আপীল বিভাগে (যদি প্রযোজ্য হয়) তালিকাভুক্তির তারিখ

(আ) কোনো সময়ে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস- এ বিরতি থাকলে তার সময়কাল ও বিবরণ

(ই) এ্যাডভোকেট হিসাবে আইনের নির্দিষ্ট কোনো শাখায় আবেদনকারীর বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে তার বিবরণ

(ঈ) এ্যাডভোকেট হিসাবে সুপ্রীম কোর্টে আইনগত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনসহ পরিচালনা করেছেন এমন ২০ (বিশ) টি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)

(উ) আবেদনকারীর প্রস্তুতকৃত ও সুপ্রীম কোর্টের মামলায় দাখিলকৃত ১০ (দশ)টি আইনগত দলিল যেমন: রিট পিটিশন, ফৌজদারি আপীল ও ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি রিভিশন এবং আদি ও অন্যান্য এখতিয়ারের প্রযোজ্য মামলার মূল আবেদনপত্র বা আরজি)

(ঊ) কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে তার বিবরণ

(ঋ) আবেদনকারী কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচিত কোনো পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ

(এ) আবেদনকারী বংলাদেশ বার কাউন্সিলের বা আইনজীবী সমিতির কোনো পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ

(ঐ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে পেশাগত অসদাচারণ বিষয়ক কোনো কার্যধারায় অভিযুক্ত হয়ে থাকলে তার বিবরণ (ফলাফলসহ)

১৮. **আবেদনকারী বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলে**

(অ) বিচার-কর্মবিভাগে যোগদানের তারিখ

(আ) গত দশ বছর আবেদনকারী যে সকল পদে কর্মরত ছিলেন তার বিবরণ

(ই) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা সূচিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ (অভিযোগের ধরন এবং ফলাফলসহ)

(ঈ) আবেদনকারী কর্তৃক দোতরফা সূত্রে নিষ্পত্তিকৃত পাঁচটি ফৌজদারি এবং পাঁচটি দেওয়ানি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)

চতুর্থ অধ্যায়
অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি

১. ভূমিকা
বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত বিষয়াবলি সংবিধানের ১১৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে। সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদ দুটি এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে মাসদার হোসেন মামলায়[২১] সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করে। সেই সকল নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রপতি নিম্নবর্ণিত ৫টি বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করেন:

(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭;
(২) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটিমঞ্জুরি, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০০৭;
(৩) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭;
(৪) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭;
(৫) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭

উল্লিখিত ৫টি বিধিমালা অনুসারে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলির প্রকৃতি মূলত প্রশাসনিক এবং সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের পর বিচারকগণ একটি দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি তথা নির্বাহী বিভাগের পক্ষে আইন মন্ত্রণালয় সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ওই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। তবে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন পদোন্নতি, গুরুদণ্ড আরোপ ইত্যাদি বিষয় আইন মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব, অর্থাৎ একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাব উপস্থাপনের প্রয়োজনে উপরিউক্ত পাঁচটি বিধিমালা পরীক্ষা করা হয়েছে।

বিধিমালা পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবগুলো পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে উপস্থাপন করা হলো।

২. সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনীর আলোকে চাকরি বিধিমালা সংশোধন
এই প্রতিবেদনে সংবিধানের ১১৩ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে পৃথক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিচারকদের চাকরি বিষয়ে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ/ক্ষমতা যথাসম্ভব বিলোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। তদনুসারে এই প্রতিবেদনের ১ ও ২ নং ক্রমিকে উল্লিখিত বিধিমালাদ্বয়কে সংবিধানের ১১৩ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর আলোকে সংশোধন করতে হবে এবং সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শকের ভূমিকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা উহাতে প্রতিফলিত হতে হবে। তবে পদোন্নতি এবং সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে। সংবিধানের প্রস্তাবিত

[২১] ৫২ ডিএলআর (এডি) ৮২।

সংশোধনী অনুসারে রুলস অব বিজনেস এ আইন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বিলোপ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

সুপারিশ

১. সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এর কার্যাবলির আলোকে উপরি-উল্লিখিত বিধিমালা সংশোধন করতে হবে।

২. সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এর কার্যাবলির আলোকে সরকারের রুলস অব বিজনেস এবং উহার তপশিল (এলোকেশন অব বিজনেস) থেকে আইন মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি বিলোপ করতে হবে।

৩. বিচারকদের জন্য বদলি নীতিমালা

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তির ন্যায় বদলি অধস্তন আদালতের বিচারকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তার কর্মদক্ষতাসহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু উপরিউক্ত বিধিমালাতে বদলির সংক্ষিপ্ত বিধান থাকলেও বদলির নীতিমালা প্রণয়ন বা অনুসরণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। ফলে অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অনেক বিচারকই বদলি নামক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। অভিযোগ আছে অনেক ক্ষেত্রেই বদলি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয়েছে। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধনীতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিচার বিভাগ সংস্কারে কমিশনের অভিমত এই যে, বদলির বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা একান্ত কাম্য।

বিচার কাজে বিচারকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে বদলির নীতিমালা এমন হবে, যাতে করে নির্বাহী বিভাগ বদলির ভয় দেখিয়ে বিচারকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এছাড়াও বিচারকদের বদলির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যেন বিষয়টি তার কাছে সারপ্রাইজ আকারে না আসে এবং বদলির পূর্বে তাকে বদলি বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। বিচারককে যথাসম্ভব তার পছন্দমত স্টেশনে বদলির ব্যবস্থা করতে হবে যেন পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে তাকে চিন্তা করতে না হয় এবং বদলির কারণে তার দ্বারা সম্পাদিত বিচারকার্যের গুণগতমান ক্ষুন্ন না হয়।

এই উদ্দেশ্যে বিচারকদের বদলির ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

১. বছরের একটি নির্ধারিত সময়ে বিচারকদের রুটিন বদলি করতে হবে যার আদেশ ডিসেম্বর মাসের শুরুতে প্রদান করা হবে এবং জানুয়ারিতে তাঁদের বদলিকৃত নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে।

২. একজন বিচারক একটি কর্মস্থলে সাধারণত ৩ (তিন) বছর চাকরি করবেন। কোনো সুনির্দিষ্ট বিশেষ কারণ ছাড়া কোনো বিচারককে একটি কর্মস্থলে তাঁর কর্মকাল ৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অন্য একটি কর্মস্থলে বদলি করা যাবে না। একই বিচারিক পদের বিপরীতে একবার এবং উর্দ্ধতন কোনো বিচারিক পদের বিপরীতে আরেকবার এভাবে সর্বমোট ২ (দুই) বার বা সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদে একই কর্মস্থলে একজন বিচারককে পদায়ন করা যেতে পারে। তবে বিচারিক নয় এমন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম করা যাবে।

৩. স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য হলে বা একজন জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য এবং অন্যজন সরকারি অন্যকোনো দপ্তরের কর্মকর্তা হলে, যতদূর সম্ভব তাদের উভয়কে একই কর্মস্থলে বদলি করতে হবে।

৪. বদলির আদেশ জারির কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে বিচারককে বদলির বিষয়টি জানাতে হবে এবং তার নিকট হতে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে বদলির জন্য তাঁর পছন্দের ০৫ (পাঁচ) টি জেলা শহরের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে। বদলির সময় যতদূর সম্ভব বিচারককে তার পছন্দের তালিকায় থাকা স্টেশনে বদলি করতে হবে।

৫. অভিযোগ ইত্যাদি কোনো কারণে যদি কোন বিচারককে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের বাইরে বছরের অন্যকোনো সময়ে জরুরি ভিত্তিতে বদলি করতে হয়, সেক্ষেত্রেও বদলির পূর্বে বদলির কারণ উল্লেখপূর্বক বিচারককে নোটিশ দিতে হবে যেন তিনি তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ইত্যাদির বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারেন।

৬. বিচারকের আবেদনে বদলির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিচারক, তাঁর স্বামী বা স্ত্রী, তাঁর সন্তান এবং তাঁর শশুড়-শাশুড়ীর গুরুতর অসুস্থ্যতার (যার চিকিৎসা কোনোক্রমেই বর্তমান কর্মস্থলে থেকে করা সম্ভব নয়) বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

সুপারিশ

উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে বিচারকদের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ বদলি নীতিমালা তৈরি, জারি ও তা অনুসরণ করতে হবে।

৪. সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ

নতুন কর্মস্থলে বদলির একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে বদলিকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারির সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগের দুশ্চিন্তা। সে কারণে প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের ন্যায় বিচারকগণের মধ্যেও সন্তানদের ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং লেখাপড়া বা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেওয়ার জন্য ঢাকামুখী বদলি চেষ্টার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই বাস্তবতা এক দিকে জনস্বার্থের বিচারে কাম্য নয়, অন্যদিকে সৎ জীবন যাপন করে সকল কর্মচারি কর্মকর্তার পক্ষে ঢাকায় সন্তানদের শিক্ষা খরচ মেটানো সম্ভব নয়। সুতরাং, মফস্বলের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিচারকসহ বদলিযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সন্তানদের ভর্তির সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. বিচারকদের আর্থিক সুবিধা

বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

মাসদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত ১২ দফা নির্দেশনার ৬ নম্বর দফায় বিচারকদের জন্য একটি আলাদা পে কমিশন গঠন করতে এবং উক্ত পে কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণের জন্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ অনুসারে সরকার ২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ জারি করে। বিধিমালার ৩ বিধির অধীনে এ পর্যন্ত মোট দুটি পে কমিশন গঠিত হয়েছে। বিচারকদের কাজের ধরন অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের ধরন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় উভয় পে কমিশন বিচারকদের আলাদা জুডিসিয়াল ভাতা প্রদানের সুপারিশ করে। ২য় পে কমিশন তাদের সুপারিশে উল্লেখ করে–

" জুডিসিয়াল ভাতাঃ

> বর্তমান কমিশন কর্তৃক সরকারের আর্থিক সামর্থ্য এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে বিদ্যমান বিশেষ ভাতার হার অক্ষুন্ন রেখে শুধুমাত্র সার্বক্ষণিক বিচারিক কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের পরিবর্তে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল পর্যায়ের সদস্যদের সার্বক্ষণিক বিচারিক কাজে, প্রেষণে বা অন্যবিধভাবে কর্মরত থাকাকালে তাঁদেরকে মাসিক মূল বেতনের ৩০% এর সমপরিমাণ হারে জুডিসিয়াল ভাতা প্রদান করার এবং উক্ত ভাতার অন্য কোন নাম না দিয়ে অবশ্যই 'জুডিসিয়াল ভাতা' নামে প্রচলনের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।"

কিন্তু সরকার পে কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি। পে কমিশনের রিপোর্টে ৩০% জুডিসিয়াল ভাতা প্রদানের সুপারিশ করা হলেও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর ২২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ প্রতিমাসে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত ভাতার সমপরিমাণ (প্রাপ্য অংকে) টাকা (মূল বেতনের শতাংশ হিসাবে নয়) জুডিসিয়াল ভাতা (বিশেষ ভাতা) প্রাপ্য হবেন। অর্থাৎ পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারকদের মাসিক প্রাপ্য মূল বেতনের ৩০% প্রদান করার কথা। কিন্তু আদেশে উক্ত ভাতা (১) ২০০৯ সালের স্কেলে নির্ধারণ করা হয় এবং (২) মূল বেতনের শতাংশ হিসাব ছাড়াই তা নির্ধারণ করা হয়, যা ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।

উল্লেখ্য যে, বিচারকদের কর্মের গুণগত মান বজায় রাখতে হলে ভবিষ্যতে পে কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই মাসদার হোসেন মামলার ৬ নং নির্দেশে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, "The pay etc of the judicial service shall follow the recommendations of the Commission"

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৩ নং বিধিটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পদাধিকারবলে সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় উক্ত কমিশনের একজন সদস্য। পে-কমিশন কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো প্রস্তাব থাকে যা বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা অর্থ সচিব পূর্বেই কমিশনকে অবহিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কমিশন ওইরূপ কোনো সুপারিশ করা হতে বিরত থাকবেন। কিন্তু পে কমিশন বিধিমালার ৪ বিধির (৭) উপবিধিতে বলা হয়েছে, "এই বিধির অধীনে প্রদত্ত সুপারিশ সরকার, যথাসম্ভব, অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিবে।" পে কমিশন বিধিমালায় এরূপ বিধানের অস্তিত্ব মাসদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত ৬ নং নির্দেশের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং তা পৃথক পে-কমিশন গঠনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে।

এমতাবস্থায়, পে কমিশন বিধিমালার ৪ বিধির (৭) উপবিধিটি বাতিল করে পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে এমন বিধান উক্ত উপবিধিতে সন্নিবেশিত করতে হবে।

সুপারিশ

> বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪ নং বিধির (৭) উপবিধিটি, "এই বিধির অধীনে প্রদত্ত সুপারিশ অনুসরণ করিয়া সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিবে।" এইরূপে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৬. বিচারকদের মর্যাদা

বিচারকগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। মাসদার হোসেন মামলায় বিচারকগণের কাজের ধরন কে সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তার কাজের ধরনের চাইতে সুস্পষ্টরূপে আলাদা চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, "But as oil and water cannot mix, the judicial and civil administrative executive services are non-amalgamable"।

অন্যদিকে বাংলাদেশ বনাম মো: আতাউর রহমান ও অন্যান্য মামলায়[২২] আপীল বিভাগ তাঁর প্রদত্ত রায়ে জেলাজজ ও সমপদমর্যাদার বিচারকদের সরকারের সচিবের সমমর্যাদা (ওয়ারেন্ট অব পিসিডেন্স এর ১৬ নম্বর ক্রমিকে) এবং অতিরিক্ত জেলাজজদের সরকারের সচিবের সমমর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তাদের (ওয়ারেন্ট অব পিসিডেন্স এর ১৭ নম্বর ক্রমিকে) সমমর্যাদা প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায়, মন্ত্রণালয় বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তরে কোনো বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উপরি-উল্লিখিত পদমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যহীন বা উল্লিখিত পদমর্যাদার নীচের কোনো পদে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা সমীচীন হবে না।

সুপারিশ

আইন ও বিচার বিভাগে বিচারকদের প্রেষণে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন করে বাংলাদেশ বনাম মো: আতাউর রহমান ও অন্যান্য মামলায়[২৩] বিচারকদের প্রদত্ত মর্যাদা অনুসারে প্রেষণে পদায়নের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি

বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি হিসেবে Bangalore Principles of Judicial Conduct বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় উক্ত আচরণবিধি সরাসরি প্রয়োগের সুযোগ নেই। বর্তমানে বিচারকদের ক্ষেত্রেও সরকারি কর্মচারিদের জন্য পালনীয় ১৯৭৯ সালের আচরণবিধি প্রযোজ্য, কেননা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ এর ২ নং বিধির (চ) (১) দফায় উল্লিখিত "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যগণের আচরণ বিধিমালা, ২০১৭" নামীয় বিধিটি এখনও প্রণীত হয়নি। এছাড়াও ক্রিমিনাল রুলস এন্ড অর্ডারস, ২০০৯ এর ৬৬৭ নং বিধির অধীনে 'বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা' তৈরি করা হয়েছে যা বিচারকদের মেনে চলতে হবে।

কিন্তু এই বিধিগুলোতে বিচারকগণ কীভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। এছাড়াও আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচারকগণ কর্তৃক পালনীয় আচরণ সম্পর্কে উল্লিখিত বিধিগুলো নিশ্চুপ।

এমতাবস্থায়, বিচারকদের জন্য পালনীয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি তৈরি ও জারি করা উচিত বলে কমিশন মনে করে, যার ব্যত্যয় ঘটলে সুপ্রীম কোর্ট বিচারকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে বিচারকদের জন্য পালনীয় এরূপ একটি খসড়া আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি দ্রষ্টব্য)। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শ করার পর উক্ত বিধিমালা আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করতে পারেন। ফলে বিচারকদের পালনীয় আচরণবিধি বিষয়ে আইনগত শূন্যতা বা জটিলতা থাকবে না।

সুপারিশ

১. *বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা*, ২০২৫[২৪] শিরোনামের খসড়া আচরণবিধিটি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করতে হবে।

---

[২২] ৬৯ ডিএলআর (এডি) (২০১৭) ১৭

[২৩] পাদটীকা ২২ দেখুন।

[২৪] পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

২. জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ এর ২ নং বিধির (চ) (১) দফায় উল্লিখিত "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যগণের আচরণ বিধিমালা, ২০১৭" প্রতিস্থাপন করে " বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা, ২০২৫" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

১. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের প্রাসঙ্গিকতা
১.১. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা
বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ এদেশের জনগণের শতাব্দীপ্রাচীন প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারগুলোর একটি। ১৯২১ সালে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়। এই মৌলিক নীতিটির বাস্তবায়নের যথার্থতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ।

১.২. মাসদার হোসেন মামলার রায়, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোকে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা
মাসদার হোসেন মামলার রায়ের ১২ দফা নির্দেশনার ৭ম দফায় উল্লেখ করা হয়, " It is declared that in exercising control and discipline of persons employed in the Judicial Services and Magistrates exercising Judicial functions under Article 115, the views and opinion of the Supreme Court shall have primacy over those of the Executive" রায়ের ৮ম দফার নির্দেশনায় বলা হয়, "The essential conditions of Judicial independence in Article 116A, elaborated in the judgment, namely (1) security of tenure, (2) security of salary and other benefits and pension and (3) institutional independence from the Parliament and the Executive shall be secured in the law or rules made under Article 133 or in the executive orders having the force of rules" এভাবে, মাসদার হোসেন মামলার রায়ের ৭ম ও ৮ম দফায় বিচার বিভাগের উপর সুপ্রীম কোর্টের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাব বলয় থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করে বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের এই দুই নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১.৩. হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা চর্চার মাধ্যম
সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আছে। আবার, ১১৬ অনুচ্ছেদ মতে, বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলাবিধান সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রযুক্ত হবে। এছাড়া, সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বিচারকার্য পালনে এবং ১১৬ক অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতে বিচারকদের বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু, সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব সচিবালয় না থাকলে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত উক্ত বিধানগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

১.৪. বিচার বিভাগের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা - একটি তিক্ত ও গ্লানিকর অভিজ্ঞতা

কার্যত সংবিধানের ২২, ৯৪(৪), ১০৯ এবং ১১৬ক অনুচ্ছেদের বিধান এবং মাসদার হোসেন মামলার রায়ের নির্দেশনা সত্ত্বেও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, শৃংখলা ইত্যাদি নির্বাহী বিভাগের আওতায় থেকে গিয়েছে। একইভাবে অধস্তন আদালতের বিচারকদের উপর সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন মন্ত্রণালয় - এ দুটি কর্তৃপক্ষের যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বহু সিদ্ধান্তের জন্য অধস্তন আদালতকে দুটি কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার বহুক্ষেত্রে একই কাজের জন্য একইসাথে দুই কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হতে হয় যা বিচার বিভাগের কার্যক্রমকে গতিহীন ও শ্লথ করে রেখেছে। বিচারকদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয় নির্বাহী বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকায় বিচার বিভাগ নিম্নবর্ণিতভাবে ক্ষতিগস্ত হচ্ছে:

প্রথমত, মন্ত্রণালয়ের প্রধান হলেন মন্ত্রী, যিনি মূলত একজন রাজনীতিবিদ। কাজেই আইন ও বিচার বিভাগের একজন মন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন বিচারকদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি, শৃংখলা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন অনেক ক্ষেত্রে সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার কারণে বহু বিচারককে মন্ত্রী তথা নির্বাহী বিভাগের রোষানলে পড়তে হয়েছে কিংবা নিপীড়নমূলক বদলির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে ৪টি বিধিমালা প্রণয়ন এবং ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনের মাধ্যমে বিচার বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেসি অংশ পৃথক করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের কারণে বিদ্যমান দ্বৈত শাসনের অংশ হিসেবে বিচার কর্ম বিভাগের সকল বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা সরকারের উপর নির্ভরশীল।

উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে আংশিক পৃথক হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিচার বিভাগ এখনো পুরোপুরি নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হতে পারেনি। এ কারণে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ পূর্ণাঙ্গ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক।

২. সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি অফিস কি সচিবালয়ের বিকল্প?

সংবিধানের ১০৯, ১১৬ ও ১১৬ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাংবিধানিক দায়িত্বের পরিধি ব্যাপক। অন্যদিকে, ২০০৭ সালে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি পৃথক করার আগে বিচার-কর্ম বিভাগে জনবল ছিলো প্রায় ৪৫০ জনের মতো। বর্তমানে দেশে প্রায় ২৩০০ বিচারক এবং ততোধিক সংখ্যক আদালত রয়েছে। বেশিরভাগ বিচারককে ২-৭টি অতিরিক্ত আদালতের বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। বর্তমানে জেলা ও দায়রা আদালত, মহানগর দায়রা আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মিলিয়ে কয়েক হাজার সহায়ক কর্মচারি নিয়োজিত আছেন। এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সাধন-ক্ষমতার চর্চা কীভাবে হবে? বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রিকে এই ত্রি-বিধ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার অতিরিক্ত হিসেবে। মাননীয় প্রধান বিচারপতির দপ্তর, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলিয়ে ২৫০০ এর অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারি সমন্বয়ে গঠিত এক সুবৃহৎ প্রশাসনিক কাঠামো হলো- সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি। এর প্রতিষ্ঠা হয় সংবিধানের ১০৭ ও ১১৩ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রণীত বিভিন্ন রুলসের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠার বছর ১৯৭২ সালে আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলিয়ে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিলো ২৪,৬২৩টি। আর ২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৩৬,৬০২টি। মামলা ও বিচারকের সংখ্যার তুলনায় বর্তমান কলেবর প্রায় ২২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি নিজেদের বিপুল কর্মযজ্ঞের ভারাক্রান্ত। এর উপর বর্ধিত আরো দায়িত্ব

সমগ্র বিচার প্রশাসনের গতিকে আরো মন্থর করবে। এটি সমাধানের প্রধান একটি উপায় হলো সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন। এতে বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি যে অবস্থায় আছে, সেই কাঠামো ও জনবলকে অক্ষুণ্ন রেখে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় একটি বর্ধিত কলেবরে তার বর্ধিত দায়িত্ব পালন করবে। কাজেই, সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি কোনোভাবেই পৃথক সচিবালয়ের বিকল্প হতে পারে না।

৩. সংবিধান ও বিচার প্রশাসন

অধস্তন আদালতের বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৯, ১১৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০৯	অনুচ্ছেদ ১১৫	অনুচ্ছেদ ১১৬
হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।	বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।	বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।

সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে তা প্রয়োগের সুবিধার্থে সংবিধানের ১১৫ ও ১৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭' এবং 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটিমঞ্জুরি, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০০৭' প্রণয়ন করেছেন। এই দুটি বিধিমালায় 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' হিসেবে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি এবং আইন মন্ত্রণালয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Rules of Business এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর Serial No. 29.A. এর এন্ট্রি ১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্ব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত। এতে উল্লেখ রয়েছে, "Administration of Bangladesh Judicial Service including posting, transfer etc. of judicial officers"। ফলে জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ রাষ্ট্রপতির পক্ষে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রযুক্ত হয়।

৪. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের আইনি কাঠামো

(ক) বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো

সংবিধানের ১১৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ বর্তমান অবস্থায় রেখে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে রাষ্ট্রপতিকে তার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের নিকট অর্পণ করতে হবে। এজন্য উপরিউক্ত দুটি বিধিমালায় উল্লিখিত "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" এর সংজ্ঞা এবং Rules of Business এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

(খ) সাংবিধানিক কাঠামো পরিবর্তন সাপেক্ষে

বিদ্যমান সংবিধানের **১১৬** অনুচ্ছেদ অনুসারে স্পষ্টতঃ সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা পরামর্শমূলক। সুতরাং, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শকের ভূমিকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। উপরের প্রস্তাবমতে নিয়ন্ত্রক হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য[২৫]।

৫. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা

সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে হবে। এতে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সচিবালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব, সচিবালয়ের কার্যপদ্ধতি, সচিবালয়ের বাজেট ও অর্থ ব্যয়, সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ, বেতন-ভাতা ইত্যাদি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ যথাযথ বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে।

৬. সচিবালয়ের জনবল, অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

দেশের বিচার বিভাগ এবং বিচার বিভাগের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, বিভাগ বা দপ্তর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের একটি সময়োপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এই সাংগাঠনিক কাঠামোতে দুটি ইউনিট থাকবে যথা সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট এবং বিচারকর্মবিভাগ ইউনিট। বিচার বিভাগের বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বাজেট ব্যবস্থার কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি বিচার বিভাগের আওতাধীন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের দৈনন্দিন কার্যক্রমের উপর তদারকি, বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা ও দপ্তর সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সচিবালয়ের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারেঃ

সচিবালয়ের অনুবিভাগ ও দপ্তর

সচিবের দপ্তর

অনুবিভাগ

১. প্রশাসন অনুবিভাগ
২. বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ
৩. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
৪. শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ
৫. গবেষণা ও সংস্কার অনুবিভাগ
৬. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ
৭. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
৮. পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ
৯. ই-জুডিসিয়ারি অনুবিভাগ
১০. রিপোর্ট অনুবিভাগ

---

[২৫] পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

অনুবিভাগগুলোর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের। প্রতি ২টি অনুবিভাগ সমন্বয়ের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ১০টি অনুবিভাগের জন্য ১০টি যুগ্মসচিব এবং ৫টি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন করতে হবে।

অনুবিভাগের আওতায় অধিশাখা ও শাখার গঠন হবে নিম্নরূপঃ -

১. প্রশাসন অনুবিভাগ

- ১. বিচার প্রশাসন অধিশাখা
    - ১. নিয়োগ ও প্রেষণ শাখা
    - ২. বদলি ও পদোন্নতি শাখা-১
    - ৩. বদলি ও পদোন্নতি শাখা-২

- ২. অভ্যন্তরীণ প্রশাসন অধিশাখা
    - ১. প্রশাসন শাখা
    - ২. ক্রয় শাখা

২. বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ

- ১. বাজেট অধিশাখা
    - ১. বাজেট শাখা-১
    - ২. বাজেট শাখা-২
    - ৩. বাজেট শাখা-৩

- ২. নিরীক্ষা অধিশাখা
    - ১. নিরীক্ষা শাখা-১
    - ২. নিরীক্ষা শাখা-২

৩. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

- ১. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-১
    - ১. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখা-১ (জজশিপ)
    - ২ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখা-২ (ম্যাজিস্ট্রেসি)
- ২. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-২
    - ৩. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখা-৩ (বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল)

৪. শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ

- ১. শৃঙ্খলা ও তদন্ত অধিশাখা-১ (আদালত)
    - ১. শৃঙ্খলা ও তদন্ত শাখা-১
    - ২. শৃঙ্খলা ও তদন্ত শাখা-২

- ২. শৃঙ্খলা ও তদন্ত অধিশাখা-২ (অভ্যন্তরীণ)

১. শৃঙ্খলা ও তদন্ত শাখা-৩

৫. গবেষণা ও সংস্কার অনুবিভাগ
১. গবেষণা অধিশাখা
১. গবেষণা শাখা-১
২. গবেষণা শাখা-২

২. সংস্কার অধিশাখা
১. সংস্কার শাখা-১
২. সংস্কার শাখা-২

৩. আইন অধিশাখা
১. আইন শাখা

৪. মামলা পরিবীক্ষণ অধিশাখা
১. মামলা পরিবীক্ষণ শাখা-১ (জজশিপ)
২. মামলা পরিবীক্ষণ শাখা-২ (ম্যাজিস্ট্রেসি, বিশেষ আদালত)

৬. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ
১. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অধিশাখা
১. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং শাখা-১
২. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং শাখা-২

২. প্রশিক্ষণ অধিশাখা
১. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ শাখা-১
২. বৈদিশক প্রশিক্ষণ শাখা-২

৭. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
১. পরিকল্পনা অধিশাখা
১. পরিকল্পনা শাখা-১
২. পরিকল্পনা শাখা-২

২. উন্নয়ন অধিশাখা
৩. উন্নয়ন শাখা-১
৪. উন্নয়ন শাখা-২

৮. পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ
১. পরিদর্শন অধিশাখা

১. পরিদর্শন শাখা-১ (জজশিপ)
২. পরিদর্শন শাখা-২ (ম্যাজিস্ট্রেসি)
৩. পরিদর্শন শাখা-৩ (বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল)

২. মূল্যায়ন অধিশাখা
১. মূল্যায়ন শাখা-১
২. মূল্যায়ন শাখা-২

৩. প্রটোকল অধিশাখা
১. প্রটোকল শাখা-১
২. প্রটোকল শাখা-২

৯. ই-জুডিসিয়ারি অনুবিভাগ
১. ই-জুডিসিয়ারি অধিশাখা
১. ই-জুডিসিয়ারি মনিটরিং শাখা
২. ই-জুডিসিয়ারি সমন্বয় শাখা

২. আইসিটি অধিশাখা
১. আইসিটি শাখা

১০. রিপোর্ট ও সমন্বয় অনুবিভাগ
১. রিপোর্ট অধিশাখা
১. রিপোর্ট শাখা-১
২. রিপোর্ট শাখা-২

২. পরিসংখ্যান অধিশাখা
১. পরিসংখ্যান শাখা-১
২. পরিসংখ্যান শাখা-২

৩. সভা অধিশাখা
১. সভা শাখা

৪. সমন্বয় ও সাপোর্ট অধিশাখা
১. অর্গানাইজেশনাল সার্পোট ও লজিস্টিক শাখা-১
২. অর্গানাইজেশনাল সার্পোট ও লজিস্টিক শাখা-২

সাংগঠনিক কাঠামোতে ২৫টি অধিশাখা এবং ৪৮টি শাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিশাখার দায়িত্বে থাকবেন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং শাখার দায়িত্বে থাকবেন সিনিয়র সহকারি সচিব/সহকারি সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। প্রত্যেক অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা এবং সেল/ইউনিটের জন্য পদ সৃজন করতে হবে। শুধু সাংগঠনিক

কাঠামো নয় সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিশেষ করে ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস স্থাপন করতে হবে। নির্মিত ভবন ও স্থাপিত অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সরবরাহ করতে হবে। এ ব্যাপারে সচিবালয়ের জন্য সুপ্রীম কোর্টের ভিতরে বা সুপ্রীম কোর্ট সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণপূর্বক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৭. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পর আইন মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান কাঠামো দুইটি ভাগে বিভক্ত। তার একটি হলো লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অন্যটি হলো আইন ও বিচার বিভাগ। Rules of Business1996 এর আওতায় প্রণীত Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions এর 29 নং ক্রমিকের ÔAÕ শিরোনামে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য মোট ৩৪ টি কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত ৩৪ টি কাজের মধ্যে ৮ টি কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, বদলি, পদায়ন, বাজেট, শৃঙ্খলা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। এই কার্যক্রমগুলো হলো ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, এবং ১৬ নম্বর ক্রমিকভুক্ত। উক্ত ৮টি কার্যক্রম ব্যতীত অবশিষ্ট ২৬টি কার্যক্রম অর্থাৎ ১, ২, ৩, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নম্বর ক্রমিকভুক্ত কার্যক্রম বর্তমানের মতো আইন ও বিচার বিভাগের পরিধিভুক্ত থাকতে পারে। সে হিসেবে বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে থাকা ৭টি অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সরাসরি সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের আওতাধীন হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট ৫টি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সলিসিটর অনুবিভাগ, নিবন্ধন অধিদপ্তর, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, সরকারি অছি ও সরকারি রিসিভার ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকবে। তদুপরি বর্তমানে বিদ্যমান আইন ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত অপরাপর বিষয়াদি যেমন, (১) আইনগত মতামত প্রদান (২) নোটারি পাবলিক সংক্রান্ত কার্যাবলি (৩) বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি ইত্যাদি আইন ও বিচার বিভাগের পরিধিভুক্ত থাকবে।

৮. আইন ও বিচার বিভাগের পদায়ন

সরকার কর্তৃক প্রণীত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখের নীতিমালা অনুসারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির পদগুলোতে প্রেষণে বদলি ও নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০০১ সালে উক্ত নীতিমালা প্রণীত হলেও ২০০৭ সালে মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে দুটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। উক্ত নীতিমালায় মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ আইন ও বিচার বিভাগের ৭৫% পদে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে পূরণের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের সহকারি সচিব, সিনিয়র সহকারি সচিব, উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব ও অতিরিক্ত সচিবসহ সলিসিটর নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের পর মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় নীতিমালার বেশ কিছু বিষয় বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আইন ও বিচার বিভাগের কার্যক্রমের বিস্তৃতিসহ এই বিভাগের অধস্তন প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একটি নতুন পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি ও বাজেটসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইন ও বিচার বিভাগ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের পরিধিভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইন ও বিচার বিভাগের পদায়ন নীতিমালায় প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

সন্নিবেশিত করতে হবে। Rules of Business, 1996 এর আওতায় প্রণীত Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগের অবশিষ্ট ২৬টি কার্যক্রম (ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪) যেহেতু আইন সম্পর্কিত বিষয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সেহেতু বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা উক্ত পদসমূহ পূরণ হওয়া সমীচীন। উক্ত বিভাগের আওতাধীন বিষয়সমূহ বিশেষায়িত হওয়ায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা দ্বারা পদসমূহ পূরণ করার সুযোগ নেই। এ কারণে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠাত্তোর আইন ও বিচার বিভাগের পদসমূহ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা পদায়নের বিষয়টি নীতিমালায় প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।

সুপারিশ

(১) বিচার বিভাগের পুর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন করতে হবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপনের জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে হবে।

(৩) Rules of Business, 1996 সংশোধন করতে হবে।

(৪) Allocation of Business সংশোধনের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগ এবং বিচার বিভাগীয় সচিবালয়ের কার্যপরিধি পৃথকীকরণপূর্বক স্ব স্ব কার্যপরিধি সন্নিবেশিত করতে হবে।

(৫) বিচার বিভাগের দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধি ও সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় নির্দেশমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৬) সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য পৃথক জনবল কাঠামো সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত ও অনুমোদন করতে হবে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত জনবলের পদ সৃষ্টিসহ অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এদেশের জনগণের জন্য "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার" নিশ্চিত করাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একইভাবে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে "সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত" করাকে উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধানে বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের তিনটি মূল অঙ্গের একটি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে দিয়ে।

সংবিধানের বিভিন্ন বিধানেও সামগ্রিক সুবিচারের ধারণাকে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যেমন, ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি। ২৭ অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের আশ্রয় লাভের সমানাধিকার, ২৮ অনুচ্ছেদে নারী পুরুষের সমানাধিকার ও নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধকরন, ২৯ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ ও পদ-লাভের ক্ষেত্রে সমতা এবং ৩১ অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র আনুনানুযায়ী ব্যবহারলাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সংবিধানে স্বীকৃত এসব মূলনীতি ও অধিকারকে জনসাধারণের জন্য প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাত্যয় ঘটলে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার প্রতিকার বিধানের দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের। বিচারিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব এবং তা প্রয়োগের পরিকল্প বিধৃত হয়েছে "বিচার বিভাগ" সংক্রান্ত সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগ এর কয়েকটি অনুচ্ছেদ। যেমন, ৯৪ অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা এবং বিচারকার্য পরিচালনায় প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের অন্য বিচারকদের স্বাধীনতা, ১০০ অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের আসন, ১০১ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার, ১০২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণসহ কতিপয় আদেশ ও নির্দেশদানে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার, ১১৪ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালন, এবং ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকদের স্বাধীনতার বিষয়ে বিধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। সুতরাং, তাদের জন্য সংবিধানে স্বীকৃত সুবিচারের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলোকে অর্থবহভাবে প্রয়োগ ও নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগকে ও আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাসম্ভব তাদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকে বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ যৌক্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য বলে কমিশন মনে করেন।

২. হাইকোর্ট বিভাগের কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোতে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে সংবিধান বা অন্য কোন আইনের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের উপর আদি, আপীল ও অন্যান্য বিষয়ে এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পনের বিধান রয়েছে। ১০২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের উপর সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার এখতিয়ার অর্পিত হয়েছে। এমনকি, ৪৪ অনুচ্ছেদে

মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করার অধিকারকেও একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার প্রধান স্থান হলো হাইকোর্ট বিভাগ।

এছাড়াও, সংবিধানের ১০২(২)(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের কৃত বা করণীয় কোনো কার্যক্রমের বিষয়ে জবাবদিহি করার এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। একইভাবে ১০২(২)(খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে কেবলমাত্র হাইকোর্ট বিভাগেরই কোন ব্যক্তির আটক থাকার বৈধতা এবং কোন ব্যক্তির সরকারি পদে আসীন থাকার বৈধতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দেয়ার এখতিয়ার রয়েছে।

হাইকোর্ট বিভাগের উপরিউক্ত বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ এখতিয়ারের কারনে বিচারপ্রার্থী জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাইকোর্ট বিভাগকে শেষ ভরসাস্থল হিসেবে বিবেচনা করে থাকে । হাইকোর্ট বিভাগে বর্তমানে বিচারাধীন প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মামলা এই নির্ভরশীলতারই ইঙ্গিত বহন করে।

বলা বাহুল্য, হাইকোর্ট বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেশের রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ হলো, হাইকোর্ট বিভাগের শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিচারপ্রার্থীর রাজধানীর মুখাপেক্ষী হওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সময় ব্যয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন পরিচালিত অনলাইন জরিপের অংশ হিসাবে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগ থাকা উচিৎ কি না এই প্রশ্নটি করা হয়েছিলো। নাগরিক, আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও অধস্তন আদালতের বিচারক - এই চার শ্রেণির উত্তরদাতার প্রদত্ত উত্তরের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

উত্তরদাতার শ্রেণি	ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের উপস্থিতির পক্ষে উত্তর	প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের উপস্থিতির পক্ষে উত্তর
নাগরিক	৯৩.৮%	৬৬.৪%
আইনজীবী	৮৫.৯%	৬৮.৬%
সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী	৬১.৩%	৪৫.২%
অধস্তন আদালতের বিচারক	৯৩.৯%	৭২.২%

সংস্কার কমিশনের সাথে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও জনসংখ্যা ও মামলার সংখ্যার বিবেচনায় ঢাকার বাইরে, অন্ততঃপক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে, হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের পক্ষে মতামত দেন।

সংবিধানে প্রথম থেকেই ১০০ অনুচ্ছেদের অধীনে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠানের বিধান থাকলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা লক্ষণীয়। এব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় সামরিক শাসনের অধীনে। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারি ও সংবিধান স্থগিত করার পর ৮ মে ১৯৮২ তারিখের ফরমান আদেশে বলা হয় যে, প্রধান সামরিক প্রশাসক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হাইকোর্টের একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করতে পারবেন। ৮ জুন ১৯৮২ তারিখে ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর ও যশোরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয় এবং পরে আরো তিনটি বেঞ্চ এই তালিকায় যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজধানীর বাইরে ৬ (ছয়) টি জেলা-সদরে (এর মধ্যে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ছিলো বিভাগীয় সদর দপ্তর) স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান সন্নিবেশ করে ১০০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়।

যেহেতু সামরিক শাসনের অধীনে এই বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, ফলে প্রথম থেকেই দেশের রাজনৈতিক মহল, ঢাকাস্থ আইনজীবীদের নেতৃস্থানীয় একটি অংশ ও নাগরিকসমাজের কিছু অংশ এই পদক্ষেপগুলোকে নেতিবাচকভাবে দেখে। অন্যদিকে, ঢাকার বাইরের আইনজীবীদের একটি অংশ বিকেন্দ্রীকরণকে স্বাগত জানায়। তবে এটাও ঠিক যে, হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণকে অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য অবকাঠামো ও জনবলখাতে যতটুকু অর্থ-সংস্থান ও মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল, সেব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল । ফলে, আইনাঙ্গনে স্থায়ী বেঞ্চ পরিচালনার বিষয়ে প্রধানত ঢাকার আইনজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে।

এরই এক পর্যায়ে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হলে, ৮ম সংশোধনী মামলার রায়ে (*আনোয়ার হোসেন* বনাম *বাংলাদেশ*[২৬]) সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের সংশোধনীকে সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

৮ম সংশোধনী মামলার সংখ্যাগরিষ্ট রায়ে ১০০ অনুচ্ছেদের বিষয়ে মূল যেসব আপত্তির উল্লেখ করা হয়, সেগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের নামে আসলে হাইকোর্ট বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছয়টি আদালত তৈরি করা হয়েছে, যেগুলোর ওপর হাইকোর্ট বিভাগের অনুরূপ পূর্ণ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলি অর্পণ করা হয়েছে। ফলে, সুপ্রীম কোর্টের কাঠামো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

(খ) একটি স্থায়ী বেঞ্চ থেকে অন্য কোনো স্থায়ী বেঞ্চে মামলা স্থানান্তরের কোন বিধান নেই। ফলে, প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চ একেকটি ভৌগলিক এলাকার জন্য স্বতন্ত্র ও আলাদা আদালতে পরিনত হয়েছে, যা হাইকোর্ট বিভাগকে ভেঙ্গে ফেলার সামিল।

(গ) স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের ফলে হাইকোর্ট বিভাগের এককত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে, যা রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্রেরও পরিপন্থী।

অন্যদিকে বিচারপতি এ.টি.এম আফজাল প্রদত্ত ভিন্ন মতামতের মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের ফলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট বিভাগ ধ্বংস হয়ে যায়নি, বা তাদের এখতিয়ার এমনভাবে আক্রান্ত হয়নি যার ফলে সংবিধান অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। সংশোধিত ১০০ অনুচ্ছেদের অধীন স্থায়ী বেঞ্চগুলোকে প্রদত্ত ভৌগোলিক এখতিয়ার প্রদানের মাধ্যমে ওই বেঞ্চগুলোর প্রতিটিকে একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে উদ্ভূত মামলা গ্রহনের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, কিন্তু বেঞ্চগুলোর ক্ষমতা প্রয়েগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভৌগলিক সীমারেখা আরোপ করা হয়নি।

(খ) ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চের কোন একজন বিচারক হাইকোর্ট বিভাগের অন্য বেঞ্চে আসীন অন্য যেকোন বিচারকের অনুরূপ এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(গ) একটি মামলার কোন একটি বিষয়বস্তু, যেমন মামলা উদ্ভবের কারণ (cause of action), মামলার পক্ষ, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি, অধিকার, দায়িত্ব, লঙ্ঘন, ইত্যাদির স্থান যদি কোন স্থায়ী বেঞ্চের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ওই বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করতে পারবে। যেমন, যদি ঢাকায় অবস্থিত কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ এমন একটি আদেশ জারি করে, যার ফলে রংপুরে অবস্থিত একটি সম্পত্তি আক্রান্ত হয়, তাহলে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে রংপুর এলাকার জন্য নির্দিষ্ট স্থায়ী বেঞ্চে অথবা ঢাকায় অবস্থিত বেঞ্চে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

[২৬] ১৯৮৯ বিএলডি (বিশেষ) ১

(ঘ) একটি স্থায়ী বেঞ্চে দায়ের করা মামলা যৌক্তিক কোন কারণে অন্য একটি স্থায়ী বেঞ্চে স্থানান্তরের বিধান থাকা উচিৎ। প্রকৃতপক্ষে, সংশোধিত অনুচ্ছেদ ১০০-এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬)-এর অধীনে এধরনের প্রয়োজনীয় ও সম্পূরক বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির রয়েছে।

৮ম সংশোধনী মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় এবং সংখ্যালঘু মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনে যে সাংবিধানিক কাঠামো ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিলো তার ত্রুটিগুলো নিরসনের মাধ্যমে পুনরায় এ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করা এবং তাদের ভোগান্তি কমানোর লক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ একটি জোরালো দাবি, যা সংস্কার কমিশন উপক্ষো করতে পারে না।

সুতরাং, কমিশন মনে করে যে, রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত আইনগত বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সংবিধানে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন:

(ক) রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে বিচারপতিদের মনোনয়ন করবেন এবং তাদের বিচার্য্য বিষয় নির্ধারণ করবেন।

(খ) প্রত্যেকটি স্থায়ী বেঞ্চ কোন্ কোন্ এলাকা থেকে উদ্ভূত মামলা গ্রহণ করতে পারবে তা বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট করা হবে। তা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) এমনভাবে বজায় রাখতে হবে, যেন স্থায়ী বেঞ্চগুলো স্থাপনের কারণে দেশের সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার কোন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিভাজিত (fragmented) না হয়, এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুণ্ন না হয়। অর্থাৎ, বিচারপ্রার্থী জনগণ যেন তাদের নিকটতম স্থায়ী বেঞ্চে মামলা দায়েরের সুবিধা পায়, কিন্তু একইসাথে বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেন তারা ভৌগলিক সীমারেখার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(গ) সংবিধানে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় সুস্পষ্ট বিধান থাকবে যে, কোন মামলার বিষয়বস্তু, যেমন: মামলার পক্ষদের ঠিকানা / অবস্থান, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবস্থান, মামলার কারন উদ্ভূত হওয়ার স্থান, ইত্যাদি, যেকোন একটি বিষয়ের সাথে কোন স্থায়ী বেঞ্চের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকার সংশ্লিষ্টতা থাকলে ওই বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করতে পারবে। তবে, মামলার বিষয়বস্তু বিবেচনার ক্ষেত্রে বা মামলায় আদেশ, নির্দেশ, রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ওই বেঞ্চের কোন ভৌগলিক সীমারেখা থাকবেনা, অর্থাৎ, মামলায় বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ভূ-খণ্ডের উপর উক্ত বেঞ্চের পূর্ণ এখতিয়ার (plenary jurisdiction) থাকবে। ফলে, হাইকোর্ট বিভাগের একক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের এক-কেন্দ্রিক (unitary) চরিত্র বজায় থাকবে।

(ঘ) কোনো স্থায়ী বেঞ্চে কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালে প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অন্য কোনো বেঞ্চে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবেন।

(ঙ) স্থায়ী বেঞ্চগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আদালত ও সহায়ক কার্যালয়, বিচারক ও সহায়ক জনবলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

(চ) সবগুলো স্থায়ী বেঞ্চ একই সাথে কার্যকর করা কঠিন বিবেচিত হলে প্রয়োজনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় সদরদপ্তরগুলোতে স্থায়ী বেঞ্চ কার্যকর করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সংবিধানে যথাযথ বিধান ও আনুষঙ্গিক বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ বিভাগীয় পর্যায়ে বিস্তৃত করা হলে বিচারপ্রার্থী জনগণের যেমন উপকার হবে তেমনি রাজধানীর অবকাঠামোর উপর সারাদেশের মানুষের অস্বাভাবিক চাপও কিছুটা লাঘব হবে।

৩. অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ

ন্যায়বিচারের জন্য জনসাধারণ প্রথমেই দ্বারস্থ হয় অধস্তন আদালতের। এ কারণেই বর্তমানে সারাদেশে বিচারাধীন ৪৩ লাখ মামলার সিংহভাগই (প্রায় ৩৮ লাখ) অধস্তন আদালতের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ, মূলত জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোই বিচারপ্রার্থীদের প্রথম গন্তব্য। একজন বিচারপ্রার্থী যদি কোন প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা হন, তাহলে যেকোন মামলা দায়ের বা মামলা মোকাবেলা করার জন্য জেলা-সদর পর্যন্ত তাকে যেতেই হয়। বাংলাদেশে এখনও এমন গ্রাম রয়েছে, যেখান থেকে গণপরিবহনে জেলা-সদরে যেতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। সুতরাং, গ্রাম–ভিত্তিক দেশের অধিকাংশ জনগণের জন্য বিচারপ্রাপ্তিকে সহজলভ্য করতে হলে অধস্তন আদালতকে আরো স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি।

১৯৮২ সালে দেশের সব উপজেলায় সহকারি জজ পর্যায়ের বিচারকদের নেতৃত্বে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়েছিলো। আদালতগুলো ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠি স্থানীয় পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণের ফলে খুবই উপকৃত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের আইজীবীরা উপজেলা আদালতে নিয়মিত মামলা পরিচালনা করতে থাকেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে জেলা পর্যায়ের আইনজীবীরাও উপজেলা আদালতে মামলা পরিচালনা করতে আসতেন। আদালতের সহজগম্যতার কারণে মামলার পক্ষদের হাজিরা এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়, ফলে মামলা নিষ্পত্তি সহজতর ও দ্রুততর হয়। এর ফলে দরিদ্র, নারী ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত বিচারপ্রার্থীরা বেশি উপকৃত হন।

১৯৯১ সালে উপজেলা আদালতগুলো প্রত্যাহারের পর দেশের বিভিন্ন উপজেলা সদরে বর্তমানে ৬৭টি "চৌকি আদালত" চলমান রয়েছে। এই আদালতগুলো খুবই অপ্রতুল প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনে পরিচালিত হয়। চৌকি আদালতের বিচারকরা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহায়ক জনবল স্থায়ীভাবে উপজেলা পর্যায়ে বসবাস করেন না, বরং প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁরা জেলা সদর থেকে যাতায়ত করেন। ফলে আদালতের সময়ানুবর্তিতা অনেকক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিচারক কোন কারণে আদালতে আসতে না পারলে মামলার তারিখ থাকা সত্ত্বেও বিচারপ্রার্থীদের ফিরে যেতে হয়।

সাধারনভাবে বলা যায় যে, চৌকি আদলতগুলোর কোন স্থায়ী অবকাঠামো বা জনবল নেই। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই অন্য কোন সরকারি ভবনে কয়েটি কক্ষ ধার করে চৌকি আদালত চালাতে হয়। আদালতের নিজস্ব কোন যানবাহন না থাকায় বিচারক ও সহায়ক কর্মচারিদের গণপরিবহনযোগে কর্মক্ষেত্রে আসতে যেতে হয়। এর ফলে সময়মত ও নিয়মিত আদালত পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে যে বিদ্যমান চৌকি আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের বিচারপ্রাপ্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। উপজেলা পর্যায়ে আদালত পরিলনার মাধ্যমে অর্থবহ ও কার্যকরভাবে জনসাধারণের জন্য সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ীভাবে আদালত স্থাপন ও পরিচালনা করা অপরিহার্য।

তবে কমিশন এটাও মনে করে যে বর্তমান বস্তবতায় ঢালাওভাবে দেশের সবকটি উপজেলায় স্থায়ী আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই। কারণ অনেকক্ষেত্রেই উপজেলা এলাকা থেকে জেলা সদরে যাতায়াত আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাছাড়া, অনেক জায়গায় ভৌগোলিকভাবেই জেলা-সদর ও উপজেলা-সদরের অবস্থান এমন যে তাদের মধ্যে দূরত্ব খুবই অল্প। তাই সাধারণ মানুষের বিচারপ্রাপ্তির সুবিধার দৃষ্টিকোন থেকে সকল উপজেলা সদরে স্থায়ী আদালত স্থাপনের বাস্তব প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠানর জন্য কমিশন প্রস্তাব করছেঃ-

(ক) উপজেলা সদরের ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, জেলা-সদর থেকে দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিন্যাস এবং মামলার চাপ বিবেচনা করে কোন্ কোন্ উপজেলায় স্থায়ী আদালত স্থাপন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) বর্তমানে যেসব উপজেলায় চৌকি আদালত পরিচালিত হয়, সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সবগুলো চৌকি আদালতকেই স্থায়ী আদালতে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন, না কি সেক্ষেত্রেও পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের সুযোগ করেছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

(গ) বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে উপজেলা-সদরে স্থাপিত কোনো আদালতের জন্য একাধিক উপজেলাকে সমন্বিত করে অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করার প্রয়োজন হলে, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(ঘ) উপজেলা আদালতগুলোতে সিনিয়র সহকারি জজ ও প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের বিচারকদের পদায়ন করতে হবে। দেওয়ানি মামলা গ্রহনে সিনিয়র সহকারি জজ-এর আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি করে বাস্তবানুগ করাও প্রয়োজন।

(ঙ) আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে হবে[২৭]।

সিভিল কোর্টস্ অ্যাক্ট, ১৮৮৭ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ – এর বিদ্যমান বিধানগুলোর অধীনেই উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে কোন সম্পূরক বিধানও প্রণয়ন করা যেতে পারে।

উপজেলাস্তরে আদালতের সম্প্রসারণ ছাড়াও বিচারপ্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিতকরণে বৃহত্তর মহানগরগুলোতেও আদালতব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন[২৮]।

[২৭] এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য অষ্টাদশ অধ্যায় দেখুন।

[২৮] একাদশ অধ্যায়ে এসব এলাকার আদালতের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়
স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস

১. সরকারি মামলা পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলায় জড়িত পক্ষগণের ধরন বিচারে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

- অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে।
- দেওয়ানি মামলাগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশে সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকে।
- হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় সকল মামলায় সরকার পক্ষভুক্ত থাকে।

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদকে একটি সাংবিধানিক পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূলত সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু তাঁকে সহায়তা করার জন্য তিনটি স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলেও তাদের বিষয়ে সংবিধানে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

এছাড়াও জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোতে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য তিনটি স্তরের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দুইটি স্তরের গভর্নমেন্ট প্লিডার রয়েছেন।

২. অ্যাটর্নি সংক্রান্ত বর্তমান বিধানাবলি

২.১. অ্যাটর্নি জেনারেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করেন।

> ৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন।
> (২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।
> (৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংরাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।
> (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

অ্যাটর্নি-জেনারেলের চাকরি শর্তাবলি Attorney-General (Terms and Conditions of Service) Rules, 1973 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.২. অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল

রাষ্ট্রপতি The Bangladesh Law Officers Order, 1972 এর অধীন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করেন। তাদের চাকরির শর্তাবলি Law Officers (Terms and Conditions of Service) Rules, 1973 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৩. পাবলিক প্রসিকিউটর ও গভর্নমেন্ট প্লিডার

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৪৯২ - ৪৯৫ ধারার মাধ্যমে পাবলিক প্রসিডিউটর সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার ম্যানুয়েলে গভর্নমেন্ট প্লিডার নিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এর বাইরে সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য বিস্তারিত কোন আইনী কাঠামো নেই।

৩. বর্তমান ব্যবস্থার সমস্যা

৩.১ এ যাবত অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সকল স্তরের আইন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং অপ্রতুল আইনি কাঠামোর আওতায়। আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে জবাবদিহিতার কোনো আইনি কাঠামো নেই। যোগ্যতা বা দক্ষতা বা সততা নয়, মূলত আইন কর্মকর্তাগণের নিয়োগকে বিবেচনা করা হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে।

সম্প্রতি নির্মিত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ব্যতীত জেলা পর্যায়ে কোনো আইন কর্মকর্তার জন্য পৃথক অবকাঠামো, সহায়ক জনবল, বাজেট বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার সাথে আইন কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ বা গুরুত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। জেলা পর্যায়ের আইন কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক অতি নগণ্য। কমিশনের সাথে মতবিনিময়ের সময় ঢাকা জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এবং গভর্নমেন্ট প্লিডার (জিপি) জানান যে তাঁদের মাসিক সম্মানি/পারিশ্রমিক মাত্র **১৫** হাজার টাকা।

সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে উপরে বর্ণিত পরিস্থিতি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। এরূপ অ্যাটর্নি সার্ভিসের উদাহরণ প্রতিবেশি দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

৩.২ স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের ধারণাটি নতুন নয়

১৯৯৬ সালের আইন কমিশন আইনের ৬ ধারায় উক্ত আইনের অধীনে গঠিত আইন কমিশনের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৬। (ক) ধারার দফা (৬) অনুসারে আইন কমিশনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে একটি হলো:

> "ফৌজদারি মামলার অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার এবং সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি অধিকতর দক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ তত্সম্পর্কে গ্রহণীয় পদক্ষেপের সুপারিশ" করা।

উক্ত আইন প্রণয়নের প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধরনের একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নি।

৪. প্রস্তাবিত স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য:

- অ্যাটর্নি সার্ভিস হবে একটি স্থায়ী পেনশনযোগ্য সরকারি চাকরি।
- সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান সম্বলিত আইন থাকবে।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট বরাদ্দ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা থাকবে।

- প্রস্তাবিত সার্ভিসের দুটি শাখা থাকবে: (ক) সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং (খ) সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং জেলা অ্যাটর্নি সমন্বয়ে গঠিত জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস।
- চাকরির শর্ত অনুযায়ী জেলা ইউনিটের কর্মকর্তাদের আন্তঃজেলা বদলি, জেলা ইউনিট থেকে সুপ্রীম কোর্ট ইউনিটে বদলি ও পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।
- সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন অ্যাটর্নি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক, আর্থিক, অবকাঠামো এবং সহায়ক জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের একটি পৃথক ইউনিটের উপর।
- জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসে কর্মরত সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটর প্রতিটি তদন্তযোগ্য মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।
- প্রসিকিউটর কর্তৃক তদন্ত তত্ত্বাবধান বা মামলা পরিচালনায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।
- স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রস্তাবে ক্রান্তিকালীন বিধান রাখা হবে যাতে প্রস্তাবিত রূপরেখা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেও অ্যাটর্নি সার্ভিস কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

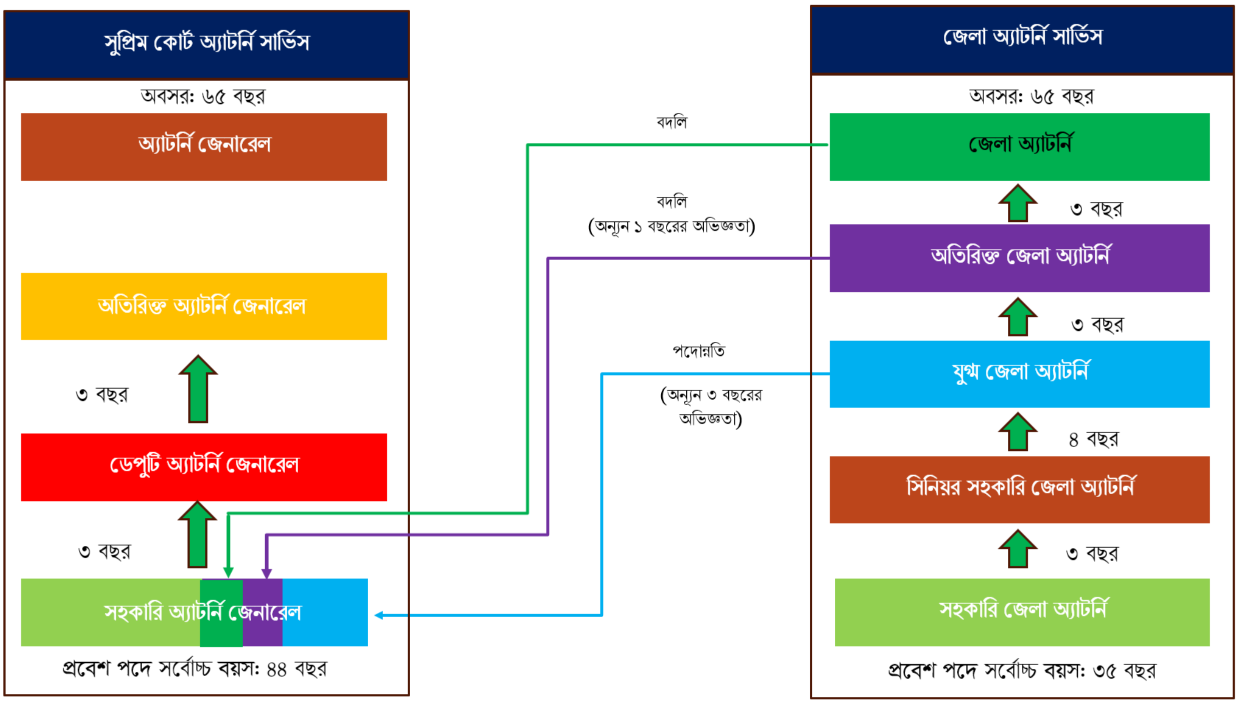

সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস ও জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের জনবল কাঠামোর রূপরেখা

৫. জাতীয় অ্যাটর্নি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

৫.১. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

১. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস সুপ্রীম কোর্টসহ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের আদালতে সরকারের পক্ষ মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

২. দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সার্ভিস স্বাধীন থাকবে।
৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস ও জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস নামে জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের দুটি শাখা থাকবে।
৪. সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সরকারি আইন কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন।
৫. সার্ভিসের যে কোন শাখায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মচারি এবং প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হিসেবে গণ্য হবেন।

৫.২. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস পরিচালনার মূলনীতি

অর্পিত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করবে:

১. ন্যায়বিচার;
২. আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার প্রতিরোধ;
৩. জনস্বার্থ।

৫.৩. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের কর্মপরিধি

১. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে সরকারের পক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করবেন।
২. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সুপ্রীম কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সুপ্রীম কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের বা পরিচালনার বিষয়ে অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদ্দুদ্দেশ্যে মনোনীত কোন কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ গ্রহণ করবেন।
৪. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, সরকারের পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়াও ঢাকায় বা ঢাকার বাহিরে অবস্থিত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালেও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করতে পারবেন।
৫. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্তি অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল ও সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলদের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।
৬. সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারিটেনডেন্টের [কোন আইনের অধীন বা দ্বারা কোন মহানগর এলাকায় পৃথক মহানগর পুলিশ বা আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের স্থলে পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমতে, উপ-পুলিশ কমিশনার] সঙ্গে [জাতীয় তদন্ত সংস্থা স্থাপিত হলে জেলা তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে] প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করবেন।
৭. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ, সরকার বা জেলা অ্যাটর্নি কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, সংশ্লিষ্ট জেলায় Civil Courts Act, 1887 বা Code of Criminal Procedure, 1898 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সাধারণ দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত ছাড়াও, অন্য কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন আদালতেও সরকারের পক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে পারবেন।
৮. সরকারের পক্ষে কোন আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি, উভয়বিধ, মামলা পরিচালনার বিষয়ে জেলা অ্যাটর্নির সঙ্গে সার্বিক সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকবে।
৯. অ্যাটর্নি জেনারেলসহ অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের অ্যাটর্নিগণ সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিগত বা বেসরকারি মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না।

৫.৪. ফৌজদারি মামলার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা

১. আপাতত বলবত কোন আইনে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত শেষে, যদি সার্ভিসের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সংগৃহিত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে উক্ত অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে না, সেই ক্ষেত্রে সার্ভিস উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে, মামলা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

২. কোর্ট মার্শাল ব্যতীত অন্য সকল ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে সার্ভিস মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে পারবে;

৩. অন্য ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ফৌজদারি মামলার পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারবে;

৪. ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এই মর্মে তথ্য পাওয়ার পর, পুলিশ বা অন্য কোন ফৌজদারি অপরাধ তদন্তকারী সংস্থাকে, তদন্ত করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে;

৫. উপরিউক্ত বিধান প্রাথমিক শুনানি, সংক্ষিপ্ত শুনাানিসহ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ সহ আপাতত বলবত অন্য যে কোন ফৌজদারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৫.৫. অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা

The Extradition Act, 1974 (Act No. LVIII of 1974), অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এবং আপাতত বলবত অন্যান্য আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সার্ভিস, নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:-

১. ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বহিঃসমর্পণ;

২. অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা।

৬. জাতীয় অ্যাটর্নি অধিদপ্তর

১. সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ***জাতীয় অ্যাটর্নি অধিদপ্তর*** নামে একটি অধিদপ্তর থাকবে।

২. অধিদপ্তরের একজন মহা-পরিচালক থাকবে এবং অধিদপ্তরের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি থাকবে। সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দান করবে।

৩. মহা-পরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হবেন এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি তার অধস্তন হবেন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকবেন।

৪. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে নিয়োগ করা হবে। তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মহা-পরিচালক, অধিদপ্তরের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে, অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন ও অনুরূপ সরকারি পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলি অসুসরণ সাপেক্ষে, নিয়োগ দান করবেন।

৫. অধিদপ্তর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত থাকবে।

৬. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে।

৭. প্রতিটি জেলা সদরে, যতদূর সম্ভব, জেলা আদালতে কিংবা জেলা আদালতের সন্নিকটে, অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থাকবে।

৮. অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থেকে জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

৬.১. অধিদপ্তরের কর্মপরিধি

১. অধিদপ্তর জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের উপর তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের অধস্তন গণ্য হবেন।

২. অধিদপ্তর জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের উভয় শাখাকে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক সেবা প্রদান করবে।

৩. অধিদপ্তর সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত উন্নয়নে, স্বীয় উদ্যোগে এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায়, নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৬.২. মামলা পরিচালনার বিশেষায়িত সেল

১. বিভিন্ন ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত সেল গঠন করবে। যেমন: নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক সেল, সাইবার সেল, মুদ্রা পাচার সেল, দুর্নীতি দমন সেন, সন্ত্রাস বিষয়ক সেল, ইত্যাদি।

২. বিশেষায়িত সেলগুলো সারা দেশে বিভিন্ন আদালতে সেল সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় সহায়তা করবে।

৭. অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

৭.১. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

১. বিচার ও মামলা সম্পর্কিত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ অ্যাটর্নি-জেনারেল এর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং তদুদ্দেশ্যে উক্ত শাখায় নিযুক্ত অবশিষ্ট অ্যাটর্নিগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাঁর অধস্তন গণ্য হবেন।

২. চাকরি সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট শাখায় নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারির উপর মহা-পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁরা মহা-পরিচালকের অধস্তন হবেন।

৭.২. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ জেলা অ্যাটর্নির উপর ন্যস্ত থাকবে, এবং জেলা অ্যাটর্নি, জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রধান নির্বাহী হবেন এবং উক্ত জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের অবশিষ্ট অ্যাটর্নিগণসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবেন।

৮. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ

৮.১. নিয়োগ পদ্ধতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি এবং ক্রান্তিকালীন বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে ছক **১** ও **২** এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হবে।

৮.২. সরাসরি নিয়োগ

১. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত, জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের কোন প্রবেশ পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ দান কারা যাবে না।

২. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রবেশ পদ হবে সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রবেশ পদ হবে সহকারি জেলা অ্যাটর্নি। সহাকারি অ্যাটর্নি জেনারেলের ৫০% পদে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগদান করা হবে।

৩. কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি অযোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইইল না হন;

(খ) তিনি দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

৪. কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি-

(ক) উক্ত পদের জন্য তাঁর নির্ধারিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁর বয়স উক্ত পদের জন্য ছক - **১** এবং ছক - **২** এ বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;

(খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমতে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতবাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে; এবং

(গ) তাঁর পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

৮.৩. পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ

১. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাবে।

২. চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হলে, কোন ব্যক্তি পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ

(ক) জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের অন্যূন তিন (৩) বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলের সর্বোচ্চ ২৫% পদ পূরণ করা যাবে।

(খ) সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের অন্যূন তিন (৩) বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলগণের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের সর্বোচ্চ ২৫% পদ পূরণ করা যাবে।

(গ) সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের অন্যূন তিন (৩) বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলগণ উক্ত সার্ভিসের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন।

৮.৪. শিক্ষানবিশদের চাকরিতে স্থায়ীকরণ

১. সার্ভিসের যে কোন শাখার প্রবেশ পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষানবিশের স্তরে যোগদানের তারিখ হতে এক বছরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগ করা হবে। তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বছরের জন্য বৃদ্ধি করতে পারবে।

২. শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে তাঁর আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নয় বা তার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই মনে করলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ প্রদর্শনসহ তাঁর চাকরির অবসান ঘটাতে পারবে।

৩. শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদসহ (যদি থাকে), পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহলে, তার চাকরি স্থায়ী করবে; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহলে, কারণ প্রদর্শনসহ, তার চাকরির অবসান ঘটাতে পারবে।

৪. শিক্ষানবিশদের জন্য যেসব পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে, কোন শিক্ষানবিশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা যাবে না।

৮.৫. অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

১. সরকার, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ২০ শতাংশ পদ, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে পারবে।

২. চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেলণ জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন না।

৮.৬. কর্মস্থল নির্ধারণ, বদলি, ইত্যাদি

১. উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রিকরণের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলগণ আন্তঃআদালত বদলিযোগ্য হবেন। তবে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাটর্নিগণ, তাদের সম্মতি ব্যতীত, বদলিযোগ্য হবেন না।

২. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত অ্যাটর্নিগণ আন্তঃজেলা বদলিযোগ্য হবেন। তবে জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাটর্নিগণ, তাদের সম্মতি ব্যতীত, বদলিযোগ্য হবেন না।

৮.৭. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস থেকে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসে বদলি

১. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নিকে সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে বদলি করতে পারবে।

২. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের স্বীয় পদে অন্যূন এক (১) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিকে সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে বদলি করতে পারবে।

৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলের পদের সর্বোচ্চ ২৫% ভাগ জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নি ও অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য থেকে বদলির মাধ্যমে পূরণ করা যাবে।

৪. **সার্ভিস হতে প্রেষণে নিয়োগ:** জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের যে কোন শাখা হতে অ্যাটর্নিগণকে সরকার অন্যত্র সমপর্যায়ভুক্ত পদে সাময়িকভাবে প্রেষণে নিয়োগদান করতে পারবে।

৮.৮. সুপ্রীম কোর্ট শাখায় স্থায়ী নিয়োগ

১. সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ৫০% পদে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরাসরি স্থায়ী নিয়োগদান করবে।

২. সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ২৫% পদ জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিগণ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে ছক - **১** এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, পূরণ করবে।

৩. সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ২৫% পদ জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নি ও অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিগণ হতে বদলির মাধ্যমে ছক - **১** এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, পূরণ করবে।

৯. চাকরির শর্তাবলি

৯.১. চাকরির সাধারণ শর্তাবলি

১. প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্যেষ্ঠতাসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি, জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২. সরকার আইন দ্বারা অ্যাসিস্ট্যান্স টু জাস্টিস কমিশন (Assistance to Justice Commission) প্রতিষ্ঠা করবে। উক্ত কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৯.২. বেতন, ভাতা, ইত্যাদি

সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, আদেশ ও বিধিমালা জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৯.৩. অবসর গ্রহণের সময়সীমা

১. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের বিভিন্ন অ্যাটর্নি পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ৬৫ বছর বয়স হলে চাকরি হতে অবসরপ্রাপ্ত হবেন।

২. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তির কোন নির্ধারিত বয়সসীমা থাকবে না।

১০. ক্রান্তিকালীন বিধান

১০.১. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিসে বিশেষ নিয়োগ

১. সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে এবং অন্যূন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন।

২. এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীর বয়স আবেদন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিনে-
(ক) অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর; এবং
(খ) ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫০ বছর, হতে হবে।

৩. কোন ব্যক্তি এককালীন সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি তিনি -
(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইইল না হন;
(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করেন অথবা বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন।

৪. কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি-
(ক) উক্ত পদের জন্য তাঁর ছক - ১ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাঁর বয়স উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;
(খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমতে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতবাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।
(গ) তাঁর পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

৫. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ
(ক) একই পদে একাধিক ব্যক্তিকের নিয়োগদান করা হলে, আইন পেশায় যিনি জ্যেষ্ঠতর ছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠতর হবেন।
(খ) কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই তারিখে আইন পেশায় যোগদান করে থাকলে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা দ্বারা উক্ত পদে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।
(গ) পরবর্তী পর্যায়ে কোন পদে বাছাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়োগকৃক কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অথবা আইন পেশায় জ্যেষ্ঠতর হওয়ার কারণে, উক্ত পদে পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর হবেন না।

৬. কোন পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে কেউ ইতোপূর্বে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে দায়িত্ব পালন করে থাকলে, উক্ত পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করে প্রার্থী বাছাই করবে এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

৮. বিশেষ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলের নির্ধারিত সংখ্যক পদে একবারে কিংবা পর্যায়ক্রমে সরাসরি নিয়োগ দান করা যাবে।

৯. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকতাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. সরকার, বিশেষ ব্যবস্থায় নিযুক্ত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলকে তাদের মূল বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত যথাক্রমে ১০০ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা প্রদান করতে পারবে।

১১. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার দুই বছর পর বিশেষ ব্যবস্থায় কোন নিয়োগদান করা যাবে না।

১০.২. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসে বিশেষ নিয়োগ

১. বাংলাদেশে আইন পেশায় অন্যূন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ জেলা অ্যাটর্নি পদে, অন্যূন ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নি পদে, অন্যূন ৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নি পদে, এবং অন্যূন ৪ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি পদে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন।

২. এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীর বয়স আবেদন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিনে-
   (ক) জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫৪ বছর;
   (খ) অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর;
   (গ) যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৪২ বছর; এবং
   (ঘ) সিনিয়র সহকারি জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৩৮ বছর।

৩. কোন ব্যক্তি এককালীন সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি তিনি -
   (ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইইল না হন;
   (খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করেন অথবা বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন।

৪. কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি-
   (ক) উক্ত পদের জন্য তাঁর ছক - ২ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাঁর বয়স উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;
   (খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমতে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতবাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।
   (গ) তাঁর পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

৫. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ
   (ক) একই পদে একাধিক ব্যক্তিকের নিয়োগদান করা হলে, আইন পেশায় যিনি জ্যেষ্ঠতর ছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠতর হবেন।
   (খ) কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই তারিখে আইন পেশায় যোগদান করে থাকলে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা দ্বারা উক্ত পদে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।
   (গ) পরবর্তী পর্যায়ে কোন পদে বাছাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অথবা আইন পেশায় জ্যেষ্ঠতর হওয়ার কারণে, উক্ত পদে পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর হবেন না।

৬. কোন পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে কেউ ইতোপূর্বে গভর্নমেন্ট প্লিডার, সহকারি গভর্নমেন্ট প্লিডার, লোকাল গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর পদে দায়িত্ব পালন করে থাকলে, উক্ত পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করে প্রার্থী বাছাই করবে এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

৮. বিশেষ ব্যবস্থায় জেলা-অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নি এবং যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নি এবং সিনিয়র সহকারি জেলা-অ্যাটর্নির নিধারিত সংখ্যক পদে একবারে কিংবা পর্যায়ক্রমে সরাসরি নিয়োগ দান করা যাবে।

৯. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকতাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. সরকার, এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় নিযুক্ত জেলা-অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নি এবং যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নিকে তাদের মূল বেতনের সাথে অতিরিক্ত যথাক্রমে ১০০ শতাংশ, ৭৫ শাতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা প্রদান করবে।

১১. এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার দুই বছর পর এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় কোন নিয়োগদান করা যাবে না।

১১. বেসরকারি পরামর্শক নিয়োগ

১. সরকার, প্রয়োজনে, নিধারিত শর্তে, যে কোন আদালতে সরকারের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট মামলার প্রস্তুতি ও পরিচালনায় পরামর্শ প্রদানের জন্য বেসরকারি পরামর্শক নিয়োগ করতে পারবে।

২. পরামর্শক উল্লিখিত মামলার পক্ষে বা বিপক্ষে আদালতে বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।

৩. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীতআইন কার্যকর হওয়া পাঁচ বছর পর কোন বেসরকারি পরামর্শক নিয়োগদান করা যাবে না।

১২. সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন বা উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তার জন্য সরকার বা সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না।

১৩. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের বাৎসরিক প্রতিবেদন

১. মহা-পরিচালক প্রতি ক্যালেন্ডার বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সার্ভিসের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরি করে জাতীয় সংসদ, আইন ও বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রধান বিচারপতিকে প্রেরণ করবে।

২. উক্ত প্রতিবেদনে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে:
   (ক) সরকার পক্ষ এইরূপ দেওয়ানি, ফৌজদারি ও অন্যান্য মামলার জেলা ভিত্তিক শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান;
   (খ) বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্তদের শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান;
   (গ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে সংশোধিত অভিযোগের সংখ্যা;
   (ঘ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে প্রত্যাহারকৃত এবং সংযোজিত অভিযোগের সংখ্যা;
   (ঙ) জিআর ও সিআর মামলার পরিসংখ্যান;
   (চ) বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি মামলার বিচার সম্পন্ন হইতে অতিক্রান্ত সময়;
   (ছ) জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পরিসংখ্যান;
   (জ) সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস আইন ও বিধিমালার বিভিন্ন প্রায়োগিক সমস্যা।

১৪. আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধন

১. একটি আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত সার্ভিসকে কার্যকর করার জন্য যাবতীয় বিধান, যতদূর সম্ভব, মূল আইনেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন/অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করবে।

৩. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং এই আইন বাস্তবায়নের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং অন্যান্য যেসব আইনে পাবলিক প্রসিকিউটর কিংবা পাবলিক প্লিডারের উল্লেখ আছে সেসব আইনে সংশোধনী আনা হবে।

৪. The Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P. O. No. 6 of 1972) রহিত করা হবে। রহিত করা হলেও, উক্ত রহিত আইনের অধীন নিযুক্ত কোন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল, বিশেষ আদেশ দ্বারা নিজ নিজ পদ হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, নিজ নিজ পদে, জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত, নিয়োগের সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শর্তে বহাল থাকবেন।

৫. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, বর্তমান ব্যবস্থায় নিযুক্ত গভর্নমেন্ট প্লিডার, সহকারি গভর্নমেন্ট প্লিডার, লোকাল গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটরগণ, বিশেষ আদেশ দ্বারা নিজ নিজ পদ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, নিজ নিজ পদে, উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শর্তে বহাল থাকবেন।

৬. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ছক - ১ ও ছক - ২ এ বর্ণিত শর্তাবলি সংশোধন করতে পারবে।

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে যা ইতোমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।

ছক-১
নিয়োগ পদ্ধতি: সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস

ক্রমিক	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১.	অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল	-	(১) ৮০ শতাংশ পদ ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেলগণের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে। (২) ২০ শতাংশ পদ সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত আইনজীবীদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে: ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে অন্যূন তিন (৩) বছরের চাকরি। (২) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে: সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় অন্যূন বিশ (২০) বছরের অভিজ্ঞতা।
২.	ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল	-	(১) ৮০ শতাংশ পদ সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে। (২) ২০ শতাংশ পদ সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত আইনজীবীদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে: সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে অন্যূন তিন (৩) বছরের চাকরি। (২) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে: সুপ্রীম কোর্টের আইন পেশায় অন্যূন পনের (১৫) বছরের অভিজ্ঞতা।
৩.	সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল	৪৪ বছর	(১) ৫০ শতাংশ পদ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। (২) ২৫ শতাংশ পদ ফুল-জেলা অ্যাটর্নিদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে। (৩) ২৫ শতাংশ পদ জেলা অ্যাটর্নি এবং অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিদের মধ্য থেকে বদলির মাধ্যমে।	(১) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় অন্যূন পাঁচ (৫) বছরের অভিজ্ঞতা; তবে শর্ত থাকে যে, আইন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা, ক্ষেত্রমতে, আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে। (২) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে: ফুল-জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যূন ৪ (চার) বছরের চাকরি। (৩) বদলির ক্ষেত্রে: অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যূন ১ বছরের চাকরি।

ছক-২
নিয়োগ পদ্ধতি: জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস

ক্রমিক	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১.	জেলা অ্যাটর্নি	-	অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে	অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যূন চার (৪) বছরের চাকরি
২.	অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি	-	যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে	যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যূন চার (৪) বছরের চাকরি
৩.	যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি	-	সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নিদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে	সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যূন চার (৪) বছরের চাকরি
৪.	সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি	-	সহকারি জেলা অ্যাটর্নিদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে	সহকারি জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যূন তিন (৩) বছরের চাকরি
৫.	সহকারি জেলা অ্যাটর্নি	৩৫ বছর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং অধস্তন আদালতে আইনজীবী হিসেবে অন্যূন এক বছরের অভিজ্ঞতা; তবে শর্ত থাকে যে, আইন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা, ক্ষেত্রমতে, আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

১. ভূমিকা

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সাংবিধানিকভাবে অনেক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা স্বেচ্ছাধীন (discretionary) এবং পৃথিবীর সভ্যজাতিগুলোর রাজনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থায় এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। এ কারণে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় বিচারিক জ্ঞান ব্যবহার করতে হয় এবং আইনের শাসন ও নৈতিকতার নিরিখে এই বিচারিক জ্ঞান ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। কেউ যদি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়ে এই বিচারিক বিবেচনা না করেন তবে সেটা থেকে সুফল আসলেও আমরা সেটাকে বলি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা। সাধারণ ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ক্ষমতাই স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রয়োগ করা যায় না। তবে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের সময় ক্ষমতার পরিসীমা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা যেমনি প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিচারিক বিবেচনার আরো সুচারু ও কঠিন প্রয়োগ।

রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানকে অপরাধীর শাস্তি হ্রাস কিংবা ক্ষমা প্রদর্শনের এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে আমাদের রাষ্ট্রপতিগণ সে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে 'কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা' দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবিধানে আমাদের সংবিধানের মতোই সংক্ষিপ্ত ভাষায় রাষ্ট্রপ্রধানকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অনেক দেশে এই ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কিত নীতিমালা বা নির্দেশাবলি আছে, অনেক দেশেই তা নেই। যেসব দেশে নেই তারা ইচ্ছে করেই তা তৈরি করেনি কারণ তারা মনে করে ক্ষমা প্রদর্শনের হাজারো রকমের বৈধ ক্ষেত্র আছে এবং সেগুলোকে কতগুলো নিয়মের মধ্যে বন্দি করে রাখা অসম্ভব। তবে লিখিত নিয়ম-নীতি যাদের নেই তারা কতগুলো অলিখিত ও অদৃশ্য বাধা মেনে চলে - কিছু প্রথাগত নিয়ম-নীতি মেনে চলে, অনেক ক্ষেত্রে আদালতের রায়েও এসবের উল্লেখ থাকে।

ক্ষমতা প্রয়োগের প্রথম বাধা হচ্ছে আইনের শাসন। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' করার অঙ্গীকার আছে। সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত' করতে সচেষ্ট হওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রপতির পদে দায়িত্বগ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে শপথ নিতে হয়। সেই শপথ সন্নিবেশিত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে। সেই শপথ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সশ্রদ্ধচিত্তে 'আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন', 'সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান' এবং 'ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ' করার অঙ্গীকার করেছেন।

ক্ষমা প্রদর্শন রাষ্ট্রপ্রধানের কোন অনুকম্পা কিংবা অনুগ্রহ নয়। এই ক্ষমতা সাংবিধানিক পরিকল্পের একটি অংশ এবং এই ক্ষমতাকে সংবিধানের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির চাইতে অপরাধীকে কম শাস্তি দিলেই কেবল জনকল্যাণ সাধনের সম্ভাবনা থাকবে এই মর্মে নিশ্চিত হয়েই রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির খেয়াল, আনন্দ, সুখানুভূতি বা বিশেষ কোন সুবিধার বিষয় নয় বরং এটি রাষ্ট্রপতির দাপ্তরিক কর্তব্যের বিষয়। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা যতই স্বেচ্ছাধীন হোক

না কেন ক্ষেত্রবিশেষে এই ক্ষমতা প্রয়োগ না করা যেমন রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্ব ঠিক তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি এমন একজন যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত আসামী রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করে যে শাস্তির অধিকাংশ মেয়াদ জেলে ছিল, যে অনুতপ্ত, জেলে যার আচরণ ভাল ছিল, যে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, রোগে ভুগছে এবং যাকে ছেড়ে দিলে সমাজ ও জাতির কোনভাবেই তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই, তখন তাকে ক্ষমা প্রদর্শন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

দণ্ড বলতে বুঝায় এমন একটি দণ্ড যে দণ্ডের বিরুদ্ধে আর কোন বিচারিক প্রক্রিয়া অবশিষ্ট নেই। আরো বিচারিক স্তর বিচারিক প্রক্রিয়ায় অবশিষ্ট আছে এমন অপরাধীর ক্ষেত্রে সাধারণত ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় না। কারণ তাতে বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় এবং এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। ক্ষমা প্রদর্শন একটি অনন্যসাধারণ সাংবিধানিক ক্ষমতা এবং শুধুমাত্র বিশেষ, বিরল ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করতে হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক এই শাস্তিহ্রাস বা ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা ব্যবহারের কিছু নিয়মনীতি লিখিত বা অলিখিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব নিয়ম নীতির পেছনে বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতেরও ব্যাপক ভূমিকা আছে। বর্তমান পৃথিবীতে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুকম্পা প্রদর্শনের ক্ষমতার ব্যবহার আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। ভারতের কেহার সিং, মরুরাম এবং ইপুরু সুধাকর মামলা, নিউজিল্যান্ডের বার্ট বনাম গভর্নর জেনারেল মামলায় উচ্চ আদালত তাই জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, কেহার সিং মামলায় ভারতীয় উচ্চ আদালত ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবহারের ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা ব্যবহার না করলেও তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করো যাবে - বার্ট বনাম গভর্নর জেনারেল মামলায় নিউজিল্যান্ডের উচ্চ আদালতের অভিমত এরকমই।

২. বর্তমান আইনি বিধান

বর্তমানে দণ্ড মার্জনা, দণ্ড মওকুফ, দণ্ড হ্রাস, দণ্ড স্থগিত এবং দণ্ড বিলম্বের বিষয়গুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১, ৪০২ ও ৪০২ক ধারা অনুসারে পরিচালিত হয়।

৩. ক্ষমা প্রদর্শন ক্ষমতার রাজনৈতিক ব্যবহার

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে তা সর্বজনবিদিত। রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচার কাজ শেষ হওয়ার আগেই ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে, একই অপরাধীকে দুবার ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষমা প্রদর্শনের এই ঘটনাগুলো আমাদের দেশে আইনের শাসনের ধারণাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৪. সুপারিশ

৪.১ আইন প্রণয়ন

১. ক্ষমা প্রদর্শন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ অন্যান্য সব নির্বাহী ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা এই আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হবে।

২. ক্ষমা প্রদর্শন আইনের মাধ্যমে একটি ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ হবে:

ক্রম	ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সদস্য	সদস্যের ধরন
১.	অ্যাটর্নি জেনারেল	চেয়ারম্যান
২.	জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্য	সদস্য
৩.	জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য	সদস্য
৪.	মহা কারা পরিদর্শক	সদস্য
৫.	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন সিভিল সার্জন	সদস্য
৬.	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন মনোবিদ	সদস্য

৩. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, গঠিত ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করবে।
৪. ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড বছরে ন্যূনতম দুইবার, জানুয়ারি ও জুলাই মাসে, সভায় মিলিত হবে। সরকার বোর্ডের সভা অনুসারে সদস্যদের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করবে।
৫. আগ্রহী দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবরে ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করবেন। সকল আবেদন যাচাই-বাছাই করে অ্যাটর্নি জেনারেল ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সভা আহবান করবেন।
৬. ক্ষমা প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বোর্ড একমত না হতে পারলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
৭. গৃহীত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী দপ্তরকে অবহিত করা হবে।
৮. বোর্ডের গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বিভাগ ক্ষমা প্রদর্শন করবে।

৪.২ সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি

ক্ষমা প্রদর্শনের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ড নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করবে:

১. অনুকম্পা প্রদর্শন একটি বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা তাই অত্যন্ত বিরল এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে;
২. অপরাধের মাত্রা ও ধরন;
৩. ভুক্তিভোগী এবং সার্বিকভাবে সমাজের উপর সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রভাব;
৪. দণ্ড প্রদানের পরে অপরাধীর আচরণ আমলে নিতে হবে;
৫. অপরাধী আদালতে দোষ স্বীকার করেছে কিনা দেখতে হবে;
৬. অপরাধী তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত কিনা জানতে হবে (আচার আচরণ থেকে);
৭. যেখানে শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে সেখানে অপরাধী কারাদণ্ডের কতটুকু খেটেছে এবং কতটুকু বাকি আছে;
৮. অপরাধীর বয়স এবং সার্বিক বিবেচনায় তার সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল;
৯. অপরাধী শারীরিক বা মানসিক রোগাক্রান্ত হলে তার ধরন;
১০. জনমত;
১১. ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে বা না করা হলে তার কারণ জানাতে হবে;

৪.৩ ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনের ফরম

আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করবে। ফরমে আবেদনকারী নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রদান করবে:

(ক) আবেদনকারীর পরিচিতি তথ্য

নাম:
পিতার নাম:
মাতার নাম:
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
জন্ম তারিখ:
বর্তমান কারাগারের ঠিকানা:
কয়েদি নম্বর:
স্থায়ী ঠিকানা:

(খ) ক্ষমা সম্পর্কিত তথ্য

প্রার্থিত ক্ষমা:

☐ দণ্ড মার্জনা ☐ দণ্ড মওকুফ ☐ দণ্ড হ্রাস ☐ দণ্ড বিলম্ব

ক্ষমা চাওয়ার কারণ:

(আবেদনকারী কেন ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হবে)

ইতোপূর্বে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছিল কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে উক্ত ক্ষমা প্রার্থনার তারিখ ও ফলাফল:

(গ) অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য:

অপরাধ সংঘটনের তারিখ:

বর্তমান অপরাধের বিবরণ:

বিচার শুরু হওয়ার তারিখ:

রায় প্রদানের তারিখ:

মূল শাস্তি:

শাস্তির কতটুকু ভোগ করা হয়েছে:

যে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে সে অপরাধের মামলাসহ পূর্ববর্তী সকল অপরাধ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের অনুলিপি:

আবেনকারীর বিরুদ্ধে অন্য কোন ফৌজদারি তদন্ত/মামলা চলমান থাকলে তার বিবরণ:

(ঘ) আবেদনকারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক প্রণীত আবেদনকারীর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিবেদন

বিশেষজ্ঞ মনোবিদ কর্তক প্রণীত আবেদনকারী মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিবেদন

জেল সুপারের আচরণ সম্পর্কিত সনদ।

৪.৫ সংবিধান সংশোধন

অনুচ্ছেদ ৪৯ সংশোধন করে ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন ও বিধি অনুসরণ করেই ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন[২৯]।

[২৯] দশম অধ্যায় দেখুন।

নবম অধ্যায়
স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস

১. ভূমিকা
পুলিশ বাহিনীর অধীনে এবং পুলিশ বাহিনীর বাইরে প্রচলিত তদন্ত ব্যবস্থা এবং তাতে নিয়োজিত জনবলকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় তদন্ত প্রক্রিয়ার যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র, কার্যকর, দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, জনবান্ধব এবং প্রভাবমুক্ত তদন্ত সার্ভিস গঠন প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা রুজু হয় থানায়। এসব মামলায় তদন্তের দায়িত্বও থাকে পুলিশের। তাছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে দায়েরকৃত নালিশি মামলায় আদালতের নির্দেশে তদন্তের দায়িত্বও অনেক সময় পুলিশের উপর অর্পিত হয়। পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত দ্রুত ও মানসম্পন্ন তদন্তের উপর মামলার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভরশীল।

২. বর্তমান তদন্ত ব্যবস্থার সমস্যা
- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তদন্ত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ফৌজদারি মামলার গতি প্রকৃতি এবং ফলাফল প্রাথমিকভাবে তদন্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভরশীল। তদন্ত কর্মকর্তা সৎ, সাহসী, দক্ষ ও পেশাদার না হলে তদন্ত প্রতিবেদনে নানা রকম দুর্বলতা থেকে যায়। এছাড়া কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য একটি আধুনিক তদন্ত ব্যবস্থার যেসব উপকরণ ও পেশাগত সুবিধা থাকা প্রয়োজন বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় তা নেই। বিশেষ করে সাক্ষ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের বর্তমান ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল।
- তদন্ত প্রতিবেদনে অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে না। তদন্ত কার্যক্রমের এসব সমস্যার কারণে বেশিরভাগ ফৌজদারি মামলায় আসামী খালাস পাচ্ছে।
- ফৌজদারি মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো মিথ্যা মামলা অথবা এমন মামলা যাতে মিথ্যা তথ্য মিশ্রিত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের সাথে নির্দোষ ব্যক্তিদেরও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার প্রকৃত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হয় বা মূল ঘটনাকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধামাচাপা দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে তদন্ত সুষ্ঠু না হলে নিরপরাধ ব্যক্তির হয়রানির সম্ভাবনা থাকে বা প্রকৃত অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়।
- আমাদের দেশে বিরোধী পক্ষকে হয়রানির উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা দায়ের ও পুলিশকে ব্যবহারের মাধ্যমে হেনস্থার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। তার উপর রয়েছে পুলিশের কিছু সদস্যের দুর্নীতি, যা রোধ করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই।
- পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও অসদুদ্দেশ্যে পুলিশকে যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে পুলিশের ব্যাপারে এক ধরনের ভীতি। যে কারণে পুলিশকে সাধারণ মানুষ বন্ধু না ভেবে তাদেরকে এড়িয়ে চলে। তবে এটাও সত্য যে, পুলিশের আচরণ উন্নয়নের জন্য এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও পুলিশের কোনো নিবেদিত একক ইউনিট নেই, বরং একাধিক

বিভাগকে একই ধরনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পুলিশের বিদ্যমান তদন্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট সুসংগঠিত ও সুদক্ষ নয়।

- মামলার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার সময় সরকারি প্রসিকিউটর কর্তৃক তদন্ত তদারকির সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সমন্বয়ের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে মামলার বিচার শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায়।
- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার জন্য এককভাবে পুলিশকে দায়ী করা সমীচীণ নয়। কমিশন মনে করে প্রস্তাবিত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস এবং জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

৩. স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সংস্থার ধারণাটি নতুন নয়

১৯৯৬ সালের আইন কমিশন আইনের ৬ ধারায় উক্ত আইনের অধীনে গঠিত আইন কমিশনের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৬। (ক) ধারার দফা (৬) অনুসারে আইন কমিশনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে একটি হলো:

> "ফৌজদারি মামলার অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার এবং সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি অধিকতর দক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ তত্সম্পর্কে গ্রহণীয় পদক্ষেপের সুপারিশ" করা।

উক্ত আইন প্রণয়নের প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধরনের একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সংস্থা গঠনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নি। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেকগুলো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কোন না কোন ভাবে ফৌজদারি অপরাধের তদন্তের সাথে জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ এবং পুলিশের শাখা ডিবি, সিআইডি, পিবিআই। পুলিশের বাইরে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটির অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যানসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট, প্রভৃতি। অনেকগুলো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অপরাধ তদন্তে নিয়োজিত থাকার কারণে সমন্বয়হীনতার চিত্র স্পষ্ট। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ফৌজদারি মামলায় অপরাধ প্রমাণের হার খুবই কম। কমিশন মনে করে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস না থাকা এবং স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস না থাকা - এ দুটির নেতিবাচক সমন্বয়ে বাংলাদেশে ফৌজদারি মামলায় অপরাধ প্রমাণের হার কম। কমিশন তাই স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে।

৪. প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১ তদন্ত সংস্থায় নিয়োজিত জনবলের সমন্বয়ে একটি পৃথক তদন্ত সার্ভিস গঠিত হবে, যার নাম হবে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস (Criminal Investigation Service)। এই সার্ভিস হবে পুলিশ বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি, নিয়ন্ত্রণ, বাজেট, অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভুক্ত হবে।

২ তদন্ত সার্ভিস ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বের বিভাজন নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পুলিশের সহায়তা প্রয়োজন হয় এমন যে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং সাধারণভাবে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকে পুলিশের উপর।

৩ সাধারণত কোনো মামলা দায়ের হওয়ার পরই কেবল তদন্ত সার্ভিস কাজ শুরু করবে। তবে জরুরি ক্ষেত্রে এবং ঘটনার জটিলতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ আনুষ্ঠানিক মামলা দায়েরের পূর্বেও সম্ভাব্য তদন্তের অংশ হিসাবে তদন্ত সার্ভিসের সহায়তা নিতে পারবে।

৪ কোনো মামলার তদন্ত শুরুর প্রথম পর্যায় থেকেই তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্নি/প্রসিকিউটরের তদারকিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫ উপরে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচলিত পুলিশ বিভাগ ও তদন্ত সার্ভিসের কাজের সুনির্দিষ্ট বিভাজন থাকবে। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন এবং যথাযথ বিধান সম্বলিত নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৬ প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস বিচার প্রক্রিয়ায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করবে। প্রসিকিউশনের তদারকিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে তদন্ত সার্ভিস অনেক দ্রুত ও কার্যকর ভাবে তদন্ত করতে পারবে। এতে তদন্তের কাজের মান বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ থেকে তদন্ত সার্ভিসকে আলাদা করলে তদন্ত প্রক্রিয়ায় সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অবহেলা ও অসদাচরণ হ্রাস পাবে।

৭ প্রস্তাবিত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস বিচার বিভাগের তদারকিতে স্বতন্ত্র অ্যাটর্নি সার্ভিসের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে বিধায় সার্ভিসটি রাজনৈতিক ও অন্যান্য অপেশাগত প্রভাবমুক্ত হয়ে তদন্ত করতে পারবে। এতে করে মিথ্যা, হয়রানিমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

৮ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ থেকে তদন্ত সার্ভিসকে আলাদা করলে এর স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা বাড়বে এবং তদন্ত করার বিশেষায়িতা সক্ষমতা বাড়বে। এতে করে তদন্তের কাজে গতি বাড়বে এবং তদন্ত আরো দক্ষ ও কার্যকর হবে। দ্রুত তদন্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতেও সাহায্য করবে। কারণ দ্রুত তদন্তই পারে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট ও অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে।

৫. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস (Criminal Investigation Service) গঠন

১. সরকার আইন দ্বারা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন করবে।

২. ফৌজাদারি তদন্ত সার্ভিস থানা পর্যায়ে, থানা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সমন্বয়ে, ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

৩. দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সার্ভিস স্বাধীন থাকবে।

৪. সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মচারি এবং প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হিসেবে গণ্য হবেন।

৫. উক্ত আইনে একটি তপশিল থাকবে। উক্ত তফশিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে সংজ্ঞায়িত অপরাধের শ্রেণিকৃত তালিকা থাকবে এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিশেষায়িত ইউনিটগুলো তফশিলভুক্ত উক্ত অপরাধ এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র বা উক্ত অপরাধ সংঘটনের সহায়তার তদন্ত ও অনুসন্ধান করবে।

৬. বিশেষ প্রয়োজনে একটি ইউনিট অন্য ইউনিট-সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্ত ও অনুসন্ধান করতে পারবে।
৭. সরকার প্রয়োজনে, সময় সময়, তফশিল সংশোধন করতে পারবে।
৮. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের একজন মহাপরিচালক (ডিরেক্টর জেনারেল) থাকবেন এবং সরকার উক্ত তদন্ত সার্ভিসে প্রয়োজন অনুসারে কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ দান করবে।
৯. শুধুমাত্র কর্মকর্তাগণ ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।
১০. বাংরাদেশ পুলিশের যেসব কর্মকর্তা সার্ভিসের সদস্য হিসেবে আত্মীকৃত হবে তাদের পরবর্তীতে পুলিশ বিভাগে প্রেষণে বা অন্য কোন ভাবে বদলি করা যাবে না।
১১. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কোন সদস্য পদোন্নতির মাধ্যমে পরবর্তী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হলে, উক্ত পরবর্তী পদে পুলিশ বিভাগে থেকে নিয়োগ দান করা যাবে না।

৬. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস পরিচালনার মূলনীতি

অর্পিত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করবে:

১. সত্য উদঘাটন;
২. মানবাধিকার;
৩. আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার প্রতিরোধ;
৪. জনস্বার্থ।

৭. সার্ভিসের প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান

১. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সার্বিক তত্ত্বাবধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।
২. ফৌজাদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব ডিরেক্টর-জেনারেলের (ডিরেক্টর জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস) উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকালে ডিরেক্টর-জেনারেল ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন এবং তদধীন বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধিমালা এবং ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত বিধিমালার অধীন একজন পুলিশ মহা-পরিদর্শকের সমপর্যায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।

৮. প্রধান কার্যালয়

ফৌজাদারি তদন্ত সার্ভিসের একটি প্রধান কার্যালয় থাকবে এবং উক্ত কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

৮.১ বিভাগীয় কার্যালয়

১. প্রতিটি বিভাগীয় সদরে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভাগীয় কার্যালয় থাকবে।
২. একজন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন।
৩. তিনি তাঁর বিভাগের অন্তর্গত সব জেলার তদন্ত কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করবেন।

৮.২ জেলা কার্যালয়

১. প্রতিটি জেলা সদরে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের জেলা কার্যালয় থাকবে।

২. একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস জেলা কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন।
৩. তিনি উক্ত জেলার প্রতিটি থানার তদন্ত তদারকি করবেন।
৪. তিনি প্রতিটি থানায় তদন্তে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ও লজিস্টিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫. প্রয়োজনে একাধিক জেলার ফৌজদারি তদন্ত কার্যক্রম একটি জেলা কার্যালয় থেকে পরিচালনা করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন উক্ত জেলা কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন।

৮.৩ থানা কার্যালয়

১. একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের থানা কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন।
২. মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করবেন থানা কার্যালয়ের সহকারি থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার এবং থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার।
৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের ইনটেলিজেন্স ইউনিট তাদেরকে গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করবেন।
৪. তদন্ত শেষে থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার (আইন) এর সহায়তায় থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার, প্রাইমা ফেসি কেইস প্রমাণের উপযুক্ত সাক্ষী ও সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরিখে চার্জশিট প্রস্তুত করবেন।
৫. জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নির সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত চার্জশিট প্রস্তুত করবেন এবং উপযুক্ত আদালতে পেশ করবেন।
৬. থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদালতে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৭. প্রতিটি থানায় একটি রেকর্ড/এভিডেন্স রুম থাকবে এবং উক্ত কক্ষে প্রতিটি মামলার যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নথিপত্র ট্যাগসহ সংরক্ষিত থাকবে।
৮. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রতিটি থানা কার্যালয়ে প্রয়োজন অনুসারে কনস্টেবল নিয়োগ দান করা হবে।
৯. প্রতিটি থানা কার্যালয়ে ন্যূনতম একজন নারী কনস্টেবল এবং একজন নারী সহকারি থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার/থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার থাকবেন।
১০. জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিটি থানা কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধাসহ একটি কক্ষ থাকবে।

৯. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্যদের ক্ষমতা

১. অপরাধ তদন্ত বা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রণীত বা প্রণীতব্য অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্যগণ তাদের এখতিয়ারভুক্ত পরিসীমায়, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিসহ বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোন আইনে অর্পিত দায়িত্ব, কর্তব্য ও সুবিধাসহ অনুসন্ধান, গ্রেফতার ও সম্পত্তি জব্দ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।
২. গোয়েন্দা ইউনিট ব্যতীত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কোন ইউনিটের সদস্যবৃন্দ পেশাগত পোশাক ও পরিচয়পত্র ব্যতীত তদন্ত সার্ভিস-সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন না।

১০. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্য নিয়োগ

১. ফৌজাদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রবেশ পদ হবে সহাকারি থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার।

২. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে কোন সদস্য নিয়োগ করা যাবে ন।

৩. প্রবেশপদের নির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রণীত বিধিমালার মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।

৪. প্রবেশ পদে সর্বোচ্চ বয়স হবে ৩৩ বছর এবং অবসরের বয়স হবে ৬৩ বছর।

৫. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার জন্য সার্ভিসের বিভিন্ন কার্যালয়ে প্রয়োজন অনুসারে কনস্টেবল নিয়োগ দান করা হবে।

ক্রম	ফৌজদারি তদন্ত কর্মকর্তাদের পদ	বাংলাদেশ পুলিশের পদ
1.	Director General of CIS	Inspector General of Police
2.	Additional Director General of CIS	Aditional Inspector General of Police
3.	Deputy Director General of CIS	Deputy Inspector General of Police
4.	Additional Deputy Director General of CIS	Additional Deputy Inspector General of Police
5.	Superintendent of CIS	Superintendent of Police
6.	Additional Superintendent of CIS	Additional Superintendent of Police
7.	Senior Assistant Superintendent of CIS	Senior Assistant Superintendent of Police
8.	Assistant Superintendent of CIS	Assistant Superintendent of Police
9.	Thana Investigation Officer of CIS	Inspector
10.	Assistant Thana Investigation Officer of CIS	Sub-Inspector

১১. চাকরির শর্তাবলি

১. প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্যেষ্ঠতাসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি, ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, আদেশ ও বিধিমালা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে পদোন্নতি হবে শূন্য পদের ভিত্তিতে। পদোন্নতিতে মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পাবে।

৪. সরকার আইন দ্বারা অ্যাসিস্ট্যান্স টু জাস্টিস কমিশন (Assistance to Justice Commission) প্রতিষ্ঠা করবে। উক্ত কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১২. ফরেনসিক ল্যাব

কমিশন বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে। প্রতিটি ল্যাবে নিম্নবর্ণিত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যগুলোর জন্য ফরেনসিক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা থাকবে:

(ক) হস্তরেখা ও পদচিহ্ন
(খ) হাতের লিখা
(গ) ব্যালিস্টিক ও জিএসআর
(ঘ) হাতের লিখা
(ঙ) দলিল পরীক্ষা
(ছ) ট্রেইস এভিডেন্স এনালাইসিস
(জ) ডিজিটাল ফরেনসিক্স
(ঝ) ডিএনএ
(ঞ) ফরেনসিক ক্যামিস্ট্রি এবং ভিসেরা
(ট) ফরেনসিক মেডিসিন/প্যাথলজি
(ঠ) ফরেনসিক বোটানি
(ড) ফটোগ্রাফি এবং ক্রাইম সিন ফটোগ্রাফি

১৩. ময়না তদন্ত ও ডাক্তারি পরীক্ষা

১. প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে ন্যূনতম একজন ময়না তদন্তকারী বিশেষজ্ঞ থাকবেন।
২. তিনি ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্য হবেন।
৩. তিনি একজন ক্যারিয়ার ময়না তদন্তকারী হবেন।

১৪. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বাৎসরিক প্রতিবেদন

১. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল প্রতি ক্যালেন্ডার বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সার্ভিসের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরি করে জাতীয় সংসদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রধান বিচারপতিকে প্রেরণ করবেন।
২. উক্ত প্রতিবেদনে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে:
(ক) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস তদন্ত করেছে এরূপ মামলার থানা, জেলা ও বিভাগ-ভিত্তিক শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান;
(খ) বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্তদের শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান;
(গ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে সংশোধিত অভিযোগের সংখ্যা;
(ঘ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে প্রত্যাহারকৃত এবং সংযোজিত অভিযোগের সংখ্যা;
(ঙ) জিআর ও সিআর মামলার পরিসংখ্যান;
(চ) বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি মামলার বিচার সম্পন্ন হতে অতিক্রান্ত সময়;

(ছ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের (নারী, পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ, ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত বিন্যাস এবং জেলাভিত্তিক ভৌগোলিক বিতরণসহ) পরিসংখ্যান;
(জ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের দাপ্তরিক, লজিস্টিক, মানবসম্পদ বিষয়ক চাহিদা ও সমস্যা;
(ঝ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের চাকরি শর্ত (বদলি, পদোন্নতি, অপসারণ, বেতন ভাতাদি, আবাসন, ইত্যাদি) সম্পর্কিত সুপারিশ;
(ঞ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গৃহীত বিভিন্ন জনহিতকর ও জনসচেতনামূলক কর্মকাণ্ড;
(ট) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গৃহীত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্সসূচি;
(ঠ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মাচারিদের বিভিন্ন পদে বিগত বছরের বদলি, পদোন্নতি, চাকরিতে প্রবেশ এবং অবসর গ্রহণের পরিসংখ্যান;
(ড) বিগত বছরে সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিসংখ্যান;
(ঢ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার বিভিন্ন প্রায়োগিক সমস্যা;
(ণ) বিভিন্ন ফৌজদারি আইন ও কার্যবিধি পরিবর্তন, সংস্কারের সুপারিশ।

১৫. ক্রান্তিকালীন বিধান

১. প্রারম্ভিকভাবে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্যদের শূন্য পদে বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।
২. প্রাথমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিবি, সিআইডি ও পিআইবিতে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ অগ্রাধিকার পাবেন।
৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুলিশ বাহিনী হতে বদলির মাধ্যমে কোন কর্মকর্তাকে উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ দান করা যাবে না।

বাংলাদেশ পুলিশ থেকে কর্মকর্তাদের ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে বদলির ক্ষেত্রে নিম্নের ছক অনুসরণ করা যেতে পারে:

ক্রম	ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের পদ	বাংলাদেশ পুলিশের পদ
1.	Director General of CIS	Inspector General of Police
2.	Additional Director General of CIS	Aditional Inspector General of Police
3.	Deputy Director General of CIS	Deputy Inspector General of Police
4.	Additional Deputy Director General of CIS	Additional Deputy Inspector General of Police
5.	Superintendent of CIS	Superintendent of Police
6.	Additional Superintendent of CIS	Additional Superintendent of Police
7.	Senior Assistant Superintendent of CIS	Senior Assistant Superintendent of Police
8.	Assistant Superintendent of CIS	Assistant Superintendent of Police
9.	Thana Investigation Officer of CIS	Inspector
10.	Assistant Thana Investigation Officer of CIS	Sub-Inspector

১৬. আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধন

১. একটি আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হবে। সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত সার্ভিসকে কার্যকর করার জন্য যাবতীয় বিধান, যতদূর সম্ভব, মূল আইনেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন/অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি/প্রবিধিমালা প্রণয়ন করবে।

৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন বাস্তবায়নের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং অন্যান্য যেসব আইনে ফৌজাদারি অপরাধ তদন্তের উল্লেখ আছে সেসব আইনে সংশোধনী আনা হবে।

৪. ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৯৪৩ সালের পুলিশ প্রবিধানমালার সংস্কার আনা হবে।

৫. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের ইউনিট অনুযায়ী জব্দ তালিকা তৈরি করা হবে।

৬. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে, বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন তদন্ত সংস্থাসহ অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধ তদন্ত সংস্থায় যেসব তদন্ত চলমান ছিল, সেসব তদন্ত উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে হস্তান্তরিত হবে।

৭. আলাদা ভবনে কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ পুলিশের সমপর্যায়ের কার্যালয় থেকে পরিচালিত হবে।

৮. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে উক্ত সার্ভিসের সব কার্যালয় বাংলাদেশ পুলিশ থেকে স্বতন্ত্র হবে।

৯. বাংলাদেশ পুলিশ ক্রান্তিকালীন কর্মকাণ্ডে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসকে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে।

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের আঞ্চলিক কাঠামো

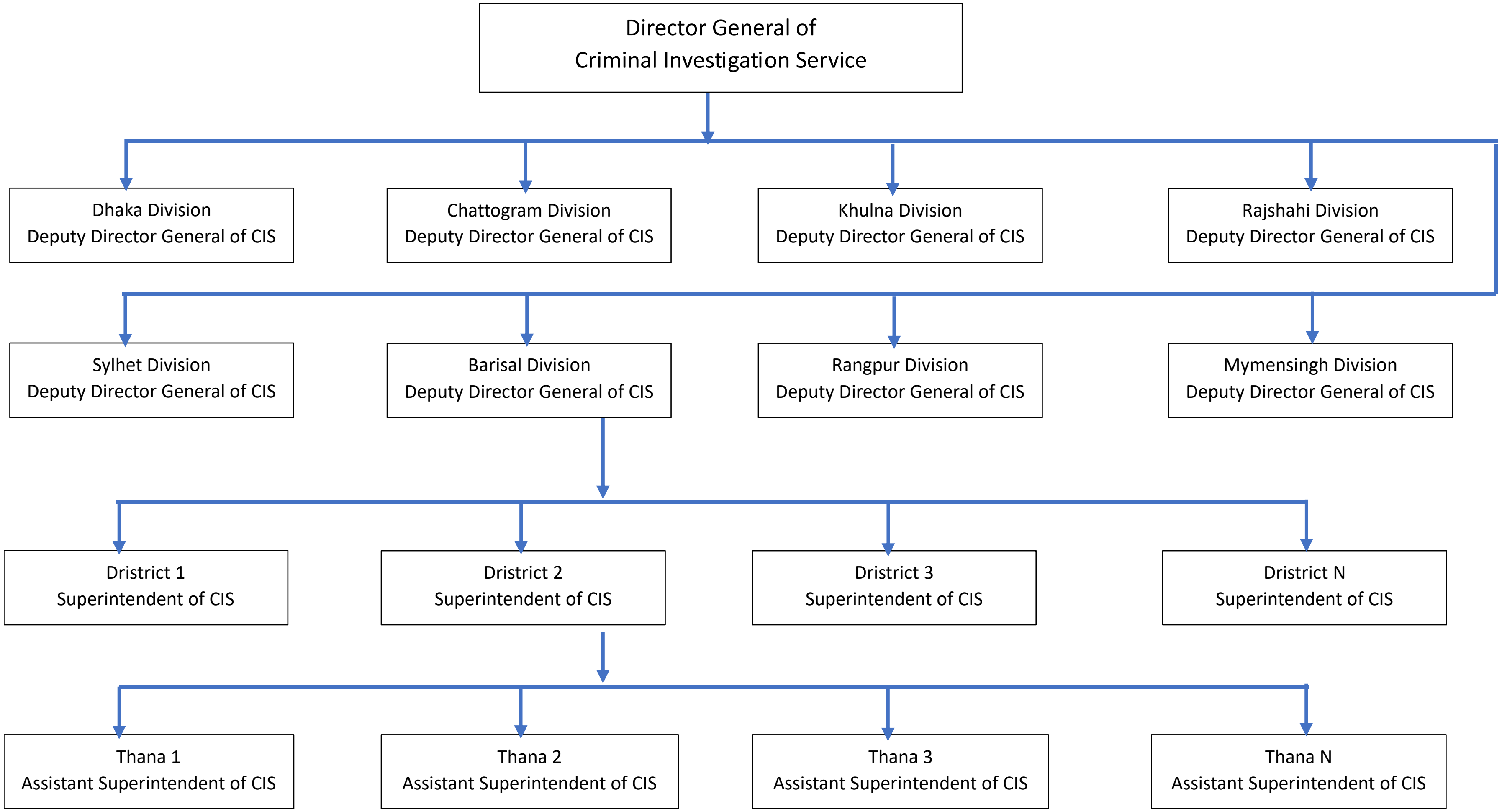

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভিন্ন অপরাধ ইউনিট

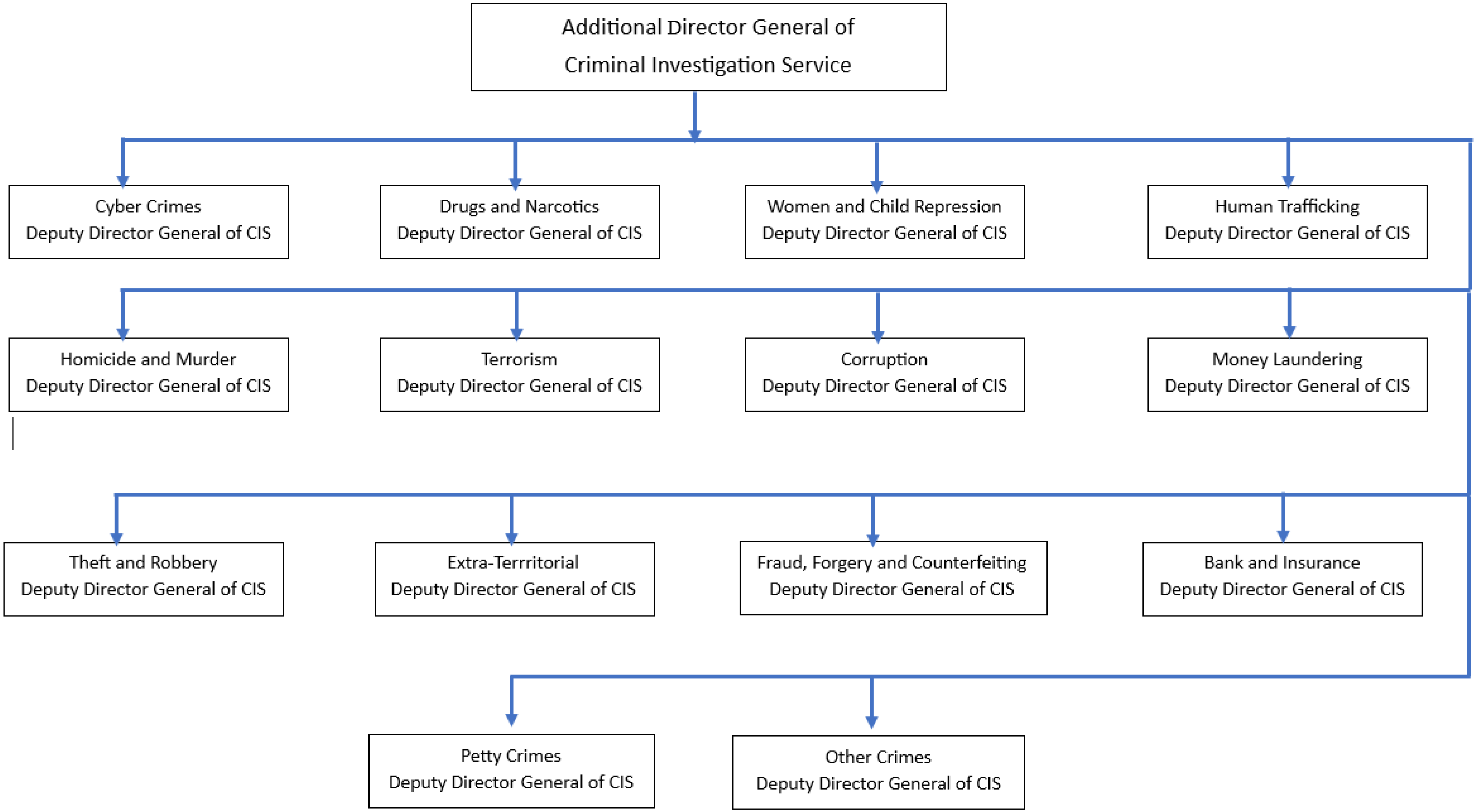

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রশাসনিক কাঠামো

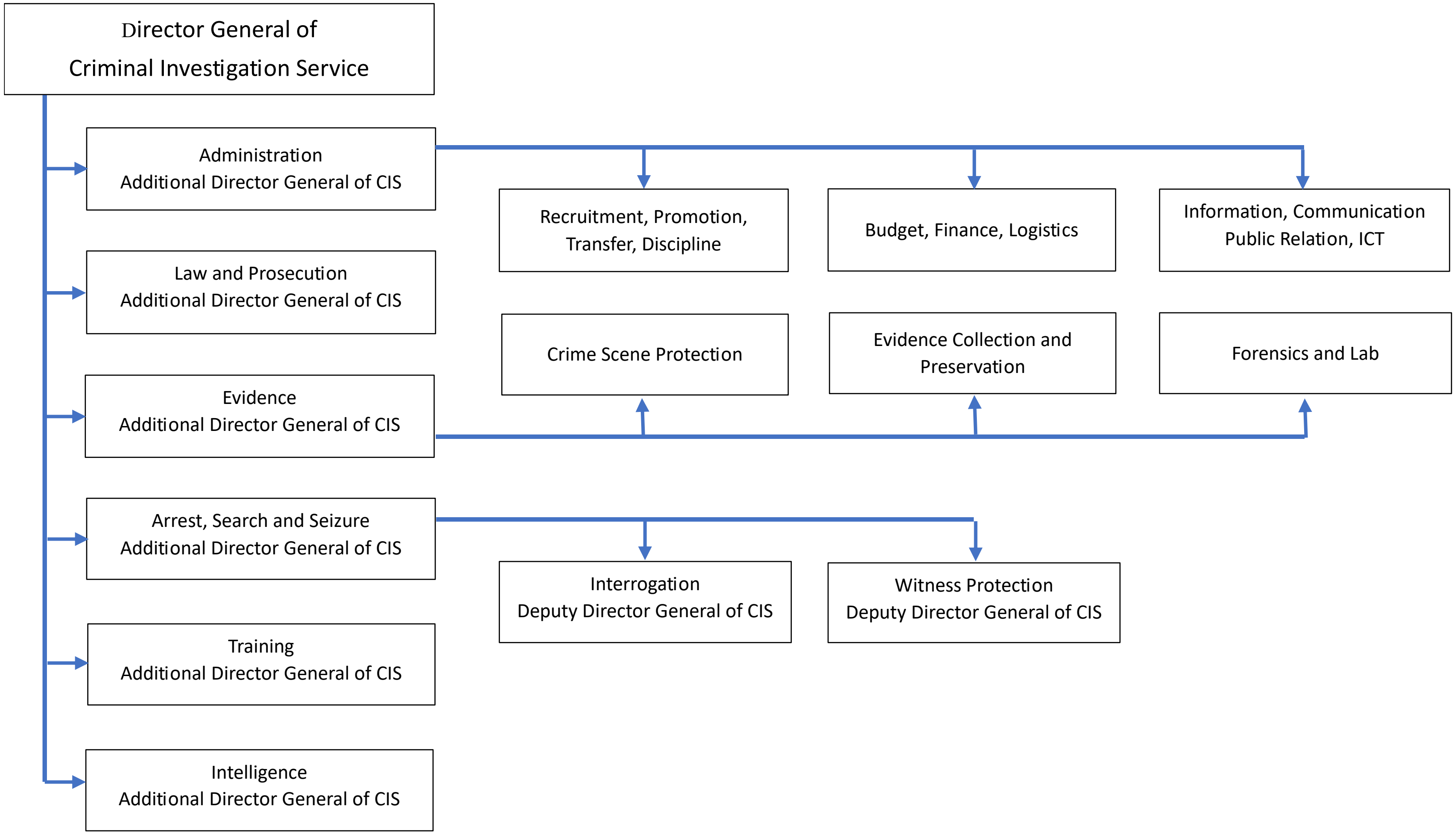

দশম অধ্যায়

বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী

১.১ ভূমিকা

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের গঠন বিষয়ক প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এই কমিশনের দায়িত্ব হলো বিচার বিভাগকে *"স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর"* করার জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা। আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে কাঙ্খিত স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শব্দগুচ্ছের আইনগত ও বাস্তব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তদনুসারে বিদ্যমান সংবিধান ও অন্যান্য আইন, দেশি ও বিদেশি উচ্চতর আদালতের রায়, আইন বিষয়ক বিবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল পরীক্ষায় দেখা যায় যে: (ক) বিচার বিভাগের **স্বাধীনতার** তিনটি মূল উপাদান হলোঃ প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা ও বিচারকদের কার্যকালের নিশ্চয়তা; (খ) বিচার বিভাগের **নিরপেক্ষতার** প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিচারকদের অনুরাগ বা বিরাগের বা প্রভাবের ঊর্দ্ধে থেকে বিচারকার্য পরিচালনা; (গ) **কার্যকর** বিচার বিভাগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো স্বচ্ছতার সাথে, সহজলভ্যভাবে, যৌক্তিক সময়ে ও ন্যূনতম খরচে সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা।

এসব বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতগুলোর প্রধান ভূমিকার পাশাপাশি সহায়ক প্রতিষ্ঠান ও জনবলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এ দুটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বিচার বিভাগ সম্পর্কে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্যগুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কিছু বিধান ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন এবং নতুন কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

১.২ বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নিম্নের ছকে এ বিষয়ে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব এবং সংক্ষিপ্ত কারণ উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
১.	রাষ্ট্রপতি	
	৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।	৪৮। (১) অপরিবর্তিত
	(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।	(২) অপরিবর্তিত
	(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের	(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না। (৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা (গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন। (৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।	(১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: [শর্তাংশ অপরিবর্তিত] (৪) অপরিবর্তিত (৫) অপরিবর্তিত **কারণ**: সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির - তথা নির্বাহী বিভাগের - স্বেচ্ছাধীন বিবেচনার কোন সুযোগ নেই, বরং আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকেই প্রধান বিচারপতি এবং নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (প্রস্তাবিত ৯৫ক অনুচ্ছেদের অধীনে) অন্যান্য বিচারপতি পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২.	**ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার** ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন	৪৯। রাষ্ট্রপতি এতদউদ্দেশ্যে সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড ও পদ্ধতি অনুসারে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিতে এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে পারিবেন।
৩.	**মন্ত্রিসভা** ৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। (৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।	 ৫৫। (১) অপরিবর্তিত (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগের অধীনে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ, শৃঙ্খলা ও অপসারণ এবং বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও অপসারণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কোনো পরামর্শ প্রদান করিবেন না বা অন্য কোনোভাবে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না। (৩) অপরিবর্তিত (৪) অপরিবর্তিত (৫) অপরিবর্তিত

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।	(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা বা সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলি উক্ত বিধিসমূহে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। **কারণ:** বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪.	**সংবিধানের ৪র্থ ভাগের ৫ম পরিচ্ছেদ এর শিরোনাম সংশোধন**	**সংবিধানের ৪র্থ ভাগের ৫ম, '৫ম পরিচ্ছেদ- অ্যাটর্নি-জেনারেল' অভিব্যক্তির পর 'ও বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।** **কারণ:** এই ভাগে "বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস" নামে সরকারি আইন কর্মকর্তাদের জন্য একটি স্থায়ী সার্ভিসের গঠন সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫.	**বর্তমানে কোনো বিধান নেই**	**বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস** ৬৪ক। (১) এই সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফায় উল্লিখিত অ্যাটর্নি-জেনারেল এর দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস নামে একটি কর্মবিভাগ থাকিবে। (২) উক্ত কর্মবিভাগ এর গঠন, কর্মবিভাগের বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং কর্মের অন্যান্য শর্তাবলি এই সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। **কারণ:** এই প্রতিবেদনের সপ্তম অধ্যায়ে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের যৌক্তিকতা ও এর রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই সার্ভিস প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংবিধানে যেহেতু অ্যাটর্নি-জেনারেল সংক্রান্ত বিধান রয়েছে এবং যেহেতু এই সার্ভিসের উদ্দেশ্য হবে অ্যাটর্নি-জেনারেল এর দায়িত্ব পালনে

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		সহায়তা করা, সেহেতু সংবিধানে বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস বিষয়ে একটি সাধারণ বিধান থাকা সমীচীন।
৬.	<u>**সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়**</u>	
	৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে:	৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে:
	(ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়;	(ক) অপরিবর্তিত
	(খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, (আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ, (ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ, (উ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদিগকে দেয় পারিশ্রমিক;	(খ) অপরিবর্তিত <u>(খখ) বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণকে দেয় পারিশ্রমিক;</u>
	(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মচারিদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়;	(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন ~~এবং সরকারী কর্ম কমিশনের~~<u>, সরকারী কর্ম কমিশন এবং বিচার-কর্মবিভাগের</u> কর্মচারিদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়;
	(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তাহার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ-সংক্রান্ত সকল দেনার দায়;	(ঘ) অপরিবর্তিত;
	(ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ; এবং	(ঙ) অপরিবর্তিত; এবং (চ) অপরিবর্তিত

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।	**কারণ:** বিচার বিভাগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অধস্তন আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে অধস্তন আদালতের বিচারক ও কর্মচারিদেরকে প্রদেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়ের মর্যাদা অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৭.	**সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা** ৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে। (২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। (৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।	৯৪। (১) অপরিবর্তিত (২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া নির্ধারণ করিবেন ও তন্মর্মে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, আপীল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা হইবে প্রধান বিচারপতিসহ অন্যূন ০৭ (সাত) জন। (৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগণ ~~কেবল~~ উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারপতি ~~কেবল~~ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। (৫) প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি এই সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		দায়িত্ব পালন ছাড়াও এমন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন যাহা কোনো আইন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত এবং যাহা – (ক) বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট; বা (খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া জনস্বার্থে পালনযোগ্য। **কারণ:** (১) বিদ্যমান বিধানগুলোতে শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতিকে "বিচারপতি" ও অন্যান্যদের "বিচারক" বলে অভিহিত করা হয়েছে, যা অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে, প্রচলিত রীতি অনুয়ায়ী সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারকই "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার করেন। সাংবিধানিক বিধানের উক্ত অসঙ্গতি নিরসনের জন্য সবক্ষেত্রেই "বিচারক" শব্দটিকে "বিচারপতি" শব্দটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। (২) সুপ্রীম কোর্টে বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণের এখতিয়ার নির্বাহী বিভাগের পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং আপীল বিভাগের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতির ন্যূনতম সংখ্যা ০৭ (সাত) নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা ও প্রস্তাবের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। (৩) বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টে আসন গ্রহণ করা ছাড়াও আইন অনুসারে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের পদে দায়িত্ব পালন করেন, যেমন জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিচারপতি নিয়োগ কমিশন-এর গঠন অনুসারে ঐ কমিশনেও প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টে অন্যান্য বিচারপতি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। উক্তরূপ দায়িত্ব পালন যাতে

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		সংবিধানসম্মত হয়, সেই লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।
৮.	**বিচারক-নিয়োগ** ৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং (ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা (গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ; তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।	**বিচারপতি-নিয়োগ**[৩০] ৯৫। (১) রাষ্ট্রপতি – (ক) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন; এবং (খ) এই সংবিধানের ৯৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করিবেন। (২) কোনো ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, যদি – (ক) তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) তাঁহার বয়স অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) বৎসর হয়; এবং (গ) তাঁহার নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি অভিজ্ঞতা থাকে– (অ) সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের প্রকৃত অভিজ্ঞতা; অথবা (আ) জেলা জজ বা সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতাসহ বিচার-কর্মবিভাগে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা (ই) বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অন্যূন ০৩

[৩০] এই অনুচ্ছেদের দুটি বিষয়ে তিন জন কমিশন-সদস্যের ভিন্নমতের জন্য পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।	(তিন) বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতাসহ উক্ত সার্ভিসে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতা। (৩) কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, যদি – (ক) তিনি হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে অন্যূন ০২ (দুই) বৎসর দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন; এবং (খ) এই সংবিধানের ৯৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য তাঁহাকে সুপারিশ করে। (৪) কোনো ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, যদি তিনি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতিগণের মধ্যে কর্মে প্রবীন হন এবং ৯৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য তাঁহাকে সুপারিশ করে। **কারণ:** তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।
৯.	[বর্তমানে এ বিষয়ে কোনো বিধান নাই]	**৯৫ক। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন** (১) সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ও হাইকোর্ট বিভাগে ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারপতি পদে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিগণকে বাছাই ও সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন (যাহা এই অনুচ্ছেদে 'কমিশন' বলিয়া উল্লেখিত) নামে একটি কমিশন থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		(ক) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, যিনি কমিশন প্রধান হইবেন; (খ) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম ২ (দুই) জন বিচারপতি; (গ) হাইকোর্ট বিভাগে কর্মে প্রবীণতম এমন ২ (দুই) জন বিচারপতি, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন বিচার-কর্মবিভাগের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং অন্যজন হইবেন অ্যাটর্নি সার্ভিসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; (ঘ) উপদফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত ৪ (চার) জন বিচারপতি-সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অনধিক ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা অবসরপ্রাপ্ত অন্য একজন বিচারপতি; (ঙ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল; (চ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি; (ছ) উপদফা (খ) ও (গ)-তে উল্লিখিত ৪ (চার) জন বিচারপতি-সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অনধিক ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী। (২) কমিশনের কোনো পদে সাময়িক শুন্যতা বা কমিশনের গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে তৎকর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		(৩) কমিশনের সভা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কমিশনের কার্যাবলি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আইনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুসারে বিধি প্রণয়ন করিবেন। **কারণ:** তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।
১০.	৯৬। **বিচারকদের পদের মেয়াদ** **(পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা প্রতিস্থাপিত বিধান)** (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসমর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের	৯৬। **বিচারপতিদের পদের মেয়াদ ও সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল** (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি ৭০ (সত্তর)[৩১] বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে (যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লেখিত) এবং উহা বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতির মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে ~~কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের~~ প্রধান বিচারপতি ব্যতীত উহার অন্য কোনো সদস্যের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে

[৩১] সংবিধানের এই সংশোধনী কার্যকর হওয়ার বিষয়ে সংশোধনী আইনে এই মর্মে বিধান থাকবে যে, অবসরের নতুন বয়সসীমা ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে কার্যকর হবে যাতে করে তা শুধুমাত্র সেইসব বিচারপতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যাঁরা নিয়োগের ন্যূনতম বয়স কার্যকর হওয়ার পর নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	যাহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।	কার্য করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে কাউন্সিলের যাঁহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারপতি কর্মে প্রবীণ তিনিই উক্ত সদস্যের স্থলাভিষিক্ত হইবেন ~~অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।~~ঃ আরো শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে প্রধান বিচারপতির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি উক্ত তদন্তের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন।
	(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে- (ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা ; এবং (খ) কোন বিচারকের অথবা কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন পদে আসীন ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।	(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে- (ক) বিচারপতিগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা ; (খ) বিচারপতি নহেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে বিচারপতিদের ন্যায় একই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য, তাঁহার জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা; (গ) সাবেক বিচারপতিগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা; এবং (ঘ) কোন বিচারপতির অথবা উপদফা (খ) তে উল্লিখিত অন্য কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।
	(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোন বিচারক -	(৫) যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাউন্সিলের এইরূপ অভিমত পোষণ করিবার কারণ থাকে যে দফা ৪ এর উপদফা (ক) তে উল্লিখিত কোনো বিচারপতি বা (খ) তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি – (ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা	পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা
	(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।	(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, অথবা (গ) কোনো সাবেক বিচারপতি তাঁহার জন্য পালনীয় আচরণবিধি লংঘন করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল রিপোর্ট আকারে জ্ঞাপন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
	(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।	(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে দফা (৪) এর উপদফা (ক) বা (খ)-তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন। (৬ক) তদন্ত করিবার পর কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তাঁহার জন্য পালনীয় আচরণবিধি লংঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা তাঁহাকে সতর্ক করিতে বা 'বিচারপতি' পদবী ব্যবহার করা হইতে বারিত করিতে পারিবেন।
	(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।	(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে, কাউন্সিল বিধি প্রণয়ন করিয়া উহার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(৮) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।	(৮) কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। **কারণ:** তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।
১১.	**অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ** ৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন।	৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে, ক্ষেত্রমত ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত, আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারপতির মধ্যে কর্মে প্রবীণতম বিচারপতি রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে কার্যভার পালন করিবেন। **কারণ:** ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে।
১২.	**সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ** ৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে	**সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতিগণ** ৯৮। (১) রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার বিধানাবলি সত্ত্বেও, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (২) কোন ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের (২) দফায় উল্লিখিত ন্যূনতম সংখ্যা অপেক্ষা হ্রাস পাইলে, অথবা অন্য কোন জরুরি কারণে আপীল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বলিয়া প্রধান বিচারপতির নিকট প্রতীয়মান হইলে, তিনি সংবিধানের ৯৫

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।	অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলি সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম এক বা একাধিক বিচারপতিকে অনধিক ০৩ (তিন) মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে আপীল বিভাগে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে অস্থায়ীভাবে আসন গ্রহণকারী বিচারপতি মেয়াদান্তে পুনরায় হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। **কারণ:** বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে।
১৩.	**অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা** ৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।	**অবসর গ্রহণের পর বিচারপতিগণের অক্ষমতা** ৯৯। (১) প্রধান বিচারপতি, আপীল বিভাগের কোনো বিচারপতি বা হাইকোর্ট বিভাগের কোন স্থায়ী বিচারপতি অবসর গ্রহণের বা পদত্যাগ করিবার পর কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না: তবে শর্ত থাকে যে, বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে অথবা বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোনো দায়িত্ব পালনে এই দফার কোনো কিছুই তাঁহাদেরকে নিবৃত্ত করিবে না। (২) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি পদ হইতে অপসারিত হইবার বা অবসর গ্রহণের বা পদত্যাগ করিবার পর আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন। **কারণ:** (১) বিদ্যমান বিধানে পদত্যাগের উল্লেখ না থাকায় যে অসংগতি তৈরি হয়েছে তা নিরসনের লক্ষ্যে।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		(২) প্রস্তাবিত ৯৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফার সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে।
১৪.	**সুপ্রীম কোর্টের আসন** ১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।	**সুপ্রীম কোর্টের আসন ও হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ** ১০০। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে। (২) রাজধানীর বাহিরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হাইকোর্ট বিভাগের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ থাকিবে। (৩) প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চে বিচারপতিগণের আসন গ্রহণ এবং উক্তরূপ আসন গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রধান বিচারপতি ১০৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী নির্ধারণ করিবেন। (৪) কোনো স্থায়ী বেঞ্চ বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এমনভাবে এক্তিয়ার প্রয়োগ করিবেন যেন উক্ত বেঞ্চ সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসনে আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার ভিতরে কোন ভৌগলিক সীমারেখা উহার এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ করিবে না। (৫) কোনো স্থায়ী বেঞ্চে কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালে প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উহা অন্য কোনো বেঞ্চে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবেন। (৬) প্রধান বিচারপতি স্থায়ী বেঞ্চসমূহ সম্পর্কিত সকল আনুষঙ্গিক, সম্পূরক বা অনুবর্তী বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিবেন। (৭) এই অনুচ্ছেদে "বিভাগীয় সদর" বলিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রশাসনিক বিভাগের সদরকে বুঝাইবে। **কারণ:** ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
১৫.	**হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার** ১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।	অপরিবর্তিত
১৬.	**কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা** ১০২।(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলি বা আদেশাবলি দান করিতে পারিবেন। (২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে (ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে- (অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা (আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে	 ১০২।(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলি বা আদেশাবলি দান করিতে পারিবেন। (২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে (ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে - (অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা (আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা	ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা
	(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-	(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে -
	(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা	(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা
	(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।	(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।
	(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।	(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।
	(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ (ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা	(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীনে যদি এমন কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়, যাহা– (ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না। (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।	(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা হইলে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না। (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং যে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে বুঝাইবে, তবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এবং সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। **কারণ:** (১) হাইকোর্ট বিভাগ যাতে কোন আবেদন দায়ের করা ছাড়াও সুবিচারের স্বার্থে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে (Suo Moto) তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে দফা (১) ও (২) এর উপদফা (ক) ও (খ) তে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে শব্দগুলির "অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে" শব্দগুলো যোগ করে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। (২) দফা (৪) ও (৫)-এর বিধানের ভাষা সহজবোধ্য করার জন্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৭.	**আপীল বিভাগের এখতিয়ার** ১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির	অপরিবর্তিত

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে। (২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ (ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা (খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; অথবা (গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন; এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। (৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে। (৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।	
১৮.	**আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ** ১০৪। কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারি করিতে পারিবেন।	১০৪। আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারি করিতে পারিবেন এবং এতদউদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। **কারণ:** ১০৪ অনুচ্ছেদের বিধানকে সহজবোধ্য করার জন্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
১৯.	**আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা** ১০৫। সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপীল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।	অপরিবর্তিত
২০.	**সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার** ১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।	অপরিবর্তিত
২১.	**সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা** ১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন। (৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন। (৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে	১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্ট ~~রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া~~ প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বভার উহার কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারপতিকে অর্পণ করিতে পারিবেন। (৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারপতি লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারপতি কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন। (৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকে সেই

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।	বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন। **কারণ:** বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দফা (২)-এ পূর্বে উল্লিখিত ১১৩ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদের উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ ১১৩ অনুচ্ছেদ সংশোধনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এবং ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচারকর্ম বিভাগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২২.	**"কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট** ১০৮। সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।	১০৮। (১) সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার সকল বিচারিক কার্যক্রমের নথি তৎকর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে। (২) 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের দফা (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিষয়ে আদালত অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ বা দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। (৩) কোনো বিচার কার্যক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত আইন বা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করা বা বাস্তবায়ন না করা বা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করা বা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা না করা অথবা সুপ্রীম কোর্টে চলমান কোনো বিচারিক কার্যধারাকে বাধাগ্রস্ত করা সুপ্রীম কোর্টের অবমাননা বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) সুপ্রীম কোর্ট দফা (৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত আদালত অবমাননার অন্যান্য ক্ষেত্র, উহার তদন্ত ও বিচারের পদ্ধতি এবং দণ্ডের ধরন ও পরিমাণ বিধিদ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন। **কারণ:** "কোর্ট অব্ রেকর্ড" এবং আদালত অবমাননার ধারণার স্পষ্টিকরণ ও এ সংক্রান্ত

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		বিধানকে সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৩.	**আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ** ১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।	১০৯। (১) এই সংবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, আপীল বিভাগের অধস্তন ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক প্রকৃতির নহে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা উক্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে। (২) এই সংবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক প্রকৃতির নহে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা উক্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে। **কারণ:** সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল বিষয়ক তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি কেমন হবে তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৪.	**অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর** ১১০। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং (ক) স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন; অথবা (খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালতে (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরৎ পাঠাইবেন	অপরিবর্তিত

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদালত উক্ত রায়ের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।	
২৫.	**সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা** ১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।	 ১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন, সিদ্ধান্ত, আদেশ এবং নির্দেশ হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন, সিদ্ধান্ত, আদেশ বা নির্দেশ অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে। **কারণ:** অধস্তন আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় বিষয়ের পরিধি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৬.	**সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা** ১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন।	 ১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত আইন, সিদ্ধান্ত, আদেশ বা নির্দেশ মানিয়া চলিতে এবং উহা প্রয়োগ ও কার্যকর করিতে বাধ্য থাকিবেন। **কারণ:** সুপ্রীম কোর্টের সহায়তার পরিধি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৭.	**সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিগণ** ১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারি সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে। (২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিদের কর্মের শর্তাবলি সেইরূপ হইবে।	**সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়** ১১৩। (১) এই সংবিধান এবং অন্যান্য আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং বিচার-কর্মবিভাগ সংক্রান্ত বিষয়াবলি পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে যাহা সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় নামে অভিহিত হইবে। (২) এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের গঠন, কার্যপরিধি, কর্মবণ্টন, বাজেট প্রণয়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		(৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মচারিদের কর্মের শর্তাবলি সেইরূপ হইবে। **কারণ:** পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় বিষয়ক প্রস্তাবের আলোকে উপরিউক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৮.	**অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা** ১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।	**অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা** ১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থাকিবে। **কারণ:** অন্যান্য বিধানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে উপরিউক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৯.	**অধস্তন আদালতে নিয়োগ** ১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।	**বিচার-কর্মবিভাগে নিয়োগ ইত্যাদি** ১১৫। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের বিচারিক কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিচার-কর্মবিভাগ নামে একটি বিভাগ থাকিবে। (২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের নিয়োগ করিবেন। (৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিচার-কর্মবিভাগের সহায়ক কর্মচারিদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। **কারণ:** *মাসদার হোসেন মামলা*র রায়ের আলোকে বিচার-কর্মবিভাগের উপর সুপ্রীম কোর্টের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে, উপরিউক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
		এক্ষেত্রে, বিচার-কর্মবিভাগের সহায়ক কর্মচারিদের চাকরির নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মচারিদের অনুরূপ বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩০.	**অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা** ১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।	**বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা** ১১৬। (১) বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিদান ও এই সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। (২) দফা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন। **কারণ:** বিচার কর্ম-বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্তকরণ এবং *মাসদার হোসেন মামলা*র রায়ের আলোকে প্রণীত বিধিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সংশোধিত ১১৬ অনুচ্ছেদ এর আলোকে ইতিপূর্বে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন সম্বলিত বিধিমালায় কিছু সংশোধন প্রয়োজন হবে।
৩১.	**বিচারবিভাগীয় কর্মচারিগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন** ১১৬ক। এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।	অপরিবর্তিত
৩২.	**কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি**	

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদের আইনের দ্বারা বা অধীন নির্ধারিত হইবে, তবে অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত (ক) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে; অথবা (খ) অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপ-দফা প্রযোজ্য না হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ণয় করিবেন, সেইরূপ হইবে।	১৪৭। (১) অপরিবর্তিত
	(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভারকালে তাঁহার পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাইবে না, যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।	(২) অপরিবর্তিত
	(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি কোন লাভজনক পদ কিংবা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় বহাল হইবেন না কিংবা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যযুক্ত কোন কোম্পানী, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনরূপ অংশগ্রহণ করিবেন না: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উপরের প্রথমোল্লিখিত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত রহিয়াছেন, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি অনুরূপ লাভজনক পদ বা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।	(৩) অপরিবর্তিত
	(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে প্রযোজ্য হইবে: (ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) প্রধানমন্ত্রী; (গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার, (ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী; (ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,	(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে প্রযোজ্য হইবে: (ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) প্রধানমন্ত্রী; (গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার, (ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী; (ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,

ক্রম	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কারণ
	(চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ছ) নির্বাচন কমিশনার, (জ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।	(চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ছ) নির্বাচন কমিশনার, (জ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।, (ঝ) বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য। **কারণ:** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরার জন্য অধস্তন আদালতের বিচারকদের পারিশ্রমিকসহ অন্যান্য সুবিধাদির সুরক্ষা প্রদান আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৩.	১৫২ (১) ... "বিচারক" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারক; ... "জেলা-বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা-বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;	১৫২ (১) ... "বিচারপতি" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারপতি; ... "জেলা জজ" বলিতে অতিরিক্ত জেলা জজ অন্তর্ভুক্ত হইবেন; **কারণ:** প্রচলিত পদবি ব্যবহারের মাধ্যমে সংবিধানের বিধানগুলোকে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সংজ্ঞাদুটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো

১.১ মামলা ও বিচারকের বিদ্যমান সংখ্যা

বাংলাদেশে বর্তমানে অধস্তন আদালতের মোট বিচারকের সংখ্যা ২,২৫৪ জন। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত থাকা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ প্রেষণে কমরত বিচারক রয়েছেন ৩১৯ জন। সুপ্রীম কোর্টের তথ্যমতে বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ও ট্রাইব্যুনাল মিলে দেশে বিচারিক কাজে কমরত বিচারকের সংখ্যা ১,৯৩৫ জন। অন্যদিকে এই ১,৯৩৫ জন বিচারকের বিপরীতে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৮,৩৭,৩২৯টি। নিচে দেশের মামলা সংখ্যা ও বিচারক সংখ্যার একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

(ক) অধস্তন আদালতে দায়েরকৃত, নিষ্পত্তিকৃত এবং বিচারাধীন মামলার পরিসংখ্যান

সাল	দায়েরকৃত মামলা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা	বিচারাধীন মামলা
২০০৮	১০৮৭৫৫৯	৬৮৫৮০৩	১৪৮৯১২১
২০১৩	১৪৪৯৪৭৬	১০৯০১৫১	২৪০৯৬৭১
২০১৮	১৬৯৫৩০৫	৯৮৮১৩৫	৩০৩২৬৫৬
২০২১	১৭০৩৮৫৫	৮৮১৩৩৯	৩৬৭৪৭৬৮
২০২২	২১৩৩৫৪৪	১৩৭৮৫২২	৩৬৬০০০১
২০২৩	১৪২৯১৮৫	১৩৩৭১২৩	৩৭২৯২৩৫
২০২৪[৩২]	৩,৩৬,৪২১	২,৭১,৯১৭	৩৮,৩৭,৩২৯

(খ) অধস্তন আদালতে বিচারিক কাজে কর্মরত বিচারকের সংখ্যা

ক্রম	বিচারকের পদ	বিচারকের সংখ্যা
১	জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারক	২৬৩
২	অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারক	২৬৬
৩	যুগ্ম জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারক	২৯১
৪	সহকারি জজ ও সিনিয়র সহকারি জজ	১১১৫
	মোট	১,৯৩৫

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৫ বছর পূর্বে ২০০৮ সালে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১৪,৮৯,১২১ টি। ২০২৩ সালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭,২৯,২৩৫ টিতে। অর্থাৎ, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আড়াই গুণেরও বেশি। সুপ্রীম কোর্টের ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০২৩ সালে অধস্তন সকল আদালতসমূহে নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিমাণ

[৩২] ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

ছিল ১৩,৩৭,১২৩টি। একই বছর দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১৪,২৯,১৮৫ টি। অর্থাৎ নিষ্পত্তিকৃত মামলার চেয়ে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা প্রায় ৯২,০৬২ টি বেশি। বর্তমানে অধস্তন আদালতে বিচারিক কাজে কমরত বিচারকের সংখ্যা ১,৯৩৫ জন। কর্মরত বিচারকরা যদি প্রতি বছরে ১৩,৩৭,১২৩ টি হারে মামলা নিষ্পত্তি করেন তবে ২০২৩ সালে বিচারাধীন ৩৭,২৯,২৩৫ টি মামলা নিষ্পত্তি করতে তাদের অতিরিক্ত প্রায় ৩ বছর সময় লাগবে। কিন্তু বিচারকের বর্তমান সংখ্যা ও মামলা নিষ্পত্তির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে এই তিন বছরে অন্তত আরো ৪৩ লক্ষ মামলা দায়ের হবে। অর্থাৎ এই দেশের জনসংখ্যা, আদালতের মামলার সংখ্যা এবং মামলা দায়েরের যে গতিপ্রবাহ তার সাথে বিচারকের সংখ্যা আদৌ ভারসাম্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের অধস্তন আদালতে বর্তমানে বিচারিক কাজে কর্মরত বিচারকের সংখ্যা নিম্নরূপ:

বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা

২০২২ সালের গণশুমারীর প্রতিবেদন অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন, অর্থাৎ বাংলাদেশের ৮৭,৭৬৬ জন মানুষের বিপরীতে বিচারকের সংখ্যা মাত্র একজন। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় এই সংখ্যা অপ্রতুল তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায়ও অনেক কম। উন্নত বিশ্বের কয়েকটি দেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশের বিচারক প্রতি মানুষের সংখ্যা তুলে ধরা হলো:

(গ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা প্রতি বিচারকের সংখ্যা

দেশের নাম	১ জন বিচারকের বিপরীতে জনসংখ্যা
যুক্তরাজ্য	৩,১৮৬
যুক্তরাষ্ট্র	১০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৪,৩০০
শ্রীলঙ্কা	৫২,৬৩২
পাকিস্তান	৫০,০০০
ভারত	৪৭,৬১৯
বাংলাদেশ[৩৩]	৮৭,৭৬৬

১.২ একজন বিচারককে একাধিক আদালতের দায়িত্ব প্রদানের নেতিবাচক ফল

বাংলাদেশে প্রায়শই দেখা যায় যে, জনস্বার্থে বা জরুরি প্রয়োজনে নতুন আইনের মাধ্যমে নতুন আদালত সৃষ্টি করে বিদ্যমান কোনো আদালতকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উভয় আদালতের মামলার চাপের কারণে দীর্ঘসূত্রিতা বেড়ে যায় এবং সামগ্রিকভাবে মামলা নিষ্পত্তিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১.৩ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল পর্যালোচনা

১.৩.১ আদালতের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একেকটি আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের সংখ্যা একেক রকম। ৮০ ও ৯০ এর দশকে যেসব আদালত সৃজিত হয়েছে এগুলোর জনবল কাঠামো কমবেশি ১০/১১ জনের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সহকারি জজ বা সিনিয়র সহকারি জজ আদালতের জনবল কাঠামো ১১ জনের। এ আদালতের সেরেস্তা শাখায় ৭ জন এবং নেজারত শাখায় ৪ জনের জনবল কাঠামো রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে সৃজিত বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে জনবল সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। জ্যেষ্ঠ বিচারকদের নিয়ে গঠিত আদালত ও ট্রাইব্যুনালের জনবল সংখ্যা খুবই কম। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারক দ্বারা গঠিত হলেও গাড়ি

[৩৩] ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী।

চালক ব্যতিরেকে সেখানে জনবলের সংখ্যা মাত্র ৫ জন। সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে জনবল কাঠামো আরো কমে গেছে। বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোতে গাড়ি চালক ব্যতিরেকে জনবলের সংখ্যা মাত্র ৪ জনের মধ্যে। তার মধ্যে তন্মধ্যে বেশ কিছু আদালতে গাড়ি চালকের পদও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া, দেশের বিদ্যমান ৫৪টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মধ্যে ৪১টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের জন্য কোনো রকম জনবল কাঠামো অদ্যাবধি সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে অন্যান্য আদালতের কর্মচারি দিয়ে এই ট্রাইব্যুনালের কাজ চালানো হচ্ছে। এতে অন্যান্য আদালতে জনবলের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় যেসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের জনবল কাঠামো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সেগুলোর জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

কমিশন মনে করে, একটি আদালতের বিচারিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত জনবল কাঠামো নির্ধারণের প্রস্তাব করছে:

জেলা জজ আদালত এবং অন্যান্য আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহ

আদালতের নাম	এনাম কমিটি প্রস্তাবিত/বিদ্যমান জনবল কাঠামো	কমিশন কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত জনবল কাঠামো
সহকারি জজ এবং সিনিয়র সহকারি জজ আদালত	১১ জন সহ/সিনি. সহ. জজ-১, সেরেস্তাদার-১, বেঞ্চ সহকারি-১, নাজির-১, হিসাবরক্ষক-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, জারিকারক-৩, অফিস সহায়ক-২	১২ জন সহকারি জজ/ সিনিয়র সহকারি জজ-১, সেরেস্তাদার-১, বেঞ্চ সহকারি-১, নাজির-১, হিসাবরক্ষক-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, প্রসেস সার্ভার-৩, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১,
যুগ্ম জেলা জজ আদালত	জেলাভেদে ৭ থেকে ৯ জন যুগ্ম জেলা জজ-১, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১, সেরেস্তাদার-১, বেঞ্চ সহকারি-১, জারিকারক-২, অফিস সহায়ক-২	১২ জন যুগ্ম জেলা জজ-১, স্টেনোগ্রাফার-১, সেরেস্তাদার-১, বেঞ্চ সহকারি (দেওয়ানি)-১, বেঞ্চ সহকারি (ফৌজদারি)-১, দায়রা সহকারি-১, হিসাবরক্ষক-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, প্রসেস সার্ভার-২, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১,
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত	জেলাভেদে ৫ থেকে ৭ জন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১, বেঞ্চ সহকারি-১, গাড়িচালক-১, অফিস সহায়ক-২	১০ জন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১, স্টেনোগ্রাফার-১, বেঞ্চ সহকারি (দেওয়ানি)-১, বেঞ্চ সহকারি (ফৌজদারি)-১, আপীল সহকার-১, দায়রা সহকারি-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, গাড়ি চালক-১, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত	৬ জন জেলা ও দায়রা জজ-১, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, বেঞ্চ সহকারি-১, গাড়িচালক-১, অফিস সহায়ক-২	১২ জন জেলা ও দায়রা জজ-১, স্টেনোগ্রাফার-১, সেরেস্তাদার-১, বেঞ্চ সহকারি (দেওয়ানি)-১, বেঞ্চ সহকারি (ফৌজদারি)-১, অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১, দায়রা সহকারি-১, আপীল সহকারি-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, গাড়ি চালক-১, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১

আদালতের নাম	এনাম কমিটি প্রস্তাবিত/বিদ্যমান জনবল কাঠামো	কমিশন কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত জনবল কাঠামো
বিশেষ আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহ	একেকটির জনবল কাঠামো একেক রকম জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে-১০ জন বিভাগীয় স্পেশাল জজের ক্ষেত্রে-১৫ জন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে- ৫-৬ জন	বিভাগীয় স্পেশাল জজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ১১ জন বিচারক-১, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১, স্টেনো টাইপিস্ট/ অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, বেঞ্চ সহকারি-১, সেরেস্তা সহকারি-১, গাড়ি চালক-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, জারিকারক-২, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১

চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

আদালতের নাম	বিদ্যমান জনবল কাঠামো	কমিশন কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত জনবল কাঠামো
জুডিসিয়াল/সিনিয়র জুডিসিয়াল/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	৪ জন জুডি/ সিনি. জুডি. ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন-১, বেঞ্চ সহকারি-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, অফিস সহায়ক-১	০৬ জন জুডি/ সিনি. জুডি. ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন-১, বেঞ্চ সহকারি-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১
অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল/অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	০৪ জন অতি. চিফ জুডি./ অতি. চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-১, বেঞ্চ সহকারি-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, অফিস সহায়ক-১	০৬ জন অতি. চিফ জুডি./ অতি. চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-১, বেঞ্চ সহকারি-১, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১
চিফ জুডিসিয়াল/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	০৭ জন চিফ জুডিসিয়াল/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-১, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, বেঞ্চ সহকারি-১, গাড়িচালক-১, পরিচ্ছন্নতা কর্মী-১, অফিস সহায়ক-১ (উল্লিখিত জনবল কাঠামোর বাইরে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট এর ১টি পদ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য কম্পিউটার অপারেটর এর ২টি পদ অন্তর্ভুক্ত আছে)	১০ জন চিফ জুডিসিয়াল/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-১, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, বেঞ্চ সহকারি-১, সেরেস্তা সহকারি-১, ডিপোজিশন রাইটার-১, গাড়িচালক-১, পরিচ্ছন্নতা কর্মী-১, অফিস সহায়ক (সেরেস্তা)-১, অফিস সহায়ক (এজলাস)-১

১.৪ কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থা: মেট্রোপলিটন শহরসহ বড় শহরগুলোতে মানুষের দুর্ভোগ

জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়নের কারণে দেশে মেট্রোপলিটন শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮টি মেট্রোপলিটন শহর রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, গাজীপুর ও রংপুর। তার মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শহরের ব্যাপ্তি বিবেচনায় আদালতে যাতায়াত করা

নাগরিকের জন্য ভীষণ অসুবিধাজনক এবং বিড়ম্বনাপূর্ণ। শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রাম নয়, অন্যান্য বড় শহরগুলোর কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থা নিয়ে সুচিন্তিত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। কারণ বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ঢাকাসহ দেশের বড় বড় মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও আদালত ব্যবস্থা স্বাধীনতা-পূর্ব অবস্থা থেকে একই রকম রয়ে গেছে।

বর্তমানে ঢাকা একটি মেগাসিটি। ১,৪৬৩.৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ঢাকা শহরের এক প্রান্তে সদরঘাট এলাকায় ঢাকার আদালতসমূহ অবস্থিত। সদরঘাটের আদালত পাড়ায় বিচারের জন্য সমগ্র ঢাকা শহর থেকে আসা জনগণকে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। তীব্র যানজটের মধ্যে ঢাকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করা যে কোনো নাগরিকের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক ও অসুবিধাজনক। এছাড়া বিচারাদালত অত্যধিক দূরে অবস্থিত হওয়ায় আসা-যাওয়ার জন্য দূর-দূরান্তের বিচারপ্রার্থী মানুষকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষের পক্ষে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এত দূরে আসা প্রায় অসম্ভব। নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নেয়ার লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুইভাবে বিভক্ত করে দক্ষিণাংশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং উত্তরাংশে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে। মেট্রোপলিটন পুলিশকেও ৮টি বিভাগে (উত্তরা বিভাগ, গুলশান বিভাগ, তেজগাঁও বিভাগ, মিরপুর বিভাগ, রমনা বিভাগ, মতিঝিল বিভাগ, ওয়ারি বিভাগ, লালবাগ বিভাগ) ভাগ করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা পাসপোর্ট অফিসকে বিকেন্দ্রীকরণ করে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এর ফলে সমগ্র ঢাকা শহরের নাগরিকরা আগারগাঁওস্থ পাসপোর্ট অফিসে না গিয়ে নিজ নিজ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পাসপোর্টের কাজ সম্পাদন করতে পারে। রাজউকও তাদের কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু ১০০ বছরেরও অনেক বেশি সময় ধরে ঢাকাবাসীর বিচারাদালত এখনও এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত রয়ে গেছে। ২ কোটি ৩২ লাখ ১৫ হাজার ১০৭ জন মানুষের এই মেগাসিটিতে বিচারের জন্য এখনও সমগ্র ঢাকার জনগণকে পুরনো ঢাকার সদরঘাট এলাকায় যেতে হয়।

ঢাকা জেলার ধামরাই, সাভার, দোহার প্রভৃতি এবং মেট্রোপলিটন শহরভুক্ত আশুলিয়া, উত্তরা, মিরপুর, রামপুরা, ভাটারা ইত্যাদি অঞ্চলের আদালত ঢাকা জেলা জজ আদালতের আওতাধীন হওয়ায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বিচারপ্রার্থী মানুষ কিংবা আসামীকে ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থিত জেলা জজ আদালতে যাতায়াত করতে হয়। ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থিত আদালতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করা ঢাকার উত্তরাঞ্চলের মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ও ব্যয়সাধ্য। একই বিষয়টি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন ধরণের ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে বিচারের জন্য বদলি করা হলে ঐ মামলাগুলোর পক্ষগণকে উক্ত আদালতে যাওয়া আসা করতে হয়। এতে দেখা যায়, সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বিচারপ্রার্থী কিংবা আসামীদের পুরনো ঢাকার সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত মহানগর দায়রা জজ আদালতে ছুটোছুটি করতে হয়।

ঢাকার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতাধীন ৭টি থানা রয়েছে। এগুলো হলো- সাভার, আশুলিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ মডেল, ধামরাই, দোহার ও নবাবগঞ্জ। তার মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী থানা হলো ধামরাই। এছাড়া সাভার, নবাবগঞ্জ ও আশুলিয়া থানা এলাকাও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে অন্তত ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এসব থানা এলাকা থেকে বিচারপ্রার্থী কিংবা আসামী হিসেবে বর্তমান চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসা-যাওয়া ভীষণ কষ্টদায়ক এবং সময় সাপেক্ষ।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীন থানার সংখ্যা হলো ৫০টি। তার মধ্যে অন্তত ১২ টি থানা - মিরপুর মডেল, পল্লবী, কাফরুল, শাহ আলী, রূপনগর, দারুস-সালাম, রামপুরা, বিমানবন্দর, ক্যান্টনমেন্ট, খিলক্ষেত, তুরাগ, উত্তর খান, উত্তরা পূর্ব, উত্তরা পশ্চিম ও ভাটারা চিফ মেট্রোপিলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে বেশ দূরে অবস্থিত। এসব থানা এলাকা থেকে বিচারপ্রার্থী কিংবা আসামীর পক্ষে বর্তমান চিফ মেট্রোপিলিটন

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসা-যাওয়া ভীষণ কষ্টদায়ক এবং সময় সাপেক্ষ। এসব এলাকা থেকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসা-যাওয়া করতে জনগণকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ঢাকা জেলা ও মহানগরীর জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও চিফ মেট্রোপলিটন আদালতকে উত্তর ও দক্ষিণ - এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করে উত্তরাংশের বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলের আদালতগুলোকে উত্তরা বা মিরপুর অথবা অন্য কোনো নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

ঢাকার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর যেমন, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরেও আদালত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ব্যাপ্তির নিরিখে সেখানে আদালত বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর যেমন, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরেও প্রয়োজন অনুসারে ক্রমান্বয়ে আদালত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।

১.৫ বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত সংস্কার

১.৫.১ সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণের জন্য আশির দশকে ব্রিগেডিয়ার এনামুল হক খানের সভাপতিত্বে Martial Law Committee on Organisational Set-up গঠন করা হয় যা 'এনাম কমিটি' নামে খ্যাত। এনাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত Table of Organisation and Equipment:Ministries/Divisions, Constitutional Bodies, Commissions etc ১৯৮২ সালের ২৬ ডিসেম্বর এবং Table of Organisation and Equipment: Department/Directorate/ Subordinate Offices ১৯৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হয়। এনাম কমিটি বিচার বিভাগের জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে, যা ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ১৫১ পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে।

এনাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত সংগঠনিক কাঠামোর পর বিচার বিভাগের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের পদ সৃজিত হয়েছে। একই ধরনের আদালতের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের জনবল নিয়ে আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে জনবল কাঠামোর ভিন্নতা রয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালতের জনবল কাঠামো ভিন্ন। যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- বর্তমানে ১২৮টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/মহানগর দায়রা জজ এর জন্য গাড়ি TO&E ভুক্ত থাকলেও ৭৩টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা/মহানগর দায়রা জজের জন্য গাড়ি TO&E ভুক্ত নেই। পার্বত্য জেলার জজশিপে মাইক্রোবাস TO&E ভুক্ত নেই।

ফলে সময়ের বিবেচনায় বিচার বিভাগের সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। একই ধরনের আদালতের জনবল কাঠামো এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির ধরন একই রকম করা প্রয়োজন।

১.৫.২ সাংগঠনিক কাঠামোতে ১০% সংরক্ষিত পদ সৃজন

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৩(৪) বিধিতে উল্লেখ রয়েছে- "সার্ভিসের মোট পদের অন্যূন ১০% অতিরিক্ত পদ ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সংরক্ষিত থাকবে।"

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখের জিও-র মাধ্যমে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ২৬টি এবং ২৯ এপ্রিল ২০০৮ তারিখের জিও-র মাধ্যমে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ২৬টি পদ সংরক্ষিত পদ হিসেবে সৃজন করা হয়।

তবে বিচার বিভাগের অন্য পদগুলোর বিপরীতে কোনো সংরক্ষিত পদ সৃজন করা হয়নি। ছুটি/প্রেষণ/প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বিচারক আদালতের দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সেখানে অন্য বিচারককে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। নিজ আদালতের দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত আদালতের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না। আদালতের দায়িত্বে পূর্ণকালীন বিচারক না থাকলে বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি তৈরি হয়। এজন্য ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সংরক্ষিত হিসেবে অতিরিক্ত পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

সংরক্ষিত হিসেবে সৃজিত অতিরিক্ত পদ থেকে যাতে জেলা পর্যায়ের আদালতে বিচারক পদায়ন করা যায় এমন ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৩ বিধিতে নিম্নোক্তভাবে নতুন করে (৫) উপ-বিধি যুক্ত করা যায়:

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ বিধি ৩	(৫) সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণক্রমে, আদালত ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ছুটি, প্রেষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত পদগুলোর বিপরীতে জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহে অতিরিক্ত বিচারক পদায়ন করিতে পারিবে।

১.৬ বিচার বিভাগের পদ সৃজন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সংস্কার

বিদ্যমান কাঠামো অনুযায়ী, বিচারকের পদ সৃজনের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হয়। ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর অর্থ বিভাগে বাস্তবায়ন অনুবিভাগ প্রস্তাবিত পদের বেতন-স্কেল নির্ধারণ করে। তারপর, পদ সৃজনের প্রস্তাব সংবলিত সারসংক্ষেপ অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপন করতে হয়ে। এজন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হয়। প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর পদ সৃজনের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হয়। সারসংক্ষেপ অনুমোদিত হলে পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয় এবং তা পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হয়। ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কন সম্পন্ন হলে পদ সৃজনের ধাপ সম্পন্ন হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের ০৪.২২১.০২২.০০.০০.০২০.২০১০-৮২ নং স্মারকের আদেশ অনুসারে ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে সৃজিত হয় এবং অন্যান্য পদ অস্থায়ীভাবে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সৃজিত হয়। বিচারকের পদ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের অর্থাৎ রাষ্ট্রের পৃথক একটি সার্ভিসের পদ হওয়া সত্ত্বেও এসব পদ অস্থায়ীভাবে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সৃজন করার সম্মতি প্রদান করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ থেকে। বিশেষায়িত আদালতের ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে নতুন আইনের অধীনে নব-প্রতিষ্ঠিত আদালতে বিচারক ও সহায়ক জনবলের অনুমোদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পেতেই লম্বা সময় লেগে যায়। তারপর অর্থ বিভাগের অনুমোদনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ব্যয় হয়। সুতরাং, আইন অনুসারে নবপ্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারক ও সহায়ক জনবলের পদ সৃজনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করা অপরিহার্য।

বিচারকদের পদ সৃজনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে:

(ক) বিচারিক পদ সৃজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ২ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগের ২ জন বিচারপতির সমন্বয়ের গঠিত বিচারিক পদ সৃজন কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত হবে।

(খ) বিচারিক পদ সৃজনের ক্ষেত্রে বিচারিক পদ সৃজন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিকট সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করবে এবং অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী বিচারকের পদ সৃজনের চূড়ান্ত আদেশ জারি করবে।

(গ) বিচারিক পদের সহায়ক জনবল সৃজন এবং বিচারিক পদের অফিস সরঞ্জামাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইন, ও বিচার বিভাগ এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে।

(ঘ) রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে বিচারক ও সহায়ক জনবলের পদ সৃজন করতে হবে।

কমিশন আদালতের সাংগঠিক কাঠামোর নিম্নরূপ পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছে:

(১) বিচার বিভাগের সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে। সহকারি জজ এবং সিনিয়র সহকারি জজ আদালতের জন্য ১২ জন, যুগ্ম জেলা জজ আদালতের জন্য ১২ জন, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জন্য ১০ জন, জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জন্য ১২ জন এবং বিশেষ আদালত/ ট্রাইব্যুনালগুলোর জন্য ১১ জনের জনবল কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। একই ধরনের আদালতের জনবল কাঠামো এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জমাদির ধরন একই রকম করতে হবে।

(২) ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বড় বিভাগীয় শহরগুলোর আদালত ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

(৩) বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সংরক্ষিত হিসেবে ১০% অতিরিক্ত পদ সৃজন করতে হবে।

(৪) বিচারকদের পদ সৃজনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করতে হবে। বিচারকের সকল পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজন করতে হবে।

১.৭ বিচার বিভাগের পদ সৃজন ও পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

বিচার বিভাগের পদ সৃজন এবং পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মামলার অনুপাতে বিচারক ও আদালতে সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন উপজেলা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে নতুন আদালত সৃজন, বিশেষায়িত পৃথক আদালত সৃজন ইত্যাদি।

১.৭.১ জেলা আদালতের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি

এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার মামলার যে চাপ এটি বর্তমানে কর্মরত ১,৯৩৫ জন বিচারকের মাধ্যমে কোনভাবেই নিরসন করা সম্ভব নয়। মামলার চলমান দীর্ঘসূত্রিতা ও অস্বাভাবিক মামলা জট নিরসনের জন্য অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা না হলে বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩ হাজারের ঊর্ধ্বে। অনেকগুলো আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা তার চেয়েও বেশ কয়েকগুণ বেশি। এত অধিক সংখ্যক মামলার চাপ নিয়ে এসব আদালতের পক্ষে কোনোভাবেই দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পূর্বে ১২ মার্চ ২০০৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সে সময়ে বিচারাধীন ৪,৮৪,৮১২টি ফৌজদারি মামলার জন্য

প্রাক্কলিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল ৮৩৮ জন। অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৭ সালের প্রাক্কলন অনুসারে বিচারক ও মামলার সুষম অনুপাত হওয়া উচিত ১:৫৭৮।

বর্তমানে বিদ্যমান মামলার চাপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের জন্য ১,০০০ মামলাকে 'আদর্শ সংখ্যা' বিবেচনা করা যায়। কোনো আদালতে এর অতিরিক্ত মামলা থাকলে একজন বিচারকের পক্ষে কোনোভাবে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। এ কারণে সারাদেশে বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি করে নতুন করে বিচারক নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে সারাদেশে বিচারিক কাজে কমরত বিচারকের সংখ্যা ১৯৩৫ জন এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুসারে সারাদেশের অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৮,৩৭,৩২৯ টি। উক্ত পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমানে বিচারক ও মামলার অনুপাত ১:১৯৮৩। প্রতি ৮০০ মামলার বিপরীতে ১ জন বিচারক প্রয়োজন হলে বিচারাধীন ৩৮,৩৭,৩২৯ টি মামলার জন্য অন্তত ৪৭৯৭ জন বিচারক প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে বিচারিক কাজে কর্মরত বিচারক রয়েছে ১৯৩৫ জন। দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ৬৪টি জেলার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মেট্রোপলিটন শহরে অবস্থিত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজ আদালতসহ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ছকের ৬ নং কলামে উল্লিখিত সংখ্যক বিচারকের পদ সৃজিত হওয়া প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে:

ক্রমিক	আদালতের নাম	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০২৪)	বিদ্যমান আদালতের সংখ্যা	যে সংখ্যক আদালত থাকা যুক্তিযুক্ত	অতিরিক্ত যে সংখ্যক আদালত সৃষ্টি করা প্রয়োজন
১.	অতিরিক্ত জেলা জজ	২,০৬,৫৯৭	১৭৩	২৫৮	৮৫
২.	যুগ্ম জেলা জজ	৪,৬৬,৫১১	১৫৬	৫৮৩	৪২৭
৩.	সিনিয়র সহকারি জজ ও সহকারি জজ	৯,৯৩,৪৪১	৪৮৭	১২৪২	৭৫৫
৪.	অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৯৭,৬০৯	৫৭	১২২	৬৫
৫.	অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	৪৯,৭৯৩	১১	৬২	৫১
৬.	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	২,০৯,৮৯৩	৫৯	২৬২	২০৩
৭.	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৩,৯৫,০০১	২৩৪	৪৯৩	২৫৯
৮.	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	২,৭৫,৪২২	২৭১	৩৪৪	৭৩
৯.	অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ	৪৯,৭৪৯	২৭	৬২	৩৫
১০.	যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ	১,৭৮,২৭৮	২০	২২২	২০২
১১.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল	১,৯৪,৮৫২	১০১	২৪৪	১৪৩
১২.	পরিবেশ আদালত	১০,৯৯৩	২	১৪	১২
১৩.	পরিবেশ আপীল আদালত	১৫৯৪	১	২	১
১৪.	শ্রম আদালত	২০,৬৬৩	১২	২৬	১৪
১৫.	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল	২,৮৯,০১০	৪২	৩৬১	৩১৯
				মোট	২৬৪৪

১.৭.২ অন্যান্য আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১.৭.২.১ সকল মহানগরে 'মহানগর দায়রা আদালত' সৃষ্টি

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৯ ধারা অনুযায়ী মহানগর দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, The Government shall establish a Court of Session for every sessions division, and appoint a judge of such Court; and the Court of Session for a Metropolitan Area shall be called the Metropolitan Court of Session. ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হলে ফৌজদারি কার্যবিধিতে কিছু সংশোধন আনা হয়। উক্ত সংশোধনীর প্রেক্ষিতেই মহানগর দায়রা আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। মহানগর দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসি ও মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, গাজীপুর ও রংপুরে মেট্রোপলিটন পুলিশ রয়েছে। তার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও গাজীপুরে মহানগর দায়রা আদালত রয়েছে। অন্যদিকে বরিশাল, রংপুর ও গাজীপুরে মহানগর দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য পদ সৃজিত হলেও এখনও উক্ত মহানগরগুলোতে মহানগর দায়রা আদালতের কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয়নি। এমতাবস্থায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মহানগর দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১.৭.২.২ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষায়িত আদালত/ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ জনগণের প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমের আইন প্রণয়ন করে থাকে। মানুষের সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব আইনে নতুন নতুন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কথা বলা হলেও বাস্তবে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি না করে ইতোমধ্যে ভারাক্রান্ত বিচারকদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এসব বিশেষায়িত আদালত পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বিচারকগণকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এসব আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব অর্পণ করার ফলে বিচারকগণের পক্ষে প্রত্যাশিত সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। এর ফলে মামলার জট ও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ছে। এ কারণে সব রকমের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষায়িত আদালত সৃষ্টি করা সম্ভব না হলেও নিম্নবর্ণিত বিশেষায়িত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের জন্য বিচারকসহ পর্যাপ্ত জনবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন:

(১) **মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা:** দেশের মোট বিচারাধীন মামলার মধ্যে একটি বড় অংশই হলো মাদকের মামলা। তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে মোট ফৌজদারি মামলার ২২% মামলায় মাদক সংক্রান্ত মামলা। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচারাধীন মাদক মামলার সংখ্যা ছিলো ৪,৭৪,৪৬৮টি। দেশের তরুণ প্রজন্ম মাদকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বয়সী কিশোর ও তরুণদের মাদকাসক্তির কারণে হাজার হাজার পরিবার অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সরকার কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা বললেও মাদকের বিচার নিয়ে কাঙ্খিত মাত্রায় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। মাদকের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা ও মহানগর পর্যায়ে বিশেষ আদালত গঠনের জন্য সরকার বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। সুনির্দিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল না থাকায় মাদকের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে না। এ অবস্থায় ২ বছর পর্যন্ত সাজা নির্ধারিত আছে এরূপ ধারার মামলা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এবং সর্বোচ্চ সাজার ধারা সম্বলিত মামলাগুলো বিচারের জন্য মাদকের বিশেষ আদালত গঠন করা প্রয়োজন।

(২) **পারিবারিক আদালত ও পারিবারিক আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা:** বর্তমানে সহকারি জজগণকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে পারিবারিক আদালতের বিচারক হিসেবে এবং জেলা জজকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে পারিবারিক আপিল আদালতের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এর ফলে পারিবারিক আদালতে মামলা নিষ্পত্তির গতি হতাশাব্যঞ্জক। পারিবারিক আদালতের বিচারপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ নারী ও শিশু এবং এ কারণে আদালতের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তারাই বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ফলে, এসব আদালতের জন্য পৃথক বিচারকের পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

(৩) **অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা:** অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ পাস হওয়ার পর সরকার ঢাকার ৪টি, চট্টগ্রামের ২টিসহ আরো ১৮টি জেলার ১৮টি যুগ্ম জেলা জজ আদালতকে অর্থঋণ আদালত হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে সরকার সারা দেশে মোট ২৭টি অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এরপর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ব্যতীত অন্যান্য জেলার অর্থঋণ আদালত বিলুপ্ত করে উক্ত মামলাগুলো যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বদলি করা হয়। এতে বিভিন্ন জেলায় অর্থঋণ আদালতের মামলা নিষ্পত্তি গতিহীন হয়ে পড়ে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনের তথ্য মতে দেশের অর্থঋণ আদালতগুলোতে বিভিন্ন ব্যাংকের ১ লাখ ১০ হাজার ৭২৬ কোটি টাকা পাওনা আটকে রয়েছে[৩৪]। বর্তমানে দেশের অর্থঋণ আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৫৩,৫৩৬ হলেও সারা দেশে পৃথক অর্থঋণ আদালত রয়েছে মাত্র ৬টি। বিদ্যমান মামলার তুলনায় অর্থঋণ আদালতের সংখ্যা খুবই অপর্যাপ্ত। এমতাবস্থায়, বিচারাধীন মামলার সংখ্যা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি বিবেচনায় বিভাগীয় শহরভুক্ত সকল জেলায় পৃথক অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার, বগুড়া এবং যশোরে পৃথক অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ঢাকায় বিচারাধীন ৩৮,২৮৭ টি মামলার জন্য মাত্র ৪টি এবং চট্টগ্রামে বিচারাধীন ৫৯০৫ টি মামলার জন্য মাত্র ১ টি অর্থঋণ আদালত রয়েছে। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকায় ২০ টি এবং চট্টগ্রাম ৩টি অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(৪) **প্রত্যেক জেলায় স্বতন্ত্র শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা:** নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারককে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে শিশু আদালতের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শিশু আদালতগুলো দেশের প্রচলিত অন্যান্য আদালতের কাঠামো থেকে ভিন্ন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিদ্যমান পরিবেশে শিশুদের বিচার করার সুযোগ নেই। এ কারণে শিশুদের বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে স্বতন্ত্র শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

(৫) **পরিবেশ আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি:** পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকে জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ধারা ৪(২) অনুসারে পরিবেশ আদালতের বিচারক হিসেবে যুগ্ম-জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নিয়োগ করতে হবে। সারা দেশের মধ্যে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ২টি পরিবেশ আদালত রয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের তুলনায় এটি খুবই অপর্যাপ্ত । একই আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে কেবল ঢাকায়

[৩৪] দৈনিক সমকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

১টি পরিবেশ আপীল আদালত রয়েছে। যেসব বিভাগীয় শহরে বর্তমানে পরিবেশ আদালত নেই সেসব বিভাগে পরিবেশ আদালত সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) **পার্বত্য জেলায় পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা:** পারিবারিক মামলা বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সালে The Family Court Ordinance, 1985 প্রণয়ন করে। পার্বত্য জেলাগুলোতে সেসময় বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস তেমন একটা না থাকায় ৩ পার্বত্য জেলা- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িকে অধ্যাদেশের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়। The Family Court Ordinance, 1985 রহিত করে পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু উক্ত আইনেও পূর্বোক্ত অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতায় ৩ পার্বত্য জেলাকে পারিবারিক আদালত বহির্ভূত রাখা হয়। কমিশন এরূপ বিধানের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পায়নি। কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মত বিনিময়কালে জানতে পেরেছে উক্ত জেলাগুলোতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ অনুসারে দেখা যায় তিন পার্বত্য জেলায় মোট জনসংখ্যার ৫০.০৬% বাঙালি। কাজেই সেখানে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক বিচারপ্রার্থী পারিবারিক আদালতের বিচার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক নারী দেনমোহর ও ভরণপোষণ আদায় কিংবা নাবালকের অভিভাবকত্ব নির্ধারণ বা তাদের জিম্মায় গ্রহণের বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারছে না। এছাড়া অংশীজন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রদত্ত মতামত অনুযায়ী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অনেক নারী ও শিশু তাদের Customary Personal Law অনুসারে অধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় বিচারপ্রার্থী মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধনক্রমে ৩ পার্বত্য জেলায় পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করার আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(৭) **পৃথক দ্রুত বিচার আদালত প্রতিষ্ঠা:** আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ৮ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক দ্রুত বিচার আদালত গঠনের বিধান রয়েছে। বর্তমানে জেলার কোনো একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দ্রুত বিচার আদালতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দ্রুত বিচার আদালতের মামলাগুলো বিশেষ প্রকৃতির এবং জনগুরুত্বপূর্ণসম্পন্ন হওয়ায় এগুলো বিচারের জন্য জনবলসহ পৃথক আদালত সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

(৮) **বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা:** নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৪ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। বর্তমানে জেলার কোনো একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। খাদ্যে ভেজাল রোধসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা জরুরি।

(৯) **বন আদালত প্রতিষ্ঠা:** Forest Act, 1927 এর ৬৭অ ধারা অনুযায়ী বন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। বর্তমানে জেলার কোনো একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বন আদালতের দায়িত্ব প্রদান করা হলেও স্বতন্ত্র আদালত সৃষ্টি না হওয়ায় বন আদালতের

মামলা নিষ্পত্তিতে বিঘ্ন ঘটছে। বর্তমানে সারাদেশে ৫৩টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল রয়েছে। বন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য দেশে ৪৭টি জেলায় বন আদালত থাকলেও ১টি আদালতও সৃজিত আদালত নয়। এমতাবস্থায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ব্যপ্তি ও আয়তন, বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ও আদালতের ভৌগোলিক দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্বলিত জেলা চট্টগ্রাম, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ৭টি বন আদালত সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় হবে।

(১০) **মেরিন আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ** বর্তমানে ঢাকায় একটি মেরিন আদালত রয়েছে। সেখানে একজন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের জজ কমরত রয়েছেন। Inland Shipping Ordinance, 1976 এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী এক বা একাধিক মেরিন আদালত স্থাপনের বিধান রয়েছে। চট্টগ্রাম ও খুলনায় সমুদ্র বন্দর থাকলেও সেখানে মেরিন আদালত না থাকায় মেরিন সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ঢাকায় আসতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় ঢাকা ও খুলনার দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে উক্ত দুটি সমুদ্র বন্দর এলাকায় পৃথক দুটি মেরিন আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১.৭.৩ বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা

১.৭.৩.১ বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও গুরুত্ব

বাংলাদেশ ব্যাংকের জুন ২০২৪-এ প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা জিডিপি) - এর শতকরা হার ৮৮ ভাগের বেশি আসে শিল্প ও সেবা খাত থেকে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি প্রধান হলেও জিডিপি-তে কৃষিখাতের অবদান গত কয়েক দশক ধরেই সংকুচিত হতে হতে বর্তমানে তা শতকরা ১১-১২ এর আশেপাশে নেমে এসেছে। আবার কৃষিখাতেও বাণিজ্যিকিকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ, অতীতের পরিবার-ভিত্তিক ও প্রথাগত পদ্ধতির কৃষিকাজের জায়গায় আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও প্রযুক্তির সহযোগে কৃষি কার্যক্রম বাণিজ্যিক পরিসরে প্রবেশ করেছে। স্পষ্টতই, আমাদের জাতীয় জীবনে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৭.৩.২ বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান

যেকোন বাণিজ্যিক উদ্যোগ, বিশেষ করে সেবা ও শিল্পখাতের সাথে চুক্তি বাস্তবায়ন ও বলবৎকরণের সম্পর্ক অপরিহার্য। তাই, একটি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ কতটা সহায়ক তার অন্যতম পরিমাপক হিসাবে বাণিজ্যিক চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিরোধ নিরসনে ব্যয়িত সময় ও খরচকে বিবেচনায় নেয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত জরিপের মূল্যায়ন অনুযায়ী বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আমাদের বিচার ব্যবস্থার অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় নিম্নতম পর্যায়ে রয়েছে। এর দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) ২০২১ সালে প্রকাশিত "ডুইং বিজনেস" (Doing Business) শিরোনামের প্রতিবেদনে চুক্তি বলবৎ করার মানদণ্ডে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ১৮৯ তম। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে একটি চুক্তি বলবৎ করতে গড়ে ১,৪৪২ দিন, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার বছর, সময় প্রয়োজন হয় এবং দাবিকৃত অর্থের দুই-তৃতীয়াংশই মামলার পেছনে খরচ হয়ে যায়।

(খ) ২০২৪ সালে প্রকাশিত "বিজনেস রেডি" (Business Ready) প্রতিবেদনে বিরোধ নিষ্পত্তির মানদণ্ডে ৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ৪১.৯০ নম্বর নিয়ে সর্বনিম্ন ধাপে স্থান পায়।

১.৭.৩.৩ পশ্চাদপদতার কারণ

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির পেছনের বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লখযোগ্য হলো:

(ক) বিচারিক প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া;
(খ) এ জাতীয় বিরোধকে অন্যান্য বিরোধের সমপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করে একই আদালতে বহুবিধ দেওয়ানি, ফৌজদারি ও অন্যান্য মামলার সাথে একই কাতারে রাখা ও নিষ্পত্তি করা;
(গ) বাণিজ্যিক বিরোধ সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর অস্পষ্টতা ও অপর্যাপ্ততা;
(ঘ) বিচার প্রক্রিয়াকে প্রলম্বিত করার সাধারণ প্রবণতা;
(ঙ) বাণিজ্যিক বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির অপরিহার্যতার ব্যাপারে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সচেতনতার অভাব, ইত্যাদি।

১.৭.৩.৪ বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত ও সুনির্দিষ্ট আদালতের দৃষ্টান্ত

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও শ্রীলংকায় বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো নেয়া হয়েছে:

(ক) ভারতে Commercial Courts Act, 2015 প্রণয়নের মাধ্যমে জেলা পর্যায় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওই আইনের মাধ্যমে দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮-এর সংশ্লিষ্ট বিধানগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনীও আনা হয়েছে।
(খ) শ্রীলংকায় High Court of the Provinces (Special Provisions) Act, 1996-এর অধীনে হাইকোর্ট পর্যায়ে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও তাদের রয়েছে।

ঐ দেশ দু'টির আইন অনুসারে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে "বাণিজ্যিক বিরোধ" বলে চিহ্নিত বিরোধগুলোই বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক বিচার্য হয়। তবে, বিরোধের মূল্যমানের ভিত্তিতেও বাণিজ্যিক আদালতের আর্থিক এখতিয়ার নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, স্বল্প মূল্যমানের কোন বিরোধ বিষয়বস্তুর দিক থেকে "বাণিজ্যিক" চরিত্রের হলেও বাণিজ্যিক আদালতে সাধারণত তার বিচার হয়না।

বাংলাদেশেও এ ধরনের বিশেষায়িত আদালতের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, অর্থঋণ আদালত আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অর্থঋণ আদলতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য একটি বিশেষ কার্যপ্রণালি অনুসরণ করা হয়। ফলে, অন্যান্য দেওয়ানি আদলতের তুলনায় উক্ত আদালতগুলোতে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। অর্থাৎ, কোন আদালতের উপর শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণির বিরোধ নিষ্পত্তির এখতিয়ার অর্পণ করা হলে তার দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

১.৭.৩.৫ বাণিজ্যিক বিরোধ ও সালিস

বাণিজ্যিক বিরোধের একটি উল্তেখযোগ্য অংশ সালিস (arbitration) এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, এবং কেবলমাত্র সালিস আইনের বিধান অনুযায়ী কতগুলো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই আদালত তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং অন্যান্য সালিসের ক্ষেত্রে জেলাজজ আদালত সেই এখতিয়ার প্রয়োগ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বাস্তবে দেখা যায়, জেলাজজ যেহেতু নানাবিধ বিষয়ে তার বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন, সেহেতু সালিস আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলোর নিষ্পত্তি যত দ্রুত হওয়া আবশ্যক তত দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়না। অনেক ক্ষেত্রে বছরের পর বছর সালিস সংক্রান্ত মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকে এবং তার ফলে সালিসের মূল কার্যধারাও বিলম্বিত হয়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সালিস আইন সংশোধন করে সালিস সংক্রান্ত বিষয়াদিও (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত) বাণিজ্যিক আদালতের উপর ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

১.৭.৩.৬ কমিশনের প্রস্তাব

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে দেশে বাণিজ্যের প্রসারকে বেগবান করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করার স্বার্থে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্পই নেই। সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময়কালে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজন দ্রুততার সাথে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উপর জোর দেন।

এই প্রেক্ষাপটে কমিশন নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব করছে:

(ক) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সুনির্দিষ্ট কিছু জেলা আদালতে প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।

(খ) এই লক্ষে যথাযথ বিধান সম্বলিত একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে, এবং দেওয়ানি কার্যাবিধিসহ অন্যান্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

(গ) Civil Courts Act 1887-এ নির্ধারিত যুগ্ম জেলাজজের আর্থিক এখতিয়ারের (২৫ লাখ টাকার বেশি) আলোকে যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের বিচারকদের সমন্বয়ে বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা যেতে পারে, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তুগুলো বাণিজ্যিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা যেতে পারে, যথা:

(অ) ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন, চুক্তি ও বাণিজ্যিক দলিলাদি (commercial instruments) থেকে উদ্ভূত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব;

(আ) পণ্য বা সেবার আমদানি-রফতানি বা ক্রয়-বিক্রয়;

(ই) নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি;

(ঈ) বীমা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(উ) মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়াদি

(ঊ) এজেন্সি ও ফ্র্যাঞ্চাইজি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঋ) সরবরাহ/বিতরণ ও লাইসেন্সিং সংক্রান্ত চুক্তি;

(এ) অংশীদারি চুক্তি;

(ঐ) প্রযুক্তি উন্নয়ন (technology development) চুক্তি;

(ও) যৌথ উদ্যোগ (joint venture) বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে চুক্তি; এবং অন্যান্য বিষয়াদি, যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক আদালতের এখতিয়ারাধীন বলে নির্ধারণ করবে।

(ঘ) সালিস আইন সংশোধন করে সালিস সংক্রান্ত বিষয়াদি (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত) বাণিজ্যিক আদালতের উপর ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) Civil Courts Act 1887 সংশোধন করে বাণিজ্যিক আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে সরাসরি আপিল দায়ের করার বিধান করতে হবে।

(চ) অর্থঋণ আদালত আইনের অনুসরণে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত আইনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ও রিভিশনের বিধান রাখা যাবেনা।

(ছ) বাণিজ্যিক আদালতে বিচারাধীন বিরোধগুলোকে মধ্যস্থতা (mediation) বা অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতিতে নিরসণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে আইনে প্রয়োজনীয় কার্যকর বিধান করতে হবে।

(জ) বাণিজ্যিক আদালত থেকে উদ্ভূত বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগেও এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বেঞ্চ গঠন করতে হবে। হাই কোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ বিভাগীয় সদরগুলোতে স্থাপিত[৩৫] হওয়ার পর বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের বেঞ্চ গঠন করা যেতে পারে, যেন স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক বিরোধগুলোর সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভবপর হয়।

(ঝ) বাণিজ্যিক বিরোধের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিচারকদের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে অবহিতকরণ এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৭.৪ নতুন উপজেলা প্রতিষ্ঠার সাথে নতুন পদ সৃজন

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) যখন নতুন উপজেলা অথবা থানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় তখন 'নতুন উপজেলা, থানা এবং তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত নীতিমালা, ২০০৪' অনুসরণ করে। নতুন উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানে আবশ্যিকভাবে উপজেলা নির্বাহী পদ সৃষ্টির প্রস্তাব থাকে। কিন্তু নতুন উপজেলা প্রতিষ্ঠা হলে সহকারি জজ/সিনিয়র সহকারি জজ পদের সৃষ্টি হয় না। ফলে কার্যত দেখা যায়, একজন সহকারি জজকে বেশ কয়েকটি উপজেলার স্থানিক এখতিয়ারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। নতুন উপজেলা স্থাপনের সঙ্গে যেন সহকারি জজ/সিনিয়র সহকারি জজ ও প্রয়োজনমাফিক যুগ্ম জেলা জজের পদ তৈরি করা হয় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। একই কথা নতুন থানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুন থানার সঙ্গে বেশ কিছু পদ তৈরি করা হলেও ম্যাজিস্ট্রেট পদ তৈরি করা হয় না। নতুন থানার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট পদ তৈরি করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কমিশনের মতে বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি উপজেলায় একজন সহকারি জজ/সিনিয়র সহকারি জজ এবং একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এর পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন[৩৬]। সুতরাং উক্ত সরকারি নীতিমালা ২০২৪ এবং কমিশনের এই প্রস্তাব অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক পদ ও পর্যাপ্ত সহায়ক জনবল সৃষ্টি করতে হবে।

২০০৪ সালের নতুন উপজেলা, থানা এবং তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনপূর্বক আদালতের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বিচার বিভাগের ১ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

১.৭.৫ আদালতের মামলা সংখ্যা পর্যালোচনা ও আদালত স্থানান্তর

দেশের বিদ্যমান আদালতের মামলার সংখ্যা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো জেলায় আদালতে মামলার সংখ্যা কম থাকলে অধিক সংখ্যক মামলার জেলায় সাময়িকভাবে আদালত স্থানান্তর করতে হবে। এর

---

[৩৫] ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

[৩৬] ঐ।

ফলে মামলা নিষ্পত্তির গতি বৃদ্ধি পাবে। ২৯ এপ্রিল ২০০৮ তারিখের জিও-র মাধ্যমে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১৫টি এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৫টি পদ সৃজন করা হয়। তবে এসব পদের জেলাভিত্তিক বিন্যাস করা হয়নি। মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে উক্ত ২০টি পদ কাজে লাগানো যায়। যেসব জেলায় মামলা সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে সেসব জেলায় উক্ত ২০টি পদ হতে সাময়িকভাবে বিচারক পদায়ন করা যায়।

১.৭.৬ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোতে আইটি শাখা অন্তর্ভুক্তকরণ

দেশের জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মহানগর দায়রা জজ আদালতের অধীনে বিভিন্ন স্তরের বহু সংখ্যক আদালত কাজ করলেও এসব প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন আইটি কর্মকর্তা কিংবা আইটি শাখা নেই। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠান এবং অধীনস্থ আদালতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। আদালতের ব্যবহার্য কম্পিউটারসহ কোন আইসিটি যন্ত্রাংশে কোনোরকম ত্রুটি বা অসুবিধা দেখা দিলে আদালতের পুরো কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়ে। দেশের সকল জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোতে আইটি অফিসারসহ একটি আইটি শাখা অন্তর্ভুক্ত করা গেলে বিচার কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা সহজতর হবে। উক্ত আইটি শাখায় ১ জন সহকারি প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারি মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহায়ক পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১.৭.৭ সহকারি জজ ও সিনিয়র সহকারি জজ এর বিদ্যমান পদ নাম পরিবর্তন

Civil Courts Act, 1887 এর ধারা ৩ এ বিভিন্ন রকম দেওয়ানি আদালত সম্পর্কে বলা হয়েছে । উক্ত ধারায় অন্যান্য দেওয়ানি আদালতের পাশাপাশি সিনিয়র সহকারি জজ আদালত এবং সহকারি জজ আদালতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একজন বিচারকের পদবীর শুরুতে 'সহকারি' শব্দটি থাকায় এটি অনেক সময় জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারি/সহকারি জজগণকেও এ কারণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। এমতাবস্থায় বিচারকের পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে 'সহকারি জজ' এর পরিবর্তে 'সিভিল জজ' এবং 'সিনিয়র সহকারি জজ' এর পরিবর্তে 'সিনিয়র সিভিল জজ' নামকরণ করা সমীচীন। এ ক্ষেত্রে Civil Courts Act, 1887 এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

১.৭.৮ আদালতে অপর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী

দেশের অধিকাংশ আদালতে যে সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে চাহিদার তুলনায় এটি খুবই অপর্যাপ্ত। বহুতল বিশিষ্ট একেকটি আদালত ভবনের জন্য কোথাও একজন কিংবা কোথাও দুইজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে। এত স্বল্প সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী দিয়ে সকল আদালতের এজলাস, করিডোর, খাসকামরা, ওয়াশরুম, আদালত প্রাঙ্গণ ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়। আদালত প্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে প্রত্যেক ফ্লোরের জন্য একজন অথবা আদালতের প্রত্যেকটি স্থাপনার (জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত) বিপরীতে ন্যূনতম পাঁচ জন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১.৭.৯ আদালতের জনবল কাঠামো হতে আউটসোর্সিংভুক্ত পদ বাদ দিয়ে স্থায়ী পদ সৃষ্টি

বর্তমানে বিভিন্ন আদালতের জনবল কাঠামোতে বেশ কিছু পদকে আউটসোর্সিংভুক্ত করা হয়েছে। এসব পদের মধ্যে জারিকারক, অফিস সহায়ক এবং গাড়ি চালক উল্লেখযোগ্য। আদালত যেহেতু একটি আইনি প্রতিকার

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এর জনবল কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আদালতের গোপনীয়তা, সুরক্ষা, স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। আদালতকে নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য চুক্তিভিত্তিক কিংবা আউটসোসিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ করা সমীচীন নয়। এ কারণে অধস্তন আদালতের জনবল কাঠামোতে থাকা আউটসোর্সিংভুক্ত পদগুলোকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

১.৮ আদালতের সহায়ক কর্মচারি সংক্রান্ত বিষয়াবলি

১.৮.১ কর্মচারিগণের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও সুপারিশ

অধস্তন আদালতে কর্মচারি নিয়োগের জন্য বর্তমানে ২টি নিয়োগ বিধি রয়েছে। জেলা জজ ও অধস্তন আদালতসমূহ এবং বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৯ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসির আদালতসমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর আওতায় অধস্তন আদালতের কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়। উভয় নিয়োগ বিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি আদালতের কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করে।

জেলা পর্যায়ের আদালতে কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। কমিশন বিচারকসহ বিচার বিভাগের অন্যান্য অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করে জানতে পেরেছে যে, স্বচ্ছভাবে আদালতের কর্মচারি নিয়োগ করা বিচার বিভাগের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদালতের কর্মচারি নিয়োগের এই পদ্ধতিটি একদিকে বিচারিক কাজের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকেও ক্ষুন্ন করছে। কর্মচারি নিয়োগের বিদ্যমান প্রক্রিয়া থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তথা জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকগণকে বাইরে রাখা উচিত। কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয়ভাবে গঠিত বাছাই কমিটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারি নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করছে:

১. অধস্তন আদালতে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ও দায়রা জজ বা ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়োগযোগ্য আদালতভিত্তিক তৃতীয় (করণিক) ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির শূন্য পদের একটি তালিকা জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করবে;

২. জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত সকল শূন্য পদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের দরখাস্ত আহবান করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। কমিশন প্রাপ্ত দরখাস্ত যাচাই-বাছাই করে উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করে নিয়োগ বিধি মোতাবেক পরীক্ষা গ্রহণ করবে;

৩. জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন রিকুইজিশন মোতাবেক দেশের ৮টি বিভাগে পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং ফলাফল প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করবে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে জেলাজজ বা মেট্রোপলিটন সেশন জজ বা বিশেষায়িত আদালতের বিচারক কর্মচারিগণের নিয়োগ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারিদেরকে তাদের নিজ নিজ জেলায় পদায়নের প্রয়াস থাকা বাঞ্ছনীয়।

১.৮.২ আদালতের কর্মচারিদের পদোন্নতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য

অধস্তন আদালতে সহায়ক কর্মচারি জন্য বর্তমানে ৩৪ ধরনের পদ রয়েছে। উক্ত পদগুলোর ধরন, বেতন স্কেল, নিয়োগের যোগ্যতা ও পদমর্যাদা বা গ্রেড পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ পদই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির পদ।

আদালতে দ্বিতীয় শ্রেণির মাত্র একটি পদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) রয়েছে। আদালতের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে প্রথম শ্রেণির কোনো পদই নেই। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির পদ না থাকার কারণে আদালতের কর্মচারিদের মধ্যে পেশাদারিত্ব কম। তাদের কাজের মান এবং দক্ষতাও সন্তোষজনক নয়। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদ না থাকায় অন্যান্য কর্মচারিদের পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত। অথচ একই ধরণের বা সমপর্যায়ের পদে অন্যান্য অফিস বা দপ্তরে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। আদালতের বিদ্যমান প্রশাসনিক কাজের বিস্তৃতি বিবেচনায় নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সহকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা- এই দুইটি পদ সৃজন করা যেতে পারে। জেলা জজ ও বিশেষ জজ আদালতের জন্য একটি এবং ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য অন্যটি উভয় বিধিমালায় সংশোধনক্রমে একই রূপ মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।

সুপারিশ

১. কর্মচারিদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান ২টি চাকুরি বিধি সংশোধন করে একই ধরনের যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

২. প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর সম্প্রসারিত করে উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সহকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ সৃজন করতে হবে।

৩. দেশের ৬৪টি জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ৬৪টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ৮টি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং ৮টি মহানগর দায়রা জজ আদালতসহ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে এ অধ্যায়ের ১.৭.১ নং ক্রমিকভুক্ত ছকের ৬ নং কলামে উল্লিখিত ২,৬৪৪টি বিচারকের পদ জরুরি ভিত্তিতে সৃষ্টি করতে হবে।

৪. এ অধ্যায়ের ১.৭.২ নং ক্রমিকের (ক) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বরিশালে, রংপুর ও গাজীপুরে মহানগর দায়রা আদালত, (খ) নং ক্রমিকের (১) এ বর্ণিত পৃথক মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, (২) এ বর্ণিত পৃথক পারিবারিক আদালত ও পারিবারিক আপীল আদালত, (৩) এ বর্ণিত পৃথক অর্থঋণ আদালত, (৪) এ বর্ণিত স্বতন্ত্র শিশু আদালত, (৫) এ বর্ণিত পরিবেশ আদালত, (৭) এ বর্ণিত পৃথক দ্রুত বিচার আদালত, (৮) এ বর্ণিত পৃথক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, (৯) এ বর্ণিত পৃথক বন আদালত এবং (১০) এ বর্ণিত মেরিন আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধনপূর্বক পার্বত্য জেলাগুলোতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. ১.৭.৩.৬ ক্রমিকের প্রস্তাব মতে দেওয়ানি কার্যবিধি আইন সংশোধনপূর্বক পৃথক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. সকল জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোর TO&E-তে আইটি শাখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আইটি শাখায় ১ জন সহকারি প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারি মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহায়কের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. Civil Courts Act, 1887 এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ সংশোধনপূর্বক সহকারি জজ/সিনিয়র সহকারি জজের পদনাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে সিভিল জজ এবং সিনিয়র সিভিল জজ নামকরণ করতে হবে।

৯. আদালতের প্রত্যেকটি স্থাপনার (জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত) বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১০. আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের নিয়োগ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১১. সহায়ক কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে এবং তাদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল কাঠামোতে প্রথম শ্রেণির পদ সৃজন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির পদসংখ্যা বৃদ্ধি করহে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা

১.১ ভূমিকা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বাধীনতা এবং বিচারকদের কর্মকালের নিরাপত্তা। বিচার বিভাগের কার্যকরতা নিশ্চিত করার জন্যও আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন, অন্যথায় বিচারিক সেবার মান হ্রাস পায়। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগকে বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন করতে হবে এবং বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনের স্বার্থে বিচারকদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে।

১৯৮৫ সালে ইতালির মিলানে অনুষ্ঠিত 7th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders-এ গৃহীত হয় Basic Principles on the Independence of the Judiciary, যা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশন ৪০/৩২, তারিখ: ২৯.১১.১৯৮৫ এবং ৪০/১৪৬, তারিখ: ১৩.১২.১৯৮৫ এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয় । উক্ত নীতিমালার ১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে: *The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.*

১৯৮১ সালে প্রণীত International Commission of Jurists দ্বারা প্রণীত Siracusa Principles on Independence of the Judiciary এর ২৪, ২৫ ও ২৬ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হয়। ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

> The budget of the judiciary should be established by the competent authority in collaboration with the judiciary. The amount allotted should be sufficient to enable each court to function without an excessive workload. The judiciary should be able to submit their estimate of their budgetary requirements to the appropriate authority.

১.২ মাসদার হোসেন মামলার রায়ে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গ

মাসদার হোসেন মামলার রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের জন্য বার্ষিক যে বাজেট বরাদ্দ করা হবে তার সীমার মধ্যে প্রধান বিচারপতি নির্বাহী বিভাগ, যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়ের, হস্তক্ষেপ ছাড়াই ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। প্রধান বিচারপতি বাজেটের সীমার মধ্যে নিজেই ব্যয়ের খাত উপযোজন করার ক্ষমতা রাখবেন। রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ[৩৭]:

> The financial independence of the Supreme Court is inextricably connected with the functioning of the subordinate judiciary as the High Court Division has a controlling role and a supervisory role and the Supreme Court has a consultative role connected with the subordinate judiciary. Financial independence of the Supreme Court can be secured if the funds allocated to the Supreme Court in the annual budgets are allowed to be disbursed within the limits of the sanctioned budgets by the Chief Justice without any interference by the Executive i.e. without seeking the approval of the Ministry of Finance or any other Ministry. The Chief Justice will be competent to make

[৩৭] Para 64, Secretary, Ministry of Finance Vs. Md. Masdar Hossain and others, 52 DLR (AD) 82.

> reappropriation of the amounts from one head to another, create new posts, abolish old posts or change their nomenclature, to upgrade or downgrade, etc as per requirements, provided the expenditure incurred falls within the limits of the budget allocation. To ensure financial discipline an Accounts Officer of the Accountant General may sit in the Supreme Court premises for pre-audit and issue of cheques. The executive control over the financial independence of the Supreme Court will thus be eliminated.

মাসদার হোসেন মামলার রায়ে যে ১২ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তার ৯ নম্বর দফা সুপ্রীম কোর্টের আর্থিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত। উক্ত দফায় উল্লেখ করা হয়েছে[৩৮]:

> It is declared that the executive Government shall not require the Supreme Court of Bangladesh as to seek their approval to incur any expenditure on any item from the funds allocated to the Supreme Court in the annual budgets, provided the expenditure incurred falls within the limit of the sanctioned budgets as more fully explained in the body of the judgment. Necessary administrative instructions and financial delegations to ensure compliance with this direction shall be issued by the Government to all concerned including the appellant and other respondents to the writ petition effective by 31-5-2000.

১.৩ কমিশনের অনলাইন জরিপে বাজেট সম্পর্কিত মতামত

কমিশন সাধারণ নাগরিকসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। এর অংশ হিসেবে বিচার বিভাগের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপের মতামত থেকে দেখা যায় যে, অংশগ্রহণকারী শতকরা ৭০%-এর বেশি উত্তরদাতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন।

২. বিচার বিভাগের বাজেট

২.১ বাজেট নির্ধারণ ও ব্যয়

বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকে প্রদেয় পারিশ্রমিক এবং সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিদের প্রদেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের (Consolidated Fund) উপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৮৯(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির (বাজেট) অংশ সংসদে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু তা ভোটের আওতাভুক্ত হবে না। অন্যান্য ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরি-দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং কোন মঞ্জুরি-দাবিতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতির কিংবা মঞ্জুরি-দাবিতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস সাপেক্ষে তাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকবে। সুপ্রীম কোর্টের প্রশাসনিক ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আংশিক পদক্ষেপ।

বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হলো সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা। বার্ষিক বাজেটে বিচার বিভাগের (অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত) জন্য কি পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন সেটা নির্ধারণের ক্ষমতাও বিচার বিভাগের থাকা আবশ্যক। সুপ্রীম কোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বর্তমানে প্রধান বিচারপতির উদ্যোগে গঠিত একটি কমিটি রয়েছে। অনুরূপ ধারণা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতগুলোর জন্য মোট বার্ষিক বাজেট নির্ধারণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নেতৃত্বেও একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যেখানে নির্বাহী বিভাগেরও

[৩৮] Secretary, Ministry of Finance Vs. Md. Masdar Hossain and others, 52 DLR (AD) 82

প্রতিনিধিত্ব থাকবে। প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় আইনে[৩৯] উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের পাশাপাশি অধস্তন আদালতের বিচারক ও কর্মচারিদের প্রদেয় পারিশ্রমিককে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে[৪০]। এই প্রস্তাবের সাথে বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (চ) এর অধীন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।

সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদিত বাজেটে ব্যয়ের বেশ কিছু ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়। তারকা চিহ্নিত অর্থনৈতিক কোডের অর্থ খরচের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হয়। অনুমোদিত বাজেটের অর্থ ব্যবহার করে সুপ্রীম কোর্টের জন্য গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়। তারকা চিহ্নিত অর্থনৈতিক কোডে উপযোজন ও পুনঃউপযোজনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই পরিস্থিতি মাসদার হোসেন মামলার রায়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

সুপ্রীম কোর্টকে কোনো উন্নয়ন বাজেট প্রদান করা হয় না। সুপ্রীম কোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করতে হলে সুপ্রীম কোর্টকে উন্নয়ন বাজেট প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ

বর্ণিত পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(১) সংবিধানের ৮৮(চ) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় আইনে এই মর্মে একটি বিধান যোগ করতে হবে যে, সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হবে একটি দায়যুক্ত ব্যয়। এই বাজেট নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে প্রধান বিচারপতির উদ্যোগে গঠিত বাজেট প্রণয়ন কমিটির উপর।

(২) সুপ্রীম কোর্টের জন্য বরাদ্দকৃত যে বাজেট সংসদে পাশ হবে তা স্বাধীনভাবে খরচ করার স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। বাজেট উপযোজন এবং পুনঃউপযোজনের পরিপূর্ণ ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে প্রদান করতে হবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্টকে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

২.২ বিচারপতিদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের আর্থিক বিষয়াদি নির্ধারিত রয়েছে। বিচারপতিদের আর্থিক বিষয়াদি সংক্রান্ত ৩টি আইন রয়েছে। এগুলো হলো:

ক্রমিক	আইনের নাম	কার্যকরের তারিখ
১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১	৭ ডিসেম্বর ২০২১
২.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১	৭ ডিসেম্বর ২০২১
৩.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ছুটি, পেনশন ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২৩	১৯ জানুয়ারি ২০২৩

[৩৯] পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।
[৪০] একাদশ অধ্যায় দেখুন।

সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের পারিতোষিক, বিশেষাধিকার ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ অনুসারে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। নির্বাহী বিভাগ যাতে উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংসদের নিকট উপস্থাপন করে তেমন বিধান রাখতে হবে।

সুপারিশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের পারিতোষিক, বিশেষাধিকার ও অন্যান্য ভাতা নির্ধারণ/পরিবর্তন/সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

৩. বাজেট কাঠামো

৩.১ বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি

রাষ্ট্রের তিন বিভাগের একটি বিচার বিভাগ হলেও আর্থিক স্বাধীনতার দিক থেকে এই বিভাগ অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বরাবরই অপ্রতুল। একথা অনস্বীকার্য যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, অর্থাৎ আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে না পারলে স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদন কষ্টকর।

সারণি: বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ (১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর)

অর্থবছর	আইন ও বিচার বিভাগ			বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট			মোট বরাদ্দ	মোট বাজেট	শতকরা বরাদ্দ
	অনুন্নয়ন (রাজস্ব)	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন (রাজস্ব)	উন্নয়ন	মোট			
১৯৯৯-২০০০	১১১	১৬	১২৭	-	-	-	১২৭	৩৪,২৯২	০.৩৭০
১৯৯৯-২০০০ (সংশোধিত)	১১৬	২৪	১৪০	-	-	-	১৪০	৩৫,৯৩৪	০.৩৮৯
২০২৩-২০২৪ (সংশোধিত)	১৪৭০	২৪৭	১৭১৭	২৩৭	০	২৩৭	১৯৫৪	৭,১৪,৪১৮	০.২৭৩
২০২৪-২০২৫	১৮৬৬	১৫৬	২০২২	২৪৮	০	২৪৮	২২৭০	৭,৯৭,০০০	০.২৮৪
গাড়ি বরাদ্দ									০.৩৮২

- সকল টাকার অংক কোটি টাকায়।
- ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বাজেট আলাদা প্রণয়ন করা হচ্ছে। তার আগের অর্থবছরগুলোর বাজেটের হিসাবে সমগ্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশ উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে সুপ্রীম কোর্টের জন্য আলাদা বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। তার আগে আইন মন্ত্রণালয়ের বাজেটেই সুপ্রীম কোর্টের বাজেট অন্তর্ভুক্ত রাখা হতো।
- আইন ও বিচার বিভাগের বাজেটে নিবন্ধন অধিদপ্তরের বাজেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিবন্ধন অধিদপ্তরের বাজেট বাদ দিলে বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ আরও কম হবে।

১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিচার বিভাগের জন্য গড়ে রাষ্ট্রের বাজেটের ০.৩৮২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়। বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ কতোটা কম তা এ এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট ছিল ৩৪,২৯২ কোটি টাকা। বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ০.৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট ছিল ৭,৯৭,০০০ কোটি টাকা। বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় ২২৭০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ০.২৮৪ শতাংশ। এ পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, জাতীয়

বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ শতাংশের হিসেবে কমেছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শতাংশের হিসেবে বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ কমেছে ০.০৮৬ শতাংশ। অথচ সময়ের পরিক্রমায় বিচার বিভাগের লোকবল, অবকাঠামো বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে বিচার বিভাগের সঙ্গে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি যুক্ত হলেও পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে বাজেট সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। বিচার বিভাগের জন্য উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বরাবরই কম থাকে। উন্নয়নখাতে বাজেট বরাদ্দ কম হলে বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বিচার বিভাগের জন্য উন্নয়নখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নয়নখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৩.২ বাজেটের খাতের পরিবর্তন

জাতীয় বাজেটে কয়েকটি খাতভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। খাতগুলো হলো: (১) জনপ্রশাসন, (২) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, (৩) প্রতিরক্ষা, (৪) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, (৫) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, (৬) স্বাস্থ্য, (৮) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, (৯) গৃহায়ণ, (১০) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম, (১১) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, (১২) কৃষি, (১৩) শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, (১৪) পরিবহন ও যোগাযোগ। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ করা হয় জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে। রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গের একটি হওয়ায় বিচার বিভাগের জন্য পৃথক খাতভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন। বাজেটে 'বিচার' নামে পৃথক একটি খাত সৃজন করে বিচার বিভাগের জন্য বাজেট উক্ত খাতে বরাদ্দ করা প্রয়োজন। সংসদে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি উপস্থাপনের সময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী খাতভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। বিচার নামে পৃথক খাত সৃষ্টি করলে বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি আলাদাভাবে গুরুত্ব পাবে।

৩.৩ বাজেট প্রাক্কলনে বিচার বিভাগের প্রতিনিধি

২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ৩টি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত, যথা: (১) কৌশলগত পর্যায়; (২) প্রাক্কলন পর্যায়; এবং (৩) অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ের পূর্বেই কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিল Medium Term Microeconomic Framework (MTMF) হালনাগাদ করে। উক্ত মাইক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের ডাটা ব্যবহার করে Budget Monitoring and Resource Committee (BMRC) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্ব ও প্রাপ্তির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা (Preliminary Revenue and Receipt Target), প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure Ceiling) এবং সম্ভাব্য বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে। কৌশলগত পর্যায়ের শুরুতেই অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'বাজেট পরিপত্র-১' জারি করা হয়। সাধারণত ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাসে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের জন্য এ পরিপত্র জারি করা হয়ে থাকে। বাজেট পরিপত্র-১ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে রাজস্ব ও প্রাপ্তির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বাজেট পরিপত্র-১ জারি হওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যমান বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করতে হয়।

সুপারিশ

(১) বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ১ (এক) শতাংশে অবিলম্বে উন্নীত করতে হবে এবং প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করতে হবে।
(২) বাজেটে 'বিচার' নামে পৃথক খাত সৃষ্টি করতে হবে।
(৩) বাজেট মনিটরিং ও রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে বিচার বিভাগের প্রতিনিধি যুক্ত করতে হবে।

৪. জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশনের স্থায়ী কাঠামো কার্যকর করা

২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারি এসআরও ৮-আইন/২০০৭ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালার ৩(১) বিধিতে উল্লেখ রয়েছে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের

সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন নামে একটি কমিশন থাকবে। বিধি ৪(১) অনুযায়ী, পে-কমিশনের সভা প্রতি পঞ্জিকা বছরে অন্তত দুই বার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ৪(৩) বিধিতে উল্লেখ রয়েছে, পে-কমিশন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সার্ভিসের বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা সরকারের নিকট পেশ করবে। তবে সরকার অনরোধ করলে বা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য কেনো নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হলে পে-কমিশন যে কেনো সময়ে যে কোনো বিষয়ে সরকারের বরাবরে অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ পেশ করতে পারবে। বিধি ৪(৭) অনুযায়ী, পে-কমিশনের প্রদত্ত সুপারিশ সরকার যথাসম্ভব অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধিগুলো পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং নিয়মিতভাবে এ কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

তবে বর্তমানে জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনের চেয়ারম্যান পদে কেউ নিযুক্ত নেই। ফলে উক্ত কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত নেই। জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনের স্থায়ী কাঠামোকে কার্যকর করতে হবে।

সুপারিশ

(১) জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনের স্থায়ী কাঠামোকে কার্যকর করতে হবে।

(২) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সার্ভিসের বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা সরকারের নিকট পেশ করার বিধান কার্যকর করতে হবে।

৪.১ বিচারকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

৪.১.১ বেতন কাঠামো

২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারির গেজেটের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশন গঠিত হয়। ২০০৯ সালের ২ জুন এই কমিশন সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। ২০০৯ সালের ২ ডিসেম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেলে সেই সুপারিশের প্রতিফলন দেখা যায়নি। ২০০৫ সালের বেতনস্কেলের ক্রম অনুসরণ করে বিচারকগণের জন্য ২০০৯ সালের বেতনস্কেল নির্ধারণ করা হয়। ২০০৫ সালের বেতনস্কেলের ৩ নম্বর ধাপকে বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯ সালের জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেলের প্রথম ধাপ করা হয় ২৯০০০ - ১১০০ × ৬ - ৩৫৬০০। জেলা জজের মূল বেতন নির্ধারণ করা হয় ২৯,০০০ টাকা। অন্যদিকে জাতীয় বেতনস্কেল (সরকারি-বেসামরিক), ২০০৯ অনুযায়ী সচিবদের মূল বেতন রাখা হয় ৪০,০০০ টাকা। এই বেতনস্কেলের তৃতীয় ধাপের মূল বেতন ২৯,০০০ টাকা। অন্যদিকে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ অর্থাৎ সহকারি জজগণের বেসিক জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশন ১৬,৫০০ টাকা প্রস্তাব করা হলেও ২০০৯ সালের বেতনস্কেলে তা ১১,০০০ টাকা রাখা হয়। তবে ২০০৯ সালের এই বেতনকাঠামো আপীল বিভাগ গ্রহণ করেননি।

সিভিল আপিল ৭৯/১৯৯৯ এর সঙ্গে কনটেম্পট পিটিশন ০৭/২০০৪ অর্থাৎ মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশনা বাস্তবায়ন শুনানিতে সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভা-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের পদবিন্যাস ও বেতন-ভাতার প্রস্তাব দাখিল করা হয়। তাতে সিলেকশন গ্রেডের জেলা ও দায়রা জজগণের জন্য বেতনস্কেল ৪০,০০০ টাকা (নির্ধারিত) প্রস্তাব করা হয়। জেলা ও দায়রা জজগণের জন্য বেতন স্কেল ৩৬০০০ - ৩৯৬০০ (১২০০ × ৩) প্রস্তাব করা হয়। সহকারি জজগণের জন্য বেতনস্কেল ১৬০০-২৫৬০০ (৬০০ × ১৬) প্রস্তাব করা হয়। আপীল বিভাগ ১৪ত মার্চ ২০১৩ তারিখের আদেশে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কিছু সংশোধন সাপেক্ষে সাময়িক সময়ের জন্য সরকারের প্রস্তাব মেনে নেন। আপীল বিভাগ আদেশে উল্লেখ করেন:

> The Main reason shown by the Government for modification of the recommendations of the Commission was that "Due to the financial constraints of the Government, the said recommendations could not be fully implemented." This Division considering the submissions made by the learned Attorney General and Mr. M. Amirul-Ul Islam, learned Counsel, for the respondents and the pros and cons of the matter particularly the financial involvement of the Government allowed the application for modification in part for the time being ...

আপীল বিভাগ সিলেকশন গ্রেডের পরিবর্তে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তা পাঁচ বৎসর চাকরির অভিজ্ঞতা যুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে আপীল বিভাগের এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ২ জুন ২০১৩ তারিখে ২০০৯ সালের বেতনস্কেল সংশোধনের গেজেট প্রকাশ করা হয় (এসআরও ১৩৬-আইন/ ২০১৩/ ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০২.১৩-১২৬)। সংশোধিত বেতনস্কেলে জেলা জজগণের ১ নং গ্রেডের স্কেল নির্ধারণ করা হয় ৩৬০০০-১২০০×৩ -৩৯৬০০। অন্যদিকে ২০১২ সালে সিনিয়র সচিব নামের নতুন একটি পদের সৃজন করা হয়। এর ফলে জেলা ও দায়রা জজগণ বেতনস্কেল প্রাপ্তির দিক থেকে জাতীয় বেতনস্কেলের তুলনায় ২ ধাপ নিচেই থেকে যান।

আপীল বিভাগ রাষ্ট্রের আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সাময়িকভাবে সংশোধিত প্রস্তাবনা মেনে নিলেও পরবর্তীতে এটিই নজির হয়ে যায়। ২০১৬ সালের বেতনস্কেলে জেলা ও দায়রা জজগণের জন্য বেতনস্কেল ঠিক করা হয় ৭০৯২৫-৭৩৫৯০-৭৬৩৫০। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজগণের বেতনস্কেল ৭৮,০০০ টাকা (নির্ধারিত) করা হয়। অন্যদিকে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী সচিবগণের জন্য মূলর বেতন নির্ধারণ করা হয় ৭৮,০০০ টাকা। সিনিয়র সচিবগণের জন্য বেসিক বেতন ৮২,০০০ টাকা এবং মুখ্যসচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের জন্য বেসিক বেতন ৮৬,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। নতুন বেতন কাঠামোতেও জেলা জজদের ২ ধাপ নিচে রাখা হয়।

সুপারিশ

(১) সিনিয়র জেলা জজদের বেতন সিনিয়র সচিবের সমান করতে হবে। জেলা জজদের বেতন-স্কেল জাতীয় গ্রেডের ১ নম্বর গ্রেডে সচিবদের সমান করতে হবে।
(২) অন্যান্য ধাপের বিচারকদের বেতন-স্কেল জাতীয় গ্রেডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১.২ জুডিসিয়াল ভাতা

২০০৭ সালের বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশন বিচারকগণকে শতভাগ জুডিসিয়াল ভাতা প্রদানের সুপারিশ করে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন-ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর মাধ্যমে মূল বেতনের শতকরা ৩০ ভাগ হারে 'বিশেষ ভাতা' প্রদানের বিধান করা হয়। আপীল বিভাগ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করলে ০১.০১.২০১২ তারিখে এসআরও জারির মাধ্যমে বিশেষ ভাতা ৫০% করা হয়। এটি ০১.০৭.২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। (এসআরও ৩৭০-আইন/২০১২, ১ নভেম্বর, ২০১২) কিন্তু পরবর্তীতে ১৪.০৩.২০১৩ তারিখে আপীল বিভাগে মন্ত্রিসভা-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের পদবিন্যাস ও বেতন-ভাতার যে প্রস্তাব দাখিল করা হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, "জুডিশিয়াল ভাতার পরিবর্তে ২০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা দেওয়া হইবে।" আপীল বিভাগ আদেশে জুডিসিয়াল ভাতা ৩০ শতাংশ করতে নির্দেশ দেয়। আপীল বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ৩০% জুডিসিয়াল ভাতাও শেষ পর্যন্ত টিকেনি। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর ২২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ প্রতিমাসে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত ভাতার সমপরিমাণ (প্রাপ্য অংকে) টাকা (মূল বেতনের শতাংশ হিসাবে নয়) জুডিসিয়াল ভাতা (বিশেষ ভাতা) প্রাপ্য হবেন। এভাবে জুডিসিয়াল

ভাতা নির্ধারণের বিষয়টি আপীল বিভাগের আদেশের পরিপন্থী। সে সময় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বিচারিক ভাতার পরিমাণ ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান বিবেচনায় উক্ত ভাতার পরিমাণ বেতন-স্কেলের ৫০ শতাংশ হওয়া উচিত।

সুপারিশ

জুডিসিয়াল ভাতা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর বেতন-স্কেলের ৫০ শতাংশ করতে হবে।

৪.১.৩ ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স/কুক ও সিকিউরিটি এলাউন্স

আপীল বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২ জুন ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন-ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর সংশোধনী এনে ২৩খ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রতিমাসে ১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা হারে ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদানের বিধান করা হয়। এই বিধান অনুযায়ী সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজগণ ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬- তে ডোমেস্টিক এইড এলাউন্সের বিধান বাদ দেওয়া হয়। অথচ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর ২৬ অনুচ্ছেদে প্রাধিকারভূক্ত সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স মাসিক ৩০০০ টাকা রাখা হয়। বর্তমানে সচিবগণ কুক ও সিকিউরিটি এলাউন্স বাবদ প্রতি মাসে ৩২,০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। অথচ, বিচার বিভাগের সদস্যগণ এ ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সুপারিশ

(১) জেলা জজগণকে কুক ও সিকিউরিটি এলাউন্স প্রদান করতে হবে।
(২) অতিরিক্ত জেলা জজগণকে ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করতে হবে।

৪.১.৪ অন্যান্য সুবিধাদি

জেলা জজগণের প্রাপ্য সুবিধাদি সরকারের সচিব পদে কর্মরত কর্মকর্তার সমান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অন্যান্য পর্যায়ের বিচারকগণকে সমানুপাতিক হারে সুবিধা প্রদান করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এ নিম্নোক্তভাবে নতুন অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা যেতে পারে:

> জেলা জজগণের প্রাপ্য সুবিধাদি সরকারের সচিব পদে কম্রত কোনো কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান বা উক্ত ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমরূপ কোনো বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সুপারিশ

জেলা জজগণের প্রাপ্য সুবিধাদি সরকারের সচিব পদে কর্মরত কর্মকর্তার সমান নির্ধারণ করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. ভূমিকা

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেবাকে মানুষের জন্য সহজতর করে দিয়েছে। বিচারিক সেবা সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন দেশ বিচারিক প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বেশ আগে থেকেই শুরু করেছে। ই-ফাইলিং, ভার্চুয়াল কোর্ট, অনলাইন শুনানি, এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক, স্বচ্ছ এবং কার্যকরী করার উদ্যোগ পৃথিবীব্যাপী চলছে। বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থায়ও সীমিত আকারে কিছু তথ্য প্রযুক্তি সেবা চালু করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির সময় জরুরি ভিত্তিতে ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম চালু, ই-কজলিস্ট এবং অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারির সময় বাংলাদেশে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে ২ লাখ মামলা নিষ্পত্তি হয়, যা প্রযুক্তির সম্ভাবনার একটি অনন্য উদাহরণ। বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলা নিষ্পত্তির সময়কালকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব। বিচারের বিভিন্ন স্তর, তথা, মামলা দায়ের, সমন জারি, হাজিরা, সাক্ষ্যগ্রহণ, রায়-ডিক্রি, আদেশ ইত্যাদির নকল সংগ্রহ সকল ক্ষেত্রে মানুষের দুর্ভোগ বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

তথ্য প্রযুক্তি বিচার বিভাগের জন্য অনেক সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিচার বিভাগ তথ্য প্রযুক্তিকে এখন পর্যন্ত তেমন কাজে লাগাতে পারেনি। বিচার বিভাগ ডিজিটালাইজড করার জন্য ই-জুডিসিয়ারি (e-judiciary) প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকল্পটি এখনো দৃশ্যমান হয়নি। এ কারণে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ আধুনিক বিচার ব্যবস্থা ও সফল বাস্তবায়নের পথে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাব, মানবসম্পদের দক্ষতার ঘাটতি এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বে সফলভাবে পরীক্ষিত প্রযুক্তি বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থাতে ক্রম-অঙ্গীভূতকরণ (Integration)-এর জন্য বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে যেভাবে সময়ের অপচয় ও কালক্ষেপণ হচ্ছে

বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিচারিক প্রক্রিয়ায় বহু ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় হয়, আদালতের গুরুত্বপূর্ণ বহু কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় এবং বিচারপ্রার্থী মানুষও অহেতুক হয়রানির শিকার হয়। সময়ের অপচয় ও কর্মঘণ্টা নষ্টের কিছু দিক নিম্নরূপ:

- পক্ষদের নাম, মামলার ঘটনা ইত্যাদি বিষয়াদি মামলার নথিতে একবার বর্ণিত থাকলেও মামলার বিভিন্ন দৈনন্দিন আদেশে একই নাম, ঘটনা বা বিষয়গুলো বারংবার লিখতে হয় এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে রেজিস্টারেও এন্ট্রি দিতে হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এভাবে বারবার সময়ের অপচয় ঘটছে।

- সাক্ষ্যগ্রহণকালে বিচারক স্বহস্তে সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করেন, এতে সাক্ষী ও নিযুক্তীয় আইনজীবীকে বিচারকের লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এতে দেখা যায় জেরা, জবানবন্দি ইত্যাদিতে প্রায় দেড়গুণ বেশি সময় লাগে। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আসামীকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষার সময় রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীদের জবানবন্দির মূল বক্তব্য পড়ে শুনানোর পাশাপাশি নির্ধারিত ফরমে টাইপ করতে হয়। রায়ে সেই সাক্ষ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্বৃত করা হয়। সর্বশেষে পক্ষগণকে সরবরাহ করার জন্য সাক্ষ্যের অনুলিপি প্রস্তুত করতে হয়। অর্থাৎ একই কাজ বারংবার করার কারণে একদিকে কর্মঘণ্টার অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে।
- ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মামলার রেকর্ড সংরক্ষণের কারণে অনেক সময় নথি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় বা হারিয়ে যায়। বিশেষ করে, অনির্ধারিত তারিখে দাখিলকৃত জরুরি দরখাস্ত শুনানির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মামলার নথি প্রয়োজন হলেও ব্যস্ত আদালতগুলোর হাজার হাজার মামলার মধ্য থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নথি খুঁজে বের করা ভীষণ কষ্টসাধ্য।
- মামলার নথিতে আদেশ লেখার পরেও সহায়ক কর্মচারিদেরকে আদালতের কজলিস্ট, ডায়েরি, রেজিস্টার, ফরম ও নির্ধারিত তালিকায় আবশ্যিকভাবে একই তথ্য পুনরায় লিখতে হয়। এতে কর্মঘণ্টা যেমন নষ্ট হয়, তেমনি ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আদালতের অসাধু কর্মচারিগণ নানা রকম অনৈতিক সুবিধা নেয়ার সুযোগ পায়।উচ্চ আদালত থেকে অধস্তন আদালতের নথি তলবের ক্ষেত্রে বিলম্ব একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের আদেশ পৌঁছাতে বিলম্বের পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতির উপর নির্ভর করে নথি প্রস্তুতের কারণে সময়ক্ষেপণ হয়।
- মামলার প্রয়োজনে আদালত রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাগজপত্র, নথি ইত্যাদি তলবের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু অনেক সময় আদালতের আদেশ সময়মত পৌঁছায় না, বা পৌঁছালেও কোন্ সময়ে পৌঁছায় তার কোনো রেকর্ড থাকে না। পুরো বিষয়টি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হওয়ার কারণে তলবকৃত নথি সঠিক সময়ে আদালতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে।
- মামলার তথ্য জানার বিষয়ে নাগরিকের জন্য আদালত বা আইনজীবী ব্যতীত অন্য কোনো উৎস না থাকায় মামলার পরবর্তী ধার্য তারিখ কবে বা উক্ত তারিখ কিসের জন্য নির্ধারিত সে বিষয়ে পক্ষগণের তথ্যে নানাবিধ ঘাটতি থাকে। ফলে, পক্ষগণ সঠিক সময়ে আদালতে উপস্থিত হতে পারেন না। তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতিজনিত কারণে আদালতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে নাগরিকদের মনে নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি হয়।
- রাষ্ট্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি ডিজিটাল অবকাঠামো, যেমন জাতীয় পরিচয় পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ভূমি উন্নয়ন কর, সিডিএমএস, ইত্যাদি বিচারিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ডকুমেন্ট যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে।

১.৩ বিচার প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ইতিবাচক ফলাফল

মামলার জটিল প্রক্রিয়াগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করার সুযোগ রয়েছে। এতে মামলার নিষ্পত্তি দ্রুত হবে এবং বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি কমবে। আদালতের কার্যক্রমে ত্রুটি কমবে, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার তথ্য সহজলভ্য হওয়ার মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়া আরো দক্ষ হবে। সর্বোপরি, মামলার জট কমিয়ে আদালতকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সময়োপযোগী করার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যাবে এবং জনগণের মধ্যে বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে আস্থা বাড়বে।

ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থাকে কাগজহীন (Paperless) বিচার বিভাগে উন্নীত করা সম্ভব। বর্তমানে বিচারিক কার্যক্রমে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি বছর আদালতে প্রায় ১৬ লক্ষ সাক্ষীর জন্য গড়ে ৩২ লক্ষ পাতা, ১৩ লক্ষ নতুন মামলার জন্য গড়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাতা, এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য ৩২ কোটি ৪৮ লক্ষ পাতা ব্যবহার করা হয়। সব মিলিয়ে, বছরে মোট কাগজের চাহিদা দাঁড়ায় ৩৪ কোটি ১০ লক্ষ পাতা, যার খরচ প্রায় ১০২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আদালতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করা হলে এই কাগজের ব্যবহার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা সম্ভব, ফলে বছরে প্রায় ৭০ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

বছরে লক্ষাধিক মামলার বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট অনেককে আদালতে ভ্রমণ করতে হয়, যা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মামলার প্রত্যেক ধার্য তারিখে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয় না। কারণ অধিকাংশ আদালত জেলা শহরে অবস্থিত হওয়ায় মামলার পক্ষগুলোকে উপজেলার দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে ভ্রমণ করে আদালতে উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু ভার্চুয়াল শুনানি, ডিজিটাল রেকর্ড অ্যাক্সেস (Digital Record Access) এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভ্রমণের প্রয়োজন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব, ফলে জনগণের অর্থ এবং সময় সাশ্রয় হবে এবং বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

মামলার হালনাগাদ তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে অযথা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। আদালতের তথ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য প্রদান মানুষের বহু রকমের দুর্ভোগ লাঘব করবে। সঠিক এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলন করলে, বিচারপ্রার্থীরা দ্রুত এবং সঠিকভাবে মামলার অগ্রগতি/গতি-প্রকৃতি জানতে পারবেন, ফলে তাদের মধ্যে মানসিক চাপ কমবে। ডিজিটালাইজেশন এবং স্বয়ংক্রিয় তথ্য হালনাগাদ করার মাধ্যমে মামলার তথ্য সহজে প্রবাহিত হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে বিচারপ্রার্থীদের জন্য একটি সাশ্রয়ী এবং শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া উপভোগ করতে সহায়ক হবে।

১.৪ বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার: গৃহীত উদ্যোগ ও অগ্রগতি

বাংলাদেশের বিচার বিভাগে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত এক দশকে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যদিও এতে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা এখনও অর্জিত হয়নি। স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বিচারিক তথ্যে জনসাধারণের অভিগম্যতা সহজতর করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের দৈনন্দিন মামলার তালিকা (কজ লিস্ট) এবং রায় ও আদেশ (সকল রায় ও আদেশ নয়) প্রদর্শিত হয়। বিচার বিভাগের ডিজিটালাইজেশনের স্বার্থে ঢাকা জেলায় কেন্দ্রীয় ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়, যা প্রকল্পের মেয়াদ শেষে চালু রাখা হয় নি। পরবর্তীতে ঢাকা সহ ২ টি জেলায় কজলিস্ট ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলেও তার কার্যক্রম স্থায়ীভাবে চালু রাখা হয় নি।

২০১৭ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন এটুআই (a2i) প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে অধস্তন আদালতের মামলার কজলিস্ট সফটওয়্যার (causelist.judiciary.gov.bd) প্রস্তুত করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেশের সকল আদালত অনলাইনে বিচারিক আদালতের মামলার তথ্য আপলোড করার কার্যক্রম শুরু করে এবং বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য তা অনলাইনে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ২০১৮ সালের পর উক্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে সরকারের এটুআই (a2i) প্রোগ্রামের কারিগরী সহযোগীতায় পুনরায় ২০২১ সালে অধস্তন আদালতের কার্যতালিকা প্রদর্শনের জন্য ৬৪ জেলার সকল আদালতে e-causelist সেবা (causelist.judiciary.gov.bd)-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। কিন্তু নিয়মিত

লোকবলের অভাবে এবং সুনির্দিষ্ট তদারকি কর্তৃপক্ষের অভাবে উক্ত কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। এটুআই (a2i) প্রোগ্রামের কারিগরী সহয়তায় অধস্তন আদালতের কার্যক্রম মনিটরিং ও ট্রেকিং এর জন্য জুডিসিয়াল ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করা হলেও তা বর্তমানে কার্যকর নয়। এছাড়া অধস্তন আদালতের জন্য আলাদা ওয়েবসাইট (judiciary.gov.bd) চালু রয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে উক্ত কার্যক্রমগুলো কঙ্ক্ষিত ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের ব্রিজিং প্রকল্প হিসেবে শুরু করলেও ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সরাসরি তত্ত্বাবধানের অভাবের কারণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় নি।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ২০২২ সালে অধস্তন আদালতের রায় ও আদেশের তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল (decision.bdcourts.gov.bd) তৈরি করেছে, যেখানে বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ (এগারো হাজার) রায় ও আদেশ আপলোড করা রয়েছে। অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য "সুপ্রীম কোর্ট মনিটরিং কমিটি ফর সাবঅর্ডিনেট কোর্টস"-এর অধীনে একটি অনলাইন মনিটরিং টুল (mcsc.supremecourt.gov.bd) প্রস্তুত করা হয়, যার মাধ্যমে অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও বিচারকদের জন্য একটি অনলাইন প্লাটফর্ম (faq.bdcourts.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বিচারকগণ আইন ও বিচার সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনায় অংশ নেবেন এবং এর মাধ্যমে একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার (Knowledge Base) তৈরি হবে, যা বিচার-সংক্রান্ত কাজে বিচারকগণের বিভ্রান্তি কমাবে। এই প্লাটফর্মটি উদ্বোধন করা হলেও এখন পর্যন্ত চালু হয়নি।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট একটি আধুনিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পটি পরিকল্পনা করে। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট জেলায় সীমিত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয় এবং এর দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত ছিল। পরবর্তীতে এই দায়িত্ব আইন ও বিচার বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একাধিকবার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) প্রস্তুত করা হয়। প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে মোট ৫টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা, ৩টি প্রস্তুতিমূলক সভা, ২টি মন্ত্রী পর্যায়ের সভা এবং একাধিকবার কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, নিয়মিত বাজেট ও প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করলেও প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তি যুক্ত করা, মামলার প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য স্বচ্ছতা ও সময় সাশ্রয় নিশ্চিত করা। প্রকল্পের অনুমোদন না হওয়ার কারণে এর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়নি, ফলে দেশের নাগরিকগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২. বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ

২.১ আইনি সংস্কার

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিচার বিভাগ রূপান্তরে ডাটাবেজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, ডিজিটাল রেকর্ড, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর, ভার্চুয়াল তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ, শুনানি গ্রহণ, রায় প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬, আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ প্রণীত হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে কোর্ট ফি গ্রহণের জন্য The Court-Fees Act, 1870 এবং ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক সাক্ষ্যকে মূল্যায়নের জন্য The Evidence Act, 1872 সংশোধিত হয়েছে।

বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সাথে ই-জুডিসিয়ারি, ই-সমন/পরোয়ানা ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী ডাটাবেজ প্রস্তুত, ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য বিশেষভাবে নিম্নরূপ আইনের সংশোধনীর প্রয়োজন।

১. **The Code of Civil Procedure, 1908:** ই-ফাইলিং কার্যকর করতে Order IV (Institution of suits), সমন জারির ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মেইল সার্ভিস (ই-মেইল) যুক্ত করার জন্য Order V (Issue and Service of summons) এবং বিচারকালে সাক্ষ্য রেকর্ডের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহারের জন্য Order XVIII (Hearing of the suit and examination of witnesses) এর সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

২. **The Code of Criminal Procedure, 1898:** অনলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ (ই-কমপ্লেইন) দায়েরের জন্য Section 200, তদন্তকালে সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড সংক্রান্ত Section 161 ও আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহণ সংক্রান্ত Section 164 এবং সাক্ষ্য রেকর্ডের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহারের জন্য Chapter XXV (Of the Mode of Taking and Recording Evidence in Inquiries and Trials) এর Section 356 এর সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

৩. **The Civil Rules and Orders:** দেওয়ানি আদালতে ই-কজলিস্ট, কেইস ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল রেকর্ড রুম, ই-সার্টিফাইড কপি সংক্রান্ত সফটওয়্যার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি সংযোজন প্রয়োজন।

৪. **The Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009:** ফৌজদারি ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ই-কজলিস্ট, কেইস ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল রেকর্ড রুম, ই-সার্টিফাইড কপি সংক্রান্ত সফটওয়্যার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি সংযোজন প্রয়োজন।

২.২ সুপারিশ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের রূপরেখা

জনগণের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার (Access to Justice) ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে নিশ্চিত করতে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি একটি শক্তিশালী পরীক্ষিত হাতিয়ার। বিচার, মামলা ব্যবস্থাপনা ও বিচার প্রশাসন পরিচালনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। এছাড়া ক্রম পরিবর্তনশীল তথ্য-প্রযুক্তির সাথে বিদ্যমান ব্যবস্থার সময়োপযোগীকরণ (Update), রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) ও বর্ধিতকরণ (Enhancement) করাও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উপরে আলোচিত তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, ক্রমান্বয়ে অভিযোজন (Gradual Adaption), পরীক্ষামূলকভাবে উপনীত সমাধান (Trial & Error) ভিত্তিতে পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদে তিন পর্যায়ে বাস্তবায়নের রূপরেখা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

প্রথম পর্যায়: (Development Phase)

বাস্তবায়ন কাল: ১-৫ বছর

বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য বিচার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের তথ্য প্রযুক্তির সেবার সাথে পরিচিতি ঘটনো এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহারে আগ্রহী করাই প্রথম পর্যায়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আদালতে স্থায়ী সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার সংক্রান্ত অবকাঠামো প্রস্তুত, আইন ও বিধি সংশোধন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের মাধ্যমে নিম্নরূপে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে।

ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প
ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যক্রমকে পরিকল্পনা অনুসারে যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্পের অধীন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: • জেআরপি (জুডিসিয়াল এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং) সফটওয়্যার,

- ভার্চুয়াল কোর্ট, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ই-স্বাক্ষর
- ৬৪ টি জেলায় ই-কোর্ট রুম
- ই-ফাইলিং, ই-পেমেন্ট, ই-নথি
- ডিজিটাল রেকর্ডরুম ও ডিজিটাল অনুলিপি বিভাগ
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার ও সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব মাইক্রো ডাটা সেন্টার
- সেন্ট্রাল জেল টার্মিনাল
- সকল জেলা বারে ই-ক্যাফে

ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের মাধ্যমে বিচার বিভাগের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের স্থায়ী ভিত রচিত হবে। তবে প্রযুক্তির ক্রম পরিবর্তনশীল ধরন বিবেচনায় নিয়ে যে সকল জরুরি ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প প্রস্তাব বহির্ভূত রয়েছে তার জন্য ছোট আকারের প্রকল্প প্রস্তুত করে আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্পে ব্যবহৃত সামগ্রী/ হার্ডওয়্যার সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের বিপরীতে TO&E ভুক্ত করতে হবে। অন্যথায় প্রকল্প শেষে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পরবে। ই-জুডিসিয়ারি চলাকালীন সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং রাজস্ব খাতে স্থায়ী দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।

জুডিসিয়াল এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং: ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট

ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের জেআরপি (জুডিসিয়াল এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) সফটওয়্যার এর আওতায় যথাসম্ভব ই-কেইস ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম প্রস্তুত করতে হবে। ই-কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সিস্টেম হবে যার মাধ্যমে বিচার কর্মের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। মূলত ধাপে ধাপে প্রস্তুতকৃত একাধিক মডিউলের সমন্বয়ে ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি প্রস্তুত করতে হবে। মডিউলগুলো পরস্পর সংযুক্ত (Interconnected) এবং আদানপ্রদানে (Interoperable) পারদর্শী হবে। তাছাড়া এই সিস্টেম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সিস্টেম হতে API -এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রাথমিক পর্যায়ে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের আওতায় যে সকল প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা যাবে তা নিম্নরূপ:

- ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ই-ফাইলিং মডিউলের এর মাধ্যমে দেওয়ানি মামলা এবং ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা যাবে। মডিউলের মধ্যে কোর্ট-ফি ক্যালকুলেটরও যুক্ত থাকবে, যা দায়ের হওয়া মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করে কোর্ট ফি কত হবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করে দিতে পারবে। ই-ফাইলিংয়ের জন্য নাগরিকদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত থাকবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল যাচাইয়ের মাধ্যমে এটি কার্য সম্পাদন করবে।
- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলার নিয়মিত বিচারিক কার্যাবলি ই-নথি ব্যবস্থারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। ই-নথিতে আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন অনুসারে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ই-স্বাক্ষরের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- সকল আদালতে ই-কজলিস্ট বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ই-কজলিস্টের মাধ্যমেই আদালতের কজলিস্ট ও ডাইরি প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে হবে এবং মামলার আদেশের সংক্ষিপ্তসার আপলোড করতে হবে। ই-কজলিস্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে। একইসাথে আদালতের রেজিস্টারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে।
- মামলা সম্পর্কে বিশদ তথ্যের জন্য আদালত চত্বরে সকলের জন্য উন্মুক্ত কেস ট্র্যাকার মডিউল এবং মামলার পক্ষরা যাতে মামলার বিশদ তথ্য জানতে পারে তার জন্য শুধুমাত্র আদালত চত্বরের

ওয়াইফাই-এর মাধ্যমে কোর্ট এরিয়া নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, মামলার সকল তথ্য অনলাইনে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া ডাটা নিরাপত্তায় একটি ঝুঁকি হিসেবে গণ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে, কোন মামলা বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য অনলাইনে রেখে মামলার বিশদ তথ্য কোর্ট এরিয়া নেটওয়ার্কে রাখা যেতে পারে অর্থাৎ, মামলার দরখাস্ত, আর্জি, সাক্ষ্য সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য শুধুমাত্র আদালতের এলাকায় থাকা সুনির্দিষ্ট এবং নিরাপদ ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হলেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই প্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে এবং বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি কমাবে।

- ভার্চুয়াল কোর্ট মডিউল একটি অত্যাধুনিক সিস্টেম হবে, যা সাক্ষী ম্যানেজমেন্ট মডিউলের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে সাক্ষীকে ভার্চুয়ালি সাক্ষ্য দিতে বা শুনানির জন্য ভার্চুয়ালি উপস্থিত হতে সাহায্য করা যাবে। এর মাধ্যমে আদালতে সশরীরে উপস্থিত না হওয়া ব্যক্তিদের জন্য বিচার প্রক্রিয়া আরো সুষ্ঠু ও সময়সাশ্রয়ী হতে পারে। এর মাধ্যমে শুনানি বা সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিরা নিজস্ব স্থান থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারবেন। এক্ষেত্রে Zoom বা অন্য কোনও তৃতীয়পক্ষের ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারের পরিবর্তে, বিচার বিভাগের নিজস্ব ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, যা যথাযথ নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার সাথে কার্যকরীভাবে অল্প খরচে পরিচালিত হবে। ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আদালতের খরচ এবং প্রযুক্তিগত ঝামেলা কমবে, পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত হবে যা সকল পক্ষের জন্য সুবিধাজনক হবে। ভার্চুয়াল সাক্ষীর ক্ষেত্রে একটি সমালোচনা থাকে যে, উক্ত সাক্ষীকে কেউ সামনে থেকে শিখিয়ে দিচ্ছে কিনা বা কেউ সামনে থেকে হুমকি প্রদর্শন করছে কিনা। এই সমস্যা উত্তরণের জন্য পর্যায়ক্রমে ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেমের সাথে VR এবং AR-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোগ করা যেতে পারে।
- সাক্ষী ব্যবস্থাপনা, সরকারি সাক্ষী ক্যালেন্ডার এবং জাতীয় সাক্ষী ডাটাবেস তৈরি করতে হবে।
- মামলার পক্ষ ও সাক্ষীদের পরিচয় যাচাইকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে এনআইডি নম্বর, জন্ম সনদ ইত্যাদির মাধ্যমে। সেই সাথে ফৌজদারি মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রোফাইলিং-এর জন্য পৃথক মডিউল থাকতে পারে, যা আসামীদের প্রবেশন প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
- বিচারক, আইনজীবী, অ্যাডভোকেট কমিশনার, সরকারি কৌঁসুলি (জিপি), পাবলিক প্রকিউটর (পিপি), কোর্ট স্টাফ ও মামলার পক্ষদের জন্য বিশেষায়িত পোর্টাল থাকতে হবে। কার্যভেদে প্রতিটি পোর্টালের জন্য পৃথক মোবাইল ও ডেস্কটপ এপ্লিকেশন প্রস্তুত করা যেতে পারে কিংবা একই মোবাইল এপ্লিকেশনে কাজের ধরন আনুযায়ী আলাদা আলাদা একসেস লেয়ার সৃষ্টি করতে হবে।
- বিচারকের পোর্টালে তার অধিক্ষেত্র অনুসারে রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রেরিত মামলা সংক্রান্ত তথ্য থাকবে। সেই সাথে এতে একটি জাজমেন্ট রাইটিং মডিউলও যুক্ত করা যেতে পারে।
- দেওয়ানি আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সুবিধার্থে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) প্রযুক্তি, ল্যান্ড এন্ড নিকাহ রেজিস্ট্রেশন এন্ড আদার ইনফরমেশন মডিউল, ফ্যামিলি এন্ড সিভিল এক্সিকিউশন কেস ম্যানেজমেন্ট মডিউল ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে।
- ফৌজদারি আদালতের জন্য বেইল বন্ড ম্যানেজমেন্ট মডিউল, ওয়ারেন্ট ম্যানেজমেন্ট মডিউল ইনভেস্টিগেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল, ক্রিমিনাল কেস চার্জ মডিউল ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে।

জুডিসিয়াল এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং: ই-কোর্ট ম্যানেজমেন্ট

আদালতের বিচারিক কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের জন্য জুডিসিয়াল এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং সফটওয়ারের মাধ্যমে অংশ হিসেবে ই-কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই অংশে আদালতের বিচারিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেমন অনুলিপি বিভাগ, মহাফেজ খানা, নেজারত বিভাগ, মালখানা, প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর, হাজতখানা ইত্যাদি একটি সমন্বিত ডিজিটাল

সিস্টেমের আওতায় চলে আসবে। এছাড়াও বিচারকদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলি, আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, হাজিরা ইত্যাদি, আদালতের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও স্টেশনারির হিসাব রক্ষণ, ক্রয়, বিদ্যুৎ ও পানি বিল প্রদান এবং অন্যান্য বাজেট সংক্রান্ত কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং কার্যকর উপায়ে পরিচালিত হবে। এছাড়া, আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও তার ডিজিটাল মনিটরিং এই সিস্টেমের অংশ হতে পারে। আদালতের বিভিন্ন ব্যয়ের হিসাব রাখতে এবং সেটি নিরীক্ষণ করতে এই সিস্টেম বিশেষভাবে কার্যকর। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করবে না, বরং স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। ই-কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপ সহজ এবং সুসংগঠিত হবে। বাজেট ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত অ্যাক্সেস করা যাবে, এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হবে। একইসাথে, কর্মচারিদের কার্যক্রম ও আদালতের নিরাপত্তা পরিকল্পনাগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধান করা যাবে, যা দক্ষ প্রশাসনিক পরিবেশ তৈরি করবে। এই সিস্টেম আদালতের প্রশাসনিক কাজের চাপ কমাবে এবং বিচারক ও সহায়ক কর্মচারিদের বিচারিক কার্যক্রমে আরও বেশি মনোনিবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে-

- জুডিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এনালাইসিস পাবলিক পোর্টাল তৈরি করতে হবে।
- ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার এবং প্রত্যেক জেলায় মাইক্রো ডাটা সেন্টার স্থাপন করতে হবে।
- বিচারকদের বিচারিক কাজের মূল্যায়ন করার জন্য জুডিসিয়াল পারফর্মেন্স এনালাইসিস মডিউল থাকতে হবে, যা বিচারিক কাজের পরিমাণ ও গুনমান বিভিন্ন মানদণ্ড ও উচ্চ আদালতের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করবে।
- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে।
- সকল আদালত ও বিচারকের জন্য পৃথক অফিসিয়াল ইমেইল একাউন্ট প্রদান করতে হবে।
- আদালতের প্রশাসনিক কাজ এবং আদালতের বিভিন্ন শাখার কাজ সুব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তির সহায়তায় কোর্ট অ্যাডমিস্ট্রেশন ই-নথি সিস্টেম এবং কোর্ট অ্যাকাউন্টস, প্রসেস অ্যালোকেশন, মালখানা, হাজতখানা, অ্যাফিডেভিট, কোর্ট অ্যাসেট ও স্টেশনারি ম্যানেজমেন্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- ই-সার্টিফাইড কপি সিস্টেম চালু করতে হবে।
- ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম চালু করতে হবে।
- প্রস্তাবিত সকল সেবার উপকারভোগীর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি ই-সার্ভে পোর্টাল থাকতে পারে।

চলমান মামলার নথি ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত পৃথক প্রকল্প গ্রহণ

ইতিমধ্যে দায়েরকৃত এবং বিচারাধীন মামলার নথি বিভিন্ন মেয়াদে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে সকল চলমান মামলার তথ্য ই-কজলিস্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। আদালতে অর্থ পরিশোধের জন্য ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ই-পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও আদেশের অনুলিপি ই-সার্টিফাইড কপি সিস্টেমের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। সকল জেলার জেলা জজ ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রেকর্ডরুম ডিজিটালাইজেশনের জন্য অবকাঠামো ও জনবল নিয়োগ করতে হবে।

কমিটি, অফিস ও পদ

বিচার বিভাগের ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় গবেষণা, নিয়মিত তদারকি এবং সফল বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি, অফিস এবং পদ সৃজনের সুপারিশ করা হল:

- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রানালয়ের মন্ত্রীগণের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরামর্শক কমিটি/কেন্দ্রীয় ই-কমিটি (National Advisory Committee/Central E-Committee) গঠন করতে হবে। এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বিচার বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং সার্বিক তদারকি করবে। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য হতে পারেন:
    - মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
    - মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
    - মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়;
    - মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;
    - মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;
    - এ্যাটর্নি জেনারেল
    - সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ
    - রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
    - রেজিস্ট্রার (আইসিটি), বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন)।
- সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান করে একটি ই-জুডিসিয়ারি পলিসি/ ফ্রেমওয়ার্ক কমিটি (E-judiciary Policy/Framework Committee) গঠন করতে হবে। এই কমিটি বিচার বিভাগের সামগ্রিক ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সংক্রান্ত কারিগরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তদারকি এবং বাস্তবায়ন করবে। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য হতে পারেন:
    - হাইকোর্ট বিভাগের মনিটরিং কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতিগণ;
    - জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা জজগণের মধ্য হতে মনোনীত একজন জেলা জজ;
    - রেজিস্ট্রার (আইসিটি), বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন);
    - চিফ জুডিসিয়াল/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণের মধ্য হতে মনোনীত একজন ম্যাজিস্ট্রেট;
    - স্পেশাল অফিসার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
    - আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি;
    - বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের একজন প্রতিনিধি;
    - জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের একজন প্রতিনিধি;
    - আইন কমিশনের একজন প্রতিনিধি;
    - বার কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত বার কাউন্সিলের একজন সদস্য;
    - বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি;
    - সিস্টেম ম্যানেজার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
    - সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (হাইকোর্ট বিভাগ);
    - সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আপীল বিভাগ)।
- বিচার বিভাগ ডিজিটালাইজেশনকে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন রেজিস্ট্রার (আইসিটি), দুই জন অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ও চার জন সহকারি রেজিস্ট্রার সহ প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে আইসিটি বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। কারিগরি জনবলের ক্ষেত্রে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে।

- জজ-ইন-চার্জ (আইসিটি) পদ সৃজন করে দেশের সকল জেলায় জেলা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল/ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ একজন বিচারককে উক্ত পদের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। তার অধীনে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পে জেলা আদালতের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুসরণ পূর্বক রাজস্ব খাতে সমসংখ্যক পদ সৃজন করা যেতে পারে।
- বিচার বিভাগে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অটুট রাখার জন্য ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় প্রত্যেকটি জেলা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব খাতে নিয়মিত দক্ষ জনবল কাঠামো প্রস্তুত ও নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-জুডিসিয়ারী প্রকল্পে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোর সমসংখ্যক পদ সৃজনের পাশাপাশি প্রত্যেক আদালতের জন্য আবশ্যিকভাবে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর' পদ সৃজন করতে হবে।
- সকল জেলার জেলা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় আইনজীবী সমিতির সভাপতির সমন্বয়ে জেলা ই-কমিটি (District e-committee) গঠন করতে হবে। জাজ-ইন-চার্জ (আইসিটি) এই কমিটির সদস্য সচিব হবেন। কমিটি ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ই-জুডিসিয়ারি পলিসি/ফ্রেমওয়ার্ক কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।
- সকল নাগরিকের জন্য বিচার বিভাগের ডিজিটাল সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের জন্য সকল জেলায় জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ই-ডেস্ক/ ই-কর্নার স্থাপন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসে লোকাল গভর্নমেন্ট জুডিসিয়াল ই-ডেস্ক / ই-কর্নার স্থাপন করা যেতে পারে।
- সকল আইনজীবী সমিতির অফিসে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের মাধ্যমে ই-ক্যাফে স্থাপন করতে হবে।

অন্যান্য যেসব ক্ষেত্র ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের পরিকল্পনা বহির্ভূত

- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য ODR (Online Dispute Resolution) সফটওয়্যার চালু করতে হবে। অনলাইনে মীমাংসা সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে ই-জুডিসিয়ারী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। দেওয়ানি আদালত থেকে মধ্যস্থতার জন্য আদালতের সাথে ODR ব্যবস্থার আন্তঃসংযোগ (Interconnectivity) থাকবে যাতে বিচারক ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার অনলাইনেই মামলার তথ্য আদান-প্রদান (Interoperable) করতে পারেন।
- বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য জুডিসিয়াল ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকতে হবে।
- ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে উচ্চ আদালতের নজির, আইন বিষয়ক গবেষণাপত্র, প্রতিবেদন ও মতামত সংরক্ষিত থাকবে। এতে সকল বিচারক, আইনজীবী, আইন শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ই-লাইব্রেরি জাজমেন্ট রাইটিং মডিউলের সাথে সংযুক্ত থাকবে।
- বিচারকদের জন্য জাজমেন্ট রাইটিং সফটওয়্যার চালু করতে হবে। বিচারকের পোর্টালের সাথে যুক্ত এই মডিউলটি বিচারককে এই সকল তথ্য পাশাপাশি দেখাতে পারে, যাতে বিচারক সহজেই রায় লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নথি থেকে সহজেই রায়ে নিয়ে আসতে পারেন। এই মডিউল দেওয়ানি বিচারকের রায় লেখার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম কমাবে এবং বিচারকের মেধা ও শ্রম বিচার্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও এই মডিউলে ই-লাইব্রেরির রিসোর্সগুলোও যুক্ত থাকবে, যার মধ্যে থেকে বিচারক সহজেই প্রয়োজনীয় আইন ও নজির (Case Law) খুঁজে বের করতে পারবেন।

- বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের এবং আইনজীবীগণের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (JATI)/ ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমির অধীন সকল বিভাগে একটি বিভাগীয় আইসিটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/রিসার্চ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট এবং প্রস্তাবিত ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি কেন্দ্রীয়ভাবে বিচার ব্যবস্থায় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI) -র প্রয়োগ, ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি (ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, ব্লক চেইন ও অগমেন্টেড রিয়্যালিটি ইত্যাদি) ও বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণা করবে এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।
- যে সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি সেবা সংক্রান্ত কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাদের নিয়ে একটি 'আইসিটি নলেজ পুল' তৈরি করা যেতে পারে। তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ই-জুডিসিয়ারি কার্যক্রমকে ক্রমোন্নতিশীল রাখতে সহায়তা করবে।
- জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- বিচার ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা করা হবে।

প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা

- দেওয়ানি আদালতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনায় ২০% মামলা দায়েরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-ফাইলিং এর মামলাগুলোকে কোর্ট-ফি হ্রাস/ছাড় ও ফাস্ট ট্রাকের মাধ্যমে দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ই-ফাইলিংকে উৎসাহিত করতে হবে।
- সকল আদালতে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সহ সকল কোর্ট-ফি, খরচ, জরিমানা ও অন্যান্য ফি পরিশোধের ক্ষেত্রে ২০% লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।
- শতভাগ মামলার তথ্য ই-কজলিস্ট মডিউলের মাধ্যমে প্রদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: (Adaptation Phase)

বাস্তবায়ন কাল: ৬-১০ বছর

প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের পর প্রস্তাবিত সেবা ব্যবহারের পরিধি আরও বিস্তৃত করতে হবে। ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির উপযোগিতা মূল্যায়ন, বিচারক, আদালতের সহায়ক কর্মচারি ও আইনজীবীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে বিচারপ্রার্থী জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবা গ্রহীতার অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়নপূর্বক দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য নিম্নরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

- ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প শেষে চলমান সেবার সাথে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি তথা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লক চেইন প্রযুক্তি, ভার্চুয়াল রিয়ালেটি, অগমেন্টেড রিয়ালিটি এবং IoT (Internet of Things) প্রযুক্তির ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনায় ই-জুডিসিয়ারি (২য় পর্ব) প্রকল্প শুরু করতে হবে।
- প্রত্যেক আদালতে বিচারকালে ভয়েস টু টেক্সট ও কোর্ট রিপোর্টিং সফটওয়্যার চালু করতে হবে।
- ভূমি জরিপ অধিদফতরের সাথে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS), পুলিশ প্রশাসনের সিডিএমএস, রেজিস্ট্রেশন অধিদফতরের ই-রেজিস্ট্রেশন (ল্যান্ড ও নিকাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত) সফটওয়্যারসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল সেবার সাথে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবর্তন করতে হবে।
- আসামীদের প্রবেশনের জন্য ই-প্রফাইলিং সফটওয়্যার চালু করতে হবে।
- আদালতের বিভিন্ন বিচারকের মধ্যে মামলা বণ্টন করার জন্য কেস ডিস্ট্রিবিউশন মডিউল প্রস্তুত করতে হবে যার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদালতগুলোতে মামলা বণ্টন করা যাবে। একটি আদালতে

বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বিবেচনায় কোন একটি নির্দিষ্ট মামলা নিষ্পত্তি হতে কতদিন সময় লাগতে পারে তার গাণিতিক অনুমান পাওয়ার জন্য কেস ডিস্পোসাল প্রেডিকশন মডিউল থাকতে হবে, যে তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন আদালতের কেসলোড এনালাইসিস করে মামলা প্রেরণ করা যেতে পারে। অতীতের ডাটা এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট মামলার নিষ্পত্তি হতে কত সময় লাগতে পারে তার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। কেসলোড এনালাইসিস এবং কেস ডিস্পোজাল প্রেডিকশন মডিউলের তথ্যে সাথে কেইস ডিস্ট্রিবিউশন মডিউল যুক্ত করে বিচারকগণের উপর কাজের ভার অধিক্ষেত্র অনুসারে সমানভাবে বিতরণ করা যাবে, ফলে কোন বিচারক অতিরিক্ত চাপের মধ্যে পড়বেন না। অধিকন্তু, এতে বিচার প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্ব বা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমে যাবে এবং বিচার কার্যক্রম দ্রুততর হবে।

- কোর্টরুম রিপোর্টিং মডিউল প্রস্তুত করা যেতে পারে যার মাধ্যমে আদালতের সমস্ত কার্যক্রমের অডিও-ভিজুয়াল রেকর্ডিং তথা বিচার কার্যক্রম, সাক্ষী গ্রহণ এবং অন্যান্য মামলার আলোচনাসহ সমস্ত কার্যক্রম রেকর্ড করা হবে। এই রেকর্ডিংগুলোকে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করার জন্য একটি শক্তিশালী সিস্টেম প্রয়োজন হবে, যাতে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা তথ্য হারানোর ঝুঁকি থাকবে না। আদালতে উপস্থিত সাক্ষীদের পরিচয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ফেস ডিটেকশনের মাধ্যমে যাচাইকরণেরও একটি ব্যবস্থা এই সিস্টেমের মধ্যে থাকতে পারে, এতে সাক্ষীর পরিচয় নিয়ে ভবিষ্যতে সংশয় থাকবে না। এই সিস্টেমের মাধ্যমে হওয়া রেকর্ডিংগুলো প্রমাণ হিসেবে আদালতে ব্যবহার করা যাবে, তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে যাতে এই অডিও-ভিজুয়াল রেকর্ডিংকে যথাযথভাবে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এছাড়া, এই রেকর্ডিংয়ের অনুলিখন (Transcription) তৈরি করা সম্ভব হবে।
- JATI ও জুডিসিয়াল একাডেমির তত্ত্বাবধানে একটি সেলফ লার্নিং মডিউল সৃজন করতে হবে।
- বিচার ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে হবে এবং প্রস্তাবিত সকল সেবার উপকারভোগীর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা
• দেওয়ানি আদালতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনায় ৫০% মামলা দায়েরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-ফাইলিং এর মামলাগুলোকে কোর্ট-ফি হ্রাস/ছাড় ও ফাস্ট ট্রাকের মাধ্যমে দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ই-ফাইলিংকে উৎসাহিত করতে হবে। • ৫০% ফৌজদারি অভিযোগ ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দায়েরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। • সকল আদালতে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সহ সকল কোর্ট-ফি, খরচ, জরিমানা ও অন্যান্য ফি পরিশোধের ক্ষেত্রে ৫০% লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায় (Scaling up Phase):

বাস্তবায়ন কাল: ১১-১৫ বছর

সফলভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করবে এবং বিচার ব্যবস্থায় জনগণের প্রবেশাধিকার ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে। জনগণ আধুনিক প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হবে এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার পরিধি বৃদ্ধি এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তৃতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- পূর্ববর্তী পর্যায়দ্বয়ে চালুকৃত ডিজিটাল সিস্টেমগুলোকে এই পর্যায়ে সময়উপযোগীকরণ (Update), বর্ধিতকরণ (Enhancement) এবং শতভাগ কার্যকর করাই হবে এই পর্যায়ের মূল লক্ষ্য।
- দেওয়ানি আদালতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনায় ১০০% মামলা দায়েরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।
- সকল আদালতে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সহ সকল কোর্ট-ফি, খরচ, জরিমানা ও অন্যান্য ফি পরিশোধের ক্ষেত্রে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।
- ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা

বিচার বিভাগের কার্যপ্রণালী রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভিন্ন এবং জটিল। অধস্তন আদালতসহ বিচার বিভাগের বিচারিক কাজের তদারকির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিধায় বিচার বিভাগের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত নেতৃত্বও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নিকট থাকা উচিৎ। এক্ষত্রে নিম্নোক্ত ছক অনুসরণ করা যেতে পারে:

নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	• বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	• বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট • আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহযোগী প্রতিষ্ঠান	• আই সি টি বিভাগ • স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ বার কাউন্সিল • ভূমি মন্ত্রণালয় • সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় • পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

চর্তুদশ অধ্যায়
অধস্তন আদালতের ভৌত অবকাঠামো

১. ভূমিকা

কার্যকরভাবে বিচারিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের সামগ্রিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উন্নত মানের ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করা। তবে বাস্তবতা হলো, পর্যাপ্ত এজলাস না থাকার কারণে এখনও বিচারকদের এজলাস ভাগাভাগি করে বিচারকাজ সম্পাদন করতে হচ্ছে। ফলে বিচারিক কর্মঘণ্টার সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং বিচার বিভাগের কার্যকরতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

২. আদালতের ভৌত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা

২.১ জেলা জজ আদালত

আইন ও বিচার বিভাগের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৬৪টি জেলা জজ আদালত ভবনের ২৯টি নির্মিত হয়েছে ১৯৯০ এর দশকে। ৯০'র দশকের পরে নির্মিত হয়েছে ১৩টি। এছাড়া ৮০'র দশকে নির্মিত হয়েছে ১০টি এবং ৮০'র দশকের পূর্বে নির্মিত হয়েছে ৯টি। পূর্বের নির্মিত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে ৩টি ভবনের। এ অবস্থায় ৬৪টি জেলা জজ আদালত ভবনের অধিকাংশেরই অবস্থা জরাজীর্ণ, নাজুক ও ভঙ্গপ্রায়। বেশিরভাগ ভবনের অবস্থা এতই নাজুক যে, এগুলো প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার মতো অবস্থায় থাকলেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। আইন ও বিচার বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ৩৭টি জেলার[৪১] জেলা জজ আদালত ভবন প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উক্ত ৩৭টি জেলার জেলা জজ আদালত ভবনের অবস্থা এতই ভগ্নপ্রায় ও জরাজীর্ণ যে, এগুলোতে সুষ্ঠুভাবে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করার মত অবস্থা নেই।

২.২ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

ম্যাজিস্ট্রেসি পৃথকীকরণের পর দেশের ৬৪টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি এই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। আইন ও বিচার বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নরূপ:

---

[৪১] বরগুনা, বাগেরহাট, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকাঠি, যশোর, পটুয়াখালী, খুলনা, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, মাগুরা, কক্সবাজার, নড়াইল, খাগড়াছড়ি, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, নোয়াখালী, রাজশাহী, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, গোপালগঞ্জ, পঞ্চগড়, মাদারীপুর, রংপুর, মুন্সীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট ও টাঙ্গাইল।

ছক - ১[৪২]

জেলার নাম	**সিজেএম আদালত ভবনের অবস্থা**	**মন্তব্য**	**জেলার নাম**	**সিজেএম আদালত ভবনের অবস্থা**	**মন্তব্য**
বরগুনা	নির্মিত হয়নি	একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে	শেরপুর	নির্মিত হয়নি	
বরিশাল	নির্মিত হয়েছে		টাঙ্গাইল	নির্মিত হয়েছে	
ভোলা	নির্মিত হয়েছে		বাগেরহাট	নির্মিত হয়নি	জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তবে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি
ঝালকাঠি	নির্মিত হয়েছে		চুয়াডাঙ্গা	নির্মিত হয়নি	জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তবে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি
পটুয়াখালী	নির্মিত হয়েছে	৪ তলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে।	যশোর	নির্মিত হয়েছে	
পিরোজপুর	নির্মিত হয়েছে		ঝিনাইদহ	নির্মিত হয়েছে	
বান্দরবান	নির্মিত হয়নি	জমির অবস্থান নিয়ে আইনজীবীদের আপত্তি আছে	খুলনা	নির্মিত হয়েছে	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নির্মিত হয়েছে		কুষ্টিয়া	নির্মিত হয়েছে	
চাঁদপুর	নির্মিত হয়নি	একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে	মাগুরা	নির্মিত হয়েছে	
চট্টগ্রাম	নির্মিত হয়েছে		মেহেরপুর	নির্মিত হয়নি	জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তবে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি
কুমিল্লা	নির্মিত হয়েছে		নড়াইল	নির্মিত হয়নি	
কক্সবাজার	নির্মিত হয়নি	নির্মাণ কাজের টেন্ডার হয়নি	সাতক্ষীরা	নির্মিত হয়েছে	
ফেনী	নির্মিত হয়নি	জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তবে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি	বগুড়া	নির্মিত হয়েছে	
খাগড়াছড়ি	নির্মিত হয়নি		জয়পুরহাট	নির্মিত হয়েছে	
লক্ষীপুর	নির্মিত হয়েছে		নওগাঁ	নির্মিত হয়নি	
নোয়াখালী	নির্মিত হয়েছে		নাটোর	নির্মিত হয়নি	
রাঙ্গামাটি	নির্মিত হয়েছে		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে	
ঢাকা	নির্মিত হয়েছে		পাবনা	নির্মিত হয়েছে	
ফরিদপুর	নির্মিত হয়েছে		রাজশাহী	নির্মিত হয়েছে	
গাজীপুর	নির্মিত হয়নি	জমি অধিগ্রহণ হলেও নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি	সিরাজগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে	
গোপালগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে		দিনাজপুর	নির্মিত হয়েছে	
জামালপুর	নির্মিত হয়েছে		গাইবান্ধা	নির্মিত হয়নি	
কিশোরগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে		কুড়িগ্রাম	নির্মিত হয়েছে	
মাদারীপুর	নির্মিত হয়নি	ভবন নির্মাণের বাজেট বরাদ্দ না থাকায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি	লালমনিরহাট	নির্মিত হয়নি	জমির দলিল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি
মানিকগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে		নীলফামারী	নির্মিত হয়নি	
মুন্সীগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে		পঞ্চগড়	নির্মিত হয়েছে	
ময়মনসিংহ	নির্মিত হয়েছে		রংপুর	নির্মিত হয়েছে	
নারায়ণগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে		ঠাকুরগাঁও	নির্মিত হয়নি	
নরসিংদী	নির্মিত হয়নি		হবিগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে	
নেত্রকোণা	নির্মিত হয়নি		মৌলভীবাজার	নির্মিত হয়েছে	
রাজবাড়ি	নির্মিত হয়নি		সুনামগঞ্জ	নির্মিত হয়েছে	
শরীয়তপুর	নির্মিত হয়নি		সিলেট	নির্মিত হয়েছে	

[৪২] তথ্যসূত্র: আইন ও বিচার বিভাগ।

উপরিউক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি ১৫ বছর আগে গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি ৪১টি জেলায় ভবন নির্মিত হয়েছে। ১৮টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ করা হলেও দলিল রেজিস্ট্রেশন না হওয়া, একনেকে অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন থাকা, বাজেট বরাদ্দ না থাকা, জমির অবস্থান নিয়ে আইনজীবীদের আপত্তি থাকা ইত্যাদি নানা কারণে এখনও নির্মাণ কাজই শুরু হয়নি। এছাড়া ৫টি জেলায় এখনও পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমই শুরু হয়নি। এমতাবস্থায় অনতিবিলম্বে অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলো শেষ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.৩ চৌকি আদালত

চৌকি আদালতের যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। প্রাথমিকভাবে জমিদারি ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, বিশেষত খাজনা আদায় সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য, চৌকি আদালত গঠিত হলেও কালক্রমে এটি উপজেলা পর্যায়ের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে রূপ নেয়। ব্রিটিশ আমল ছাড়াও পরবর্তীকালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম এলাকাগুলোতে এ ধরনের আরও কিছু আদালত স্থাপিত হয়। নব্বই এর দশকে উপজেলা পর্যায়ের আদালতগুলো জেলা সদরে আনা হলেও দুর্গম ও দূরবর্তী এলাকার বেশ কিছু আদালত উপজেলা পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশে ৬৭টি চৌকি আদালত রয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি ম্যাজিস্ট্রেট চৌকি আদালত এবং ৩৯টি দেওয়ানি চৌকি আদালত। ৬৭টি চৌকি আদালতের মধ্যে অন্তত ৫১টি আদালতের অবকাঠামো খুবই নাজুক, ভগ্নপ্রায় ও ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো নিম্নরূপ:

ছক - ২[৪৩]

ক্রম	জেলা	উপজেলা	চৌকি আদালতের নাম	মন্তব্য
১	বরগুনা	আমতলী	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, আমতলী চৌকি	ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী
২	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, কলাপাড়া চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কলাপাড়া চৌকি	
		মির্জাগঞ্জ	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মির্জাগঞ্জ চৌকি	
		গলাচিপা	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, গলাচিপা চৌকি	
		দশমিনা	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দশমিনা চৌকি	
		রাঙ্গাবালী	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, রাঙ্গাবালী চৌকি	
৩	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মঠবাড়িয়া চৌকি	
৪	বান্দরবান	লামা	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, লামা চৌকি	
৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	সহকারি জজ আদালত, নবীনগর চৌকি	
		বাঞ্ছারামপুর	সহকারি জজ আদালত, বাঞ্ছারামপুর চৌকি	
৬	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত, বাঁশখালী চৌকি	
			সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, বাঁশখালী চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বাঁশখালী চৌকি	
			সহকারি জজ আদালত, বাঁশখালী চৌকি	
		পটিয়া	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত, পটিয়া চৌকি	
			সিনিয়র সহকারি জজ ১ম আদালত, পটিয়া চৌকি	
			সিনিয়র সহকারি জজ ২য় আদালত, পটিয়া চৌকি	
			সিনিয়র সহকারি জজ অতিরিক্ত আদালত, পটিয়া চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, পটিয়া চৌকি	
		রাউজান	সহকারি জজ আদালত, রাউজান চৌকি	
		রাঙ্গুনিয়া	সহকারি জজ আদালত, রাঙ্গুনিয়া চৌকি আদালত	

[৪৩] তথ্যসূত্র: আইন ও বিচার বিভাগ।

ক্রম	জেলা	উপজেলা	চৌকি আদালতের নাম	মন্তব্য
		সন্দ্বীপ	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, সন্দ্বীপ চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সন্দ্বীপ চৌকি	
৭	কক্সবাজার	চকরিয়া	সহকারি জজ আদালত, চকরিয়া চৌকি আদালত	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চকরিয়া চৌকি আদালত	
		মহেশখালী	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহেশখালী চৌকি আদালত	
		কুতুবদিয়া	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কুতুবদিয়া চৌকি আদালত	
৮	ফরিদপুর	ভাঙ্গা	সহকারি জজ আদালত, সদরপুর, ভাঙ্গা চৌকি	
			সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, ভাঙ্গা চৌকি	
			সহকারি জজ আদালত, নগরকান্দা, ভাঙ্গা চৌকি	
৯	শরীয়তপুর	চিকন্দী	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, সদর, চিকন্দী চৌকি	
		জাজিরা	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, জাজিরা চৌকি	
১০	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, দৌলতপুর চৌকি	
১১	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, মহেশপুর চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহেশপুর চৌকি	
১২	খুলনা	পাইকগাছা	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, পাইকগাছা চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, পাইকগাছা চৌকি	
		কয়রা	সহকারি জজ আদালত, কয়রা চৌকি	
১৩	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, শাহজাদপুর চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, শাহজাদপুর চৌকি	
১৪	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, গোবিন্দগঞ্জ চৌকি	
			সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, গোবিন্দগঞ্জ চৌকি	
১৫	সিলেট	জকিগঞ্জ	সহকারি জজ আদালত, জকিগঞ্জ চৌকি	
১৬	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বড়লেখা চৌকি	
১৭	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, আজমিরীগঞ্জ চৌকি	
১৮	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ধর্মপাশা চৌকি	
১৯	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, ঈশ্বরগঞ্জ চৌকি	
২০	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দুর্গাপুর চৌকি	
			সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, দুর্গাপুর চৌকি	
		কলমাকান্দা	সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, কলমাকান্দা চৌকি	
মোট	২০	৩৪	৫১	

উপরিউক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০টি জেলার অধীন ৩৪টি উপজেলাভুক্ত ৫১টি চৌকি আদালতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এগুলোতে সুষ্ঠুভাবে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো অবস্থা বিদ্যমান নেই। উক্ত ৫১টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক আদালত ভবন নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক।

৩. আদালতের অবকাঠামোজনিত অন্যান্য অসুবিধা

৩.১ এজলাস সংকট

বর্তমানে দেশের সকল আদালতের জন্য এজলাস নেই। ফলে বেশিরভাগ জেলায় একই এজলাস ও খাসকামরা একাধিক বিচারককে ভাগাভাগি করে বিচারকাজ পরিচালনা করতে হয়। এতে বিচারকদের কর্মঘণ্টা বিভাজিত হয়ে পড়ে। একই এজলাস দিনে দুইবার দুই আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বিচারপ্রার্থীকেও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এজলাস সংকটের কারণে একটি আদালতের কার্যক্রম শেষ না হওয়া সত্ত্বেও অন্য আদালতের জন্য বিচারককে এজলাস ত্যাগ করতে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব মুলতবি রেখে এজলাস

ত্যাগ করার কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণকে বিচার ছাড়াই ফেরত যেতে হচ্ছে। জেলা আদালতের যেসব বিচারককে বর্তমানে এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় তার তথ্য নিম্নরূপ:

জেলা জজ আদালত

ছক - ৩[৪৪]

ক্রমিক	জেলার নাম	এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় এরূপ বিচারকের সংখ্যা	ক্রমিক	জেলার নাম	এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় এরূপ বিচারকের সংখ্যা
১	বরিশাল	১০ জন	১০	যশোর	৫ জন
২	চাঁদপুর	৩ জন	১১	সাতক্ষীরা	২ জন
৩	কক্সবাজার	২ জন	১২	বগুড়া	৩ জন
৪	ঢাকা	৪ জন	১৩	নাটোর	৩ জন
৫	জামালপুর	২ জন	১৪	রাজশাহী	৬ জন
৬	নরসংদী	২ জন	১৫	লালমনিরহাট	৪ জন
৭	শরীয়তপুর	২ জন	১৬	হবিগঞ্জ	৪ জন
৮	শেরপুর	৪ জন	১৭	মৌলভীবাজার	২ জন
৯	বাগেরহাট	৪ জন	১৮	সিলেট	৪ জন
মোট = ৬৬ জন					

চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

ক্রমিক	জেলার নাম	এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় এরূপ বিচারকের সংখ্যা	ক্রমিক	জেলার নাম	এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় এরূপ বিচারকের সংখ্যা
১	বরগুনা	৩ জন	১০	শেরপুর	৫ জন
২	চাঁদপুর	৫ জন	১১	বাগেরহাট	৪ জন
৩	ফেনী	৪ জন	১২	চুয়াডাঙ্গা	২ জন
৪	খাগড়াছড়ি	২ জন	১৩	খুলনা	৪ জন
৫	ঢাকা	২ জন	১৪	নওগাঁ	২ জন
৬	গাজীপুর	২ জন	১৫	নাটোর	৩ জন
৭	মাদারীপুর	২ জন	১৬	পাবনা	২ জন
৮	নরসংদী	৭ জন	১৭	গাইবান্ধা	৪ জন
৯	শরীয়তপুর	৬ জন	১৮	লালমনিরহাট	৫ জন
মোট = ৬৪ জন					

প্রতিটি আদালতের বিচারিক কর্মঘণ্টা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য উপরের ছকে বর্ণিত জেলা জজ আদালতের ৬৬টি এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৬৪টি আদালতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এজলাস নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৩.২ আদালতের রেকর্ডরুম, নেজারত, নকলখানা, মালখানা, সেরেস্তা, জিআরও অফিস ইত্যাদি

আদালতের বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্থানসংকট প্রকট। আদালতের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখাকে কক্ষ ভাগাভাগি করে কাজ করতে হয়। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন আদালতের নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, কোর্ট হাজত ও

[৪৪] তথ্যসূত্র: আইন ও বিচার বিভাগ।

মালখানার জন্য নির্ধারিত কক্ষ ও স্থান অপ্রতুল। অনেক ক্ষেত্রে ভবন অত্যধিক পুরনো হওয়ায় কক্ষগুলো স্যাঁতসেঁতে এবং সেগুলোতে পোকা-মাকড় বিশেষত উইপোকার উপদ্রব থাকে। ফলে আসবাবপত্রসহ মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অনেক জেলার সেরেস্তা, নেজারত, নকলখানা, মালখানা, রেকর্ড রুমে বৃষ্টির পানি পড়ে নথিপত্র নষ্ট হয়। তাছাড়া, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মালখানার সুরক্ষার জন্য বেশির ভাগ জেলায় ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় মালখানায় রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বহু আলামত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আদালত প্রাঙ্গণে পুলিশের অবস্থানের জন্য কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় আদালতের দায়িত্ব পালনে তাদের অনীহা প্রকাশ পায়। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জিআরও শাখা সংশ্লিষ্ট থানা ও আদালতের মধ্যে সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পালন করে। ফৌজদারি মামলার প্রাথমিক অবস্থায় মামলার কার্যক্রমসহ নথিপত্র সংরক্ষণ ও উত্থাপনের দায়িত্ব জিআরও শাখার। বর্তমানে অনেক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জিআরও শাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। এ কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যেসব আদালতে নতুন সেরেস্তা, রেকর্ড রুম, নেজারত, নকলখানা, মালখানা, জিআরও শাখা ইত্যাদি নির্মাণ, অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে, সংস্কারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ বিচারপ্রার্থী, সাক্ষী, নারী ও শিশুদের বসার স্থান ও শৌচাগারের অপ্রতুলতা

মামলার প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন আদালতে আসলেও তাদের বসার জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। আদালতের কার্যক্রম চলাকালে এজলাস কক্ষে আইনজীবীদের অত্যধিক ভিড় থাকায় আদালত কক্ষে তারা বসতে পারে না। কিছু কিছু আদালত কক্ষের সামনে বসার কিছু বেঞ্চ রাখা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী ও সাক্ষীকে আদালত প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে, আদালতের বারান্দায়, খোলা মাঠে, গাছতলায়, হোটেলে, দোকানে, আইনজীবীর চেম্বারে বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণতে হয়। নারী, শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ মানুষের জন্য এটি খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। এছাড়া বেশিরভাগ আদালতে বিচারপ্রার্থীদের জন্য শৌচাগারের ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু আদালতে শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকলেও এগুলো অপরিস্কার, নোংরা ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ৬৪টি জেলায় ন্যায়কুঞ্জ স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিশ্রামাগারে বিচারপ্রার্থীদের বসার জন্য আসন, নারী-পুরুষ শৌচাগার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও একটি করে দোকান নির্মাণের কথা রয়েছে। প্রকল্পটি কয়েকটি জেলায় বাস্তবায়িত হলেও আদালতে আগত জনগোষ্ঠীর তুলনায় এটি খুবই নগণ্য। ন্যায়কুঞ্জ প্রকল্পের আদলে আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য নতুন করে একটি প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৪ আইনজীবী এবং সরকারি আইন কর্মকর্তাদের অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা

দেশের আদালতগুলোতে আইনজীবীদের ব্যবহার্য অবকাঠামোর অপ্রতুলতা রয়েছে। অনেক জায়গায় দেখা যায়, আইনজীবী সমিতির ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় আইনজীবীদেরকে আদালত প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শেড বা ছাউনির নিচে বসে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয়। আইনজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাদের ব্যবহার্য স্থান বাড়ছে না। আইনজীবীদের সহকারি বা মুহুরিদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র বিদ্যমান। একইভাবে অনেক এলাকায় সরকারি আইন কর্মকর্তাদের ব্যবহার্য স্থানেরও অপ্রতুলতা রয়েছে, কোথাও বারান্দার এক অংশে হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘিরে সেখানে কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.৫ বিচারকদের আবাসন ঘাটতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়:

> There is no accommodation for the judges in any level, which impaired the effective delivery of administration of justice and safety of accommodation.

> Therefore, there should be infrastructural development in terms of judicial complex in every district[45].

সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এরূপ স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে, প্রায় সব জেলায় শুধুমাত্র জেলা জজদের জন্য নির্দিষ্টকৃত বাসভবন আছে। কিন্তু জেলা জজ পর্যায়ের অন্যান্য বিচারক এবং নিম্নতর পর্যায়ের বিচারকগণের জন্য বাসস্থান সুবিধা নেই বললেই চলে। চৌকি আদালতের অবস্থা আরো শোচনীয়। ব্যতিক্রম হিসেবে ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগীয় সদরে কিছু এ্যাপার্টমেন্ট আছে। অন্য কয়েকটি জেলায় বহু দিনের পুরাতন কয়েকটি বাসভবন আছে। এগুলোর প্রায় সবগুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ। সুতরাং বিচারকগণের ন্যূনতম প্রয়োজন, নিরাপত্তা ও সর্বোপরি বিচার বিভাগ তথা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সকল বিচারকের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় উন্নতমানের বাসভবন নির্মাণ করা আবশ্যক।

৩.৬ ইনফরমেশন ডেস্ক (Information Desk) স্থাপন

বিভিন্ন শ্রেণির বিচারপ্রার্থী জনগণ মামলার প্রয়োজনে আদালতে আসে। বিচারপ্রার্থীদের একটি বড় অংশই নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। পাশাপাশি স্বল্পশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও কম নয়। এসব মানুষ আদালতে এসে কারো নিকট তথ্য সহায়তা পায় না। অনেক সময় দেখা যায় মামলার সাক্ষী ও পক্ষগণ যে আদালতে হাজিরার জন্য এসেছে সে আদালত খুঁজে পায় না। আদালতের হাজতখানা না চেনার কারণেও অনেক মানুষ বিড়ম্বনায় পড়ে। অহেতুক হয়রানির শিকারও হয়। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা সাধারণ নারী বিচারপ্রার্থীগণ। সঠিক তথ্য না পাওয়ায় এসব বিচারপ্রার্থী মানুষ বিভিন্ন প্রতারক ও দালাল গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্বান্ত হয়। মানুষকে আদালতের বিষয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের জন্য আদালতের প্রবেশদ্বারে একটি ইনফরমেশন ডেস্ক চালু করা অপরিহার্য। কোনো রকম পদ সৃজন না করেও বিদ্যমান অবস্থায় এরূপ ইনফরমেশন ডেস্ক চালু করা সম্ভব। তবে ইনফরমেশন ডেস্কে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ

(১) ২.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৩৭টি জেলার জন্য জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের সুপারিশের ভিত্তিতে যেসব ক্ষেত্রে ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেত হবে।

(২) বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যে ২৩টি জেলায় এখনো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়নি সেগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। যে ৫টি জেলায় অদ্যাবধি জমি অধিগ্রহণ হয়নি সেগুলোর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ২০টি জেলার আওতাধীন ৩৪টি উপজেলায় অবস্থিত ৫১ টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত প্রস্তাব অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সমন্বয় করে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(৪) জেলা জজ আদালতের আওতাধীন ৬৬টি এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতাধীন ৬৪টি আদালতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এজলাস নির্মাণ করতে হবে।

---

[৪৫] 7th Five Year Plan, page 160.

(৫) মহানগর দায়রা জজ এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য পৃথক আদালত ভবন স্থাপন করতে হবে।

(৬) আদালতের নেজারত, সেরেস্তা, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা, কোর্ট হাজত ও জিআরও শাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ ও প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে

(৭) বিচারপ্রার্থী, সাক্ষী, আইনজীবী, সরকারি আইন কর্মকর্তা এবং আইনজীবী সহকারিদের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

(৮) বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে আদালত ভবনের নিচতলায় 'ইনফরমেশন ডেস্ক' স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৯) বিচারকদের আবাসনের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স স্থাপন করতে হবে।

(১০) আদালতে আগত নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণসহ পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আদালত ব্যবস্থাপনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রীম কোর্ট ব্যবস্থাপনা

১. ভূমিকা

সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ২৮,৯০১ এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৫,৭৭,২৮০। এই দুই বিভাগে কর্মরত বিচারকের সংখ্যার সাথে বিচারাধীন মামলার এই সংখ্যার তুলনা করলে উচ্চতর আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ অনুধাবন করা যায়। এই পরিস্থিতি একটি কার্যকর বিচার বিভাগের ধারণার ঠিক বিপরীত চিত্রই তুলে ধরে। সুতরাং, একটি কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা ব্যবস্থাপায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে মামলা ব্যবস্তাপনার ধারণায় একটি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যপ্রদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, জনবল ও অবকাঠামোগত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. সুপ্রীম কোর্টে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও সমস্যা

সুপ্রীম কোর্টের মামলা ব্যবস্থাপনা এবং আদালত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত গ্রহনের জন্য বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন তার ওয়েবসাইট-এর (www.jrc.gov.bd) মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীসহ অংশীজনদের মতামত আহবান করে। এছাড়াও অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়কালে এবং ইমেইল ও পত্রযোগে বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিক, বিচারক, আইনজীবী (ব্যক্তিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে), মানবাধিকার কর্মী এবং বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন সুপ্রীম কোর্টের মামলা ও আদালত ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাঁদের মতামত কমিশনকে অবহিত করেন। এসব মতামতের ভিত্তিতে এবং কমিশন-সদস্যদের অভিজ্ঞতার আলোকে হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপীল বিভাগে মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতার বিভিন্ন কারন ও সমস্যা চিহ্নিত করা যায়।

হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট ও আদি এখতিয়ারভুক্ত মামলার নিষ্পত্তি নানা কারণে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(ক) মামলার নোটিশ জারির ক্ষেত্রে বিলম্ব ও কার্যকর তদারকির অভাব;
(খ) নিম্ন-আদালতের রেকর্ড সময়মত মামলার মূল নথির সাথে সামিল না হওয়া;
(গ) আদালতের প্রাথমিক আদেশে (অর্থাৎ, রুল-জারির আদেশে) নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকা, যার ফলে মামলা গৃহীত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও প্রতিপক্ষ তার জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকে;
(ঘ) মামলায় জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের দীর্ঘসূত্রিতার প্রবণতা এবং এক্ষেত্রে আদালতের তদারকির অভাব;
(ঙ) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বারংবার বাড়ানোর ক্ষেত্রে আদালতের তদারকির অভাব;

(চ) বেঞ্চ পুনর্গঠন বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকা, এবং এর ফলে, প্রতিবার বেঞ্চ পুনর্গঠনের সময় চূড়ান্ত শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত মামলা তালিকাচ্যুত হওয়া;
(ছ) আদালতের আদেশ ও রায় স্বাক্ষর হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব;
(জ) মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের অসহযোগিতা ও অবহেলা;
(ঝ) মামলার আবেদনকারি বা আপীলকারি পক্ষ চূড়ান্ত শুনানির সময় অনুপস্থিত থাকা এবং অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলা খারিজ (dismissed for default) হওয়ার পর তা আবার পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করা; ইত্যাদি।

আপীল বিভাগে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ এবং মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিপত্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) অধিকাংশ সময় শুনানির জন্য একাধিক বেঞ্চ না থাকা, ফলে মামলা নিষ্পত্তির হার ও গতি আশানুরূপ না হওয়া;
(খ) চেম্বার আদালতে মামলার অতিরিক্ত চাপ, ফলে অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ শুনানির সুযোগ না থাকা;
(গ) এক পক্ষের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত রায় বা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিতের ব্যবস্থা (অনেক ক্ষেত্রে কেভিয়েট (caveat) থাকা সত্ত্বেও);
(ঘ) সময়সীমা পার হওয়া সত্ত্বেও সরকার পক্ষ কর্তৃক আপীল বা রিভিউ আবেদন দায়েরের প্রবণতা;
(ঙ) আদেশ বা রায় একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বাক্ষর না হওয়া,
(চ) রিভিউ আবেদন দাখিল করে কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ না থাকা সত্ত্বেও মামলার বিষয়টিকে জিইয়ে রাখা, ইত্যাদি।

এছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা দায়েরের জন্য যথেষ্ট কারন না থাকা সত্ত্বেও, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল ভিত্তির উপর মামলা দায়ের করা হলেও, মামলার রায়ে আবেদনকারিপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ আদেশ প্রদানের (যেমন, মামলার খরচ প্রদানের আদেশ) প্রচলন নেই। এর ফলে প্রতিনিয়ত অপ্রয়োজনীয় ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের হচ্ছে এবং বছরের পর বছর সেগুলো বিচারাধীন থাকায় মামলাজট বেড়েই চলেছে, অথচ এর জন্য দায়ী পক্ষের কোন ফলভোগ করতে হচ্ছেনা।

সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমানোর স্বার্থে উপরিউক্ত কারণ ও সমস্যাগুলোর আশু ও কার্যকর সমাধান করা জরুরি।

৩. বিদ্যমান সংস্কার উদ্যোগ

মামলা দায়ের, পরিচালনা ও নিষ্পত্তির বিভিন্ন পর্যায়ে সম্প্রতি কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে, যার ইতিবাচক ফল বিচারপ্রার্থীরা ইতিমধ্যেই লাভ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে:

(ক) অনলাইনে মামলা-তালিকা (cause-list) প্রকাশ এবং মামলার রেকর্ড (case-record) প্রাপ্তির সুবিধা;
(খ) আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের কিছু রায় অনলাইনে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব-পোর্টালে প্রকাশ;
(গ) হাইকোর্টে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়েরের সময় প্রযুক্তির সহায়তায় টোকেন পদ্ধতির মাধ্যমে মামলার এন্ট্রি (entry) ও এভিডেভিটের ব্যবস্থা;
(ঘ) বেঞ্চ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির আওতায় আংশিকশ্রুত মামলা শুনানির তালিকায় অব্যাহত রাখা, ইত্যাদি।

৪. সংস্কারের জন্য কমিশনের প্রস্তাব

সুপ্রীম কোর্টে মামলাজট কমানো এবং সুবিচারপ্রাপ্তিকে সহজ করার লক্ষ্যে অংশীজনদের মতামত এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের আলোকে উপরিউক্ত সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়েও সংস্কার-কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বেগবান করার বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করছে:

(১) শুনানির জন্য মামলা প্রস্তুতকরণে বিলম্ব হ্রাস

বিদ্যমান ব্যবস্থায় আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগে একটি নতুন মামলা দায়ের হওয়ার পর ঢাকার বাইরে ওই মামলার নোটিশ জারি হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়, কারণ নোটিশ জারির জন্য আদালতের নিজস্ব জনবলের অভাব রয়েছে। যেহেতু আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে সরকারি ডাক–বিভাগে অতীতের তুলনায় কাজের চাপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, সুতরাং নোটিশ জারির দায়িত্ব একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভিত্তিতে ডাক বিভাগের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করা যেতে পারে। কোন নোটিশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে জারির পর সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নোটিশ ফেরৎ আসার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হলে একটি মামলা উক্ত সময়ের পর শুনানির জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

যেসব দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় নিম্ন–আদালতের রেডর্ক হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণের আদেশ দেওয়া হয়, সেসব ক্ষেত্রে মামলার মূল নথির সাথে নিম্ন-আদালতের রেকর্ড সামিল হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত আরেকধাপ বিলম্ব হয়ে থাকে এবং তার ফলে মামলার শুনানির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের তৎপরতার ঘাটতি ও গাফিলতিই এই বিলম্বের জন্য দায়ী।

এক্ষেত্রে আদালতের প্রশাসনিক কার্যালয় যাতে স্ব–উদ্যোগে কোন তদবির ছাড়াই মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুত করে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে যাতে তাদের জবাবদিহি করতে হয়, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ বিষয়ে কোন গাফিলতি আদালতের নজরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে প্রশাসনিক কার্যালয়ের কর্মচারিদের তৎপরতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা ও বহাল রাখা সম্ভব। আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারদের নেতৃত্বে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রশাসনিক কার্যালয় ও সেখানে রক্ষিত রেজিস্টারগুলো পরিদর্শন এবং নোটিশ জারি ও মামলা প্রস্তুতকরণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা হলে এ বিষয়ে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

(২) অনলাইনে মেনশন-স্লিপ

হাইকোর্ট বিভাগের অধিকাংশ বেঞ্চে প্রায় প্রতিদিনই কার্য–তালিকার প্রথম ক্রমিকের বিষয়টি শুনানির জন্য গ্রহণ করার আগেই ৩০ থেকে ৪০ মিনিট অতিবাহিত হয়; ক্ষেত্র–বিশেষে (বিশেষত কোন অবকাশের পর আদালত খোলার দিন) তা এক ঘণ্টার বেশি সময় পর্যন্তও গড়াতে দেখা যায়। এই সময়টিতে আদালতে লাইনে দাঁড়িয়ে আইনজীবীরা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়ানো বা চূড়ান্ত শুনানির জন্য মামলা তালিকাভুক্ত করার জন্য মেনশন-স্লিপ (mention slip) জমা দেন, অথবা শুনানি মূলতবির জন্য প্রার্থনা করেন। প্রতিদিনই আদালতের কর্মঘণ্টা এর ফলে সংকুচিত হয়। কমিশনের কাছে মতামত প্রদানকারী প্রায় সকল আইনজীবীর এ বিষয়ে প্রস্তাব হলো অনলাইনে মেনশন–স্লিপ জমা নেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে উপরিউক্ত কারণে আইনজীবীদের ও আদালতের সময় নষ্ট না হয়। অনলাইনে মেনশন-স্লিপ গ্রহণের ব্যবস্থার প্রচলন করা হলে কার্যতালিকায় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে।

(৩) বেঞ্চ পুনর্গঠন বিষয়ে নীতিমালা প্রনয়ণ

সংবিধানের ১০৭ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত। সুপ্রীম কোট অফ বাংলাদেশ (হাইকোর্ট ডিভিশন) রুলস, ১৯৭৩–এর ২য় অধ্যায়ে বেঞ্চ গঠন বিষয়ে কিছু বিধান থাকলেও মূলত প্রধান বিচারপতি এককভাবেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। স্বচ্ছতা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ বিবেচ্য বিষয়ের উপর

ভিত্তি করে বেঞ্চ গঠন এবং পুনর্গঠন করা হবে, সেবিষয়ে বিচারক, আইনজীবী এবং বিচার প্রার্থীদের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

বিশেষতঃ কোন বেঞ্চ পুনর্গঠনের আগে সংশ্লিষ্ট বিচারক বা বিচারকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসম্বন্ধে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়, যেন তিনি বা তাঁরা রায় প্রদানের জন্য অপেক্ষমান বা আংশিকশ্রুত বা কার্যতালিকায় শুনানির জন্য নির্দিষ্টকৃত মামলাগুলোর ব্যাপারে বেঞ্চ পুনর্গঠনের আগেই যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন। অর্থাৎ, এমনভাবে বেঞ্চ পুনর্গঠন করতে হবে যেন তার ফলে রায়ের জন্য অপেক্ষমান এবং আংশিকশ্রুত মামলাগুলো নিষ্পত্তির পূর্বে বেঞ্চের পুনর্গঠন কার্যকর না হয়। এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব হবে।

(৪) মামলা নিবন্ধনে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ

বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিবন্ধন এবং এভিডেভিটের ক্ষেত্রে মামলা জমা দেয়ার ক্রম অনুসারে সেবা প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় টোকেন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি-সম্পন্ন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে সুশৃঙ্খলভাবে এবং অনেকটা দুর্নীতিমুক্তভাবে মামলা নিবন্ধন ও এভিডেভিট সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি অন্যান্য ধরনের মামলার, বিশেষত: রিট আবেদন নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও অতিসত্ত্বর সম্প্রসারন করা আবশ্যক।

অতি সম্প্রতি কোম্পানি ও এডমিরালটি অধিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাগজ–বিহীনভাবে অনলাইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সফল হলে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ধরনের মামলার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অনলাইন ব্যবস্থায় মামলা দায়ের বা অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে।

(৫) অনলাইনে মামলার ফলাফল, আদেশ ও রায় প্রকাশ

আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বর্তমানে অনলাইন কার্যতালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। অনলাইন কার্যতালিকায় তাৎক্ষনিকভাবে অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে মামলায় প্রদত্ত আদেশ রিপোর্ট করার ব্যবস্থা রয়েছে। আপীল বিভাগের কার্যতালিকায় নিয়মিতভাবে এই ব্যবস্থাটি অনুসরণ করার প্রচলন থাকলেও, হাইকোর্টের বেঞ্চগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হয়না। অথচ, অনলাইনে দুই–তিনটি শব্দ ব্যবহার করে মামলার ফলাফল বা আদেশ (যেমন, 'Rule Issued', 'Rule and Stay', 'Not Pressed', 'Rule made absolute', 'Rule Discharged', 'Adjourned till …', ইত্যাদি) তাৎক্ষনিকভাবে ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হলে সহজেই বিচারপ্রার্থীরা তাদের মামলার ফলাফল ও অগ্রগতি বিষয়ে জানতে পারেন।

এর ফলে বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়। সুপ্রীম কোর্টের রায় বা আদেশ সম্পর্কে অধস্তন আদালতকে অবহিত করার ক্ষেত্রে এবং অধস্তন আদালত কর্তৃক তা যাচাই করার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা কার্যকর সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং, অনতিবিলম্বে এই অনলাইন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেঞ্চ পরিচালনকারী বিচারকরা নজরদারি নিশ্চিত করলে খুব দ্রুত সন্তোষজনক ফল পাওয়া সম্ভব।

সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব পোর্টালের ব্যবহার আরো সম্প্রসারন করা হলে বিচার প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমুলক এবং জনবান্ধব করা সম্ভব। বিশেষ করে, সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের প্রত্যেকটি আদেশ ও রায়ের ইলেকট্রনিক কপি কিউ-আর কোডসহ অনলাইনে প্রাপ্তিযোগ্য করা উচিৎ, যেন বিচারপ্রার্থীরা সময়মত ও সহজে তাদের মামলার ফলাফল জানতে পারে। বিচার বিভাগের উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে আইন সংশোধন করতে হবে।

(৬) মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তদারকি

বিদ্যমান ব্যবস্থায় হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলা গ্রহণ করে রুল জারি করার পর ঐ মামলা কবে চূড়ান্ত শুনানির পর্যায়ে পৌঁছাবে তা অনিশ্চিত একটি ব্যাপার। এর ফলে দুই ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে:

(ক) মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন কোনো আদেশ না থাকলে মামলার চূড়ান্ত শুনানির মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, প্রভাবশালী কোন আইনজীবীকে নিয়োগ দিয়ে মামলার শুনানি ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করতে হয়; অর্থাৎ, বাড়তি অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়; এবং

(খ) অন্যদিকে, মামলায় অন্তর্বতীকালীন আদেশ থাকলে, অনেকক্ষেত্রে আবেদনকারীপক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বারবার বৃদ্ধি করে তার সুবিধাকে দীর্ঘায়িত করা চেষ্টা করে, আর প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত শুনানির মাধ্যমে মামলার রায় পাওয়ার জন্য একই প্রক্রিয়ায় অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়।

উপরিউক্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন আনা জরুরি। এক্ষেত্রে কমিশনের প্রস্তাব হলো, কোনো মামলায় প্রদত্ত আদেশ (অর্থাৎ, রুল)-এর জবাব দেওয়ার সময়সীমা পার হওয়ার এক বা দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হলে মামলাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ বেঞ্চের কার্যতালিকায় (বেঞ্চ পুনর্গঠিত হলে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোনো বেঞ্চের কার্যতালিকায়) 'মামলা ব্যবস্থাপনা শুনানি'র জন্য অন্তর্ভুক্ত হবে, যাতে করে আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করতে পারেন:

১ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মামলার নোটিশ-জারি সম্পন্ন না হলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান এবং সময়সীমা নির্ধারণ;

২ (প্রযোজ্য হলে) ইতিমধ্যে মামলার প্রাথমিক আদেশ অনুযায়ী নিম্ন-আদালতের নথি উপস্থাপিত না হলে সেই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ও সময়সীমা নির্ধারণ এবং আদালতের প্রশাসনিক কার্যালয় (Section)কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

৩ ইতিমধ্যে মামলায় রুলের জবাব দাখিল না করা হয়ে থাকলে মামলার প্রতিপক্ষদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ;

৪ প্রতিপক্ষ জবাব দিয়ে থাকলে এবং আবেদনকারী পক্ষ তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সে বিষয়ে সময়সীমা নির্ধারণ;

৫ মামলায় কোনো জরুরি বিষয় থাকলে, যেমন, প্রতিপক্ষ অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ বাতিলের আবেদন জানালে, উক্ত বিষয়ে আবেদনকারীপক্ষের আপত্তি এবং আবেদনপত্রটি নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ;

৬ কোনো তৃতীয়পক্ষ যদি মামলার পক্ষভুক্ত হতে চায়, সেক্ষেত্রে তা নিষ্পত্তির জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ;

৭ উপযুক্ত ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা বা সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে, অর্থ্যাৎ বিকল্প পদ্ধতিতে, বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে পক্ষদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা;

৮ পরবর্তী মামলা ব্যবস্থাপনা শুনানির সময় নির্ধারণ, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, মামলার চূড়ান্ত শুনানির সম্ভাব্য তারিখ এবং শুনানির দৈর্ঘ্য নির্ধারণ;

৯ চূড়ান্ত শুনানির তারিখ বিষয়ে আদেশের অংশ হিসেবে পক্ষদের অভিন্ন তথ্যমূলক বক্তব্য (agreed statement of facts) উপস্থাপন এবং তারা যেসব আইন ও নজিরের (case-law) উপর নির্ভর করবে সেগুলোর তালিকাসহ তাদের যুক্তির লিখিত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ;

১০ মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি।

উপরিউক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য হাইকোর্ট রুলস-এর সংশোধন করা আবশ্যক। উক্ত সংশোধনী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট রুলস-এর Chapter IIIA-এর অধীনে এব্যাপারে হাইকোর্ট রুলস-এর প্র্যাকটিস ডিরেকশন জারি করা যেতে পারে।

(৭) মামলার গুণাগুণ বিবেচনা করে রায় প্রদান

বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চূড়ান্ত শুনানির জন্য কোনো মামলা গ্রহণের সময় আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী আদালতে উপস্থিত না থাকলে তা অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ হয় (Dismissed for default), অর্থাৎ, আদালত মামলার গুনাগুনের ভিত্তিতে (on merits) রায় প্রদান করেন না। এর ফলে মামলা খারিজ হওয়ার পরও আবেদনকারী পক্ষ মামলাটি পুনরুদ্ধারের (restore) জন্য আবেদন করার সুযোগ পান, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঞ্জুর হয়। কখনো কখনো মামলা পুনরুদ্ধারের শর্ত হিসেবে স্বল্প পরিমাণ খরচ প্রদানের আদেশ দেয়া হলেও বাস্তবে তা অনুপস্থিতির কৌশলকে নিরুৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট হয় না।

প্রচলিত এই রীতির ফলে আদালতের কর্মঘণ্টারই যে শুধু অপচয় হয় তা নয়, বরং এতে মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হওয়ার ফলে মামলার প্রতিপক্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্যা নিরসনের জন্য কমিশনের প্রস্তাব হলো, প্র্যাকটিস ডিরেকশন জারির মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া, যেন:

(ক) আবেদনকারি বা আপিলকারিপক্ষ চূড়ান্ত শুনানির জন্য মামলা গ্রহনের প্রথম দিন অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী দিনের কার্যতালিকায় বিষয়টিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে আইনজীবীর নাম উল্লেখপূর্বক (বা ব্যক্তিগতভাবে মামলা পরিচালনা করা হলে, তা উল্লেখপূর্বক) শুনানি পরিচালনার শেষ সুযোগ দেওয়া হয়; এবং

(খ) পরবর্তী দিনও আইনজীবীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে এবং, ক্ষেত্রমত, মামলার প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য শুনে, মামলার গুণাগুণের ভিত্তিতে (on merits) রায় প্রদান করা হয়।

(৮) রায় ও আদেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাক্ষর

বর্তমানে রায় বা আদেশ স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা মানা হয় না। যার ফলে বিচারপ্রার্থীদের এবং তাদের আইনজীবীদের অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধিতে কোন রায় ঘোষণার পর সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে তা স্বাক্ষর করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাছাড়া, মামলায় প্রদত্ত আদেশ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমার উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায় কমিশন প্রস্তাব করছে যে, হাইকোর্ট রুলস-এর সংশোধনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সময়সূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো মামলায় প্রদত্ত প্রাথমিক আদেশ (rule) ঘোষণার পর সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং আদেশ ঘোষণার ক্রম অনুযায়ী স্বাক্ষর ও প্রকাশ করতে হবে;

(খ) যেকোনো অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ঘোষণার পর সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে স্বাক্ষর ও প্রকাশ করতে হবে;

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো রায় ঘোষণার পর সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তা স্বাক্ষর ও প্রকাশ করতে হবে;

(ঘ) কোনো বিচারক অবসরে যাওয়ার পূর্বে (প্রয়োজনে বিচারকার্য থেকে বিরত থেকে) তাঁর প্রদত্ত সকল আদেশ ও রায় চূড়ান্ত করবেন ও স্বাক্ষর করবেন। অবসর গ্রহণের পর কোনো বিচারক কোনো রায় বা আদেশ স্বাক্ষর করবেন না। উক্ত বিধান প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপরিউক্ত সময়সীমা অনুসরণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট বিচারককে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

(৯) হাইকোর্ট বিভাগের নজরদারি কমিটির ভূমিকা

হাইকোর্ট রুলস-এর অধ্যায় ১, বিধি ৭বি অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন মামলার বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাঁচজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি নজরদারি কমিটির (monitoring committee) উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং প্রতি পঞ্জিকা বছরে এই কমিটির অন্তত পক্ষে তিনটি সভা করার বিধান রয়েছে। এই কমিটির দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(ক) দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন বিভিন্ন ধরনের মামলার সংখ্যা নিরূপণ করা;

(খ) যে সব মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন সেগুলো সনাক্ত করা এবং সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;

(গ) যে সব মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুত কিন্তু কার্যতালিকায় তালিকাভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;

(ঘ) বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ করা;

(ঙ) মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্যা ও বাধাগুলোকে সনাক্ত করা এবং প্রধান বিচারপতির কাছে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা, ইত্যাদি।

হাইকোর্ট রুলস-এর বিধান অনুযায়ী নজরদারি কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হলে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির সম্ভাবনা তৈরী হবে। এর ফলে আদালতের সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

(১০) হাইকোর্ট বিভাগে অপ্রয়োজনীয় মামলা হ্রাস

হাইকোর্ট বিভাগে কোন মামলায় রুল জারি করার অর্থ হলো একটি নতুন মামলার সৃষ্টি হওয়া, যা সাধারণত কয়েক বছর ধরে বিচারাধীন অবস্থায় থাকে এবং বিদ্যমান মামলাজট বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অথচ, বাস্তবতা হলো যে, আইনজীবীরা অনেক সময় মামলা গৃহীত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করতে সক্ষম না হলেও কেবলমাত্র একটি রুল জারির জন্য আদালতের প্রতি জোর আবেদন জানান। আদালতও অনেক ক্ষেত্রে মামলার সারবস্তু সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও মামলা গ্রহণ করে রুল জারি করেন। এর ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বিচারপ্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে ভুল ধারণার বশবর্তী হন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাদের পক্ষে রায় পাবেন। বাস্তবে, কয়েক বছর অপেক্ষার পর এবং যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করার পর আশানুরূপ ফল না পেয়ে তাদের হতাশ হতে হয়।

আদালতে মামলাজট ও বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ হ্রাস করার স্বার্থে বার ও বেঞ্চ উভয়েরই এই প্রবণতা পরিহার করা জরুরি। নতুন কোনো মামলা গ্রহণ সংক্রান্ত শুনানির সময় মামলার অনুকূলে প্রাথমিকভাবে (*prima facie*) যদি আবেদনকারী বা আপীলকারীপক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করতে সফল না হন, সেক্ষেত্রে আদালতের মামলায় রুল দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে করে একটি অপ্রয়োজনীয় মামলার সৃষ্টি না হয়।

অনুরূপভাবে, রুল জারি হওয়ার পর প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় এবং উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পর আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, পুর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন ব্যতিরেকে এবং অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আদালতের কর্তব্য হবে আবেদনকারী/আপীলকারীর বিরুদ্ধে মামলার খরচ প্রদানের আদেশ (cost order) প্রদান করা। এ ধরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে নামমাত্র খরচ প্রদানের নির্দেশের পরিবর্তে মামলা পরিচালনায় প্রতিপক্ষের নির্বাহ করা প্রকৃত খরচের অনুরূপ অংক পরিশোধের আদেশ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক যথাযথ প্র্যাকটিস ডিরেকশন জারি করা প্রয়োজন।

(১১) আপীল বিভাগের চেম্বার-এ শুনানি ও আদেশ

সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ (অ্যাপিলেট ডিভিশন) রুলস, ১৯৮৮ এর অর্ডার ৫ বিধি ২-এ আপীল বিভাগের চেম্বারে আসীন একক বিচারক কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য বিষয়গুলোর তালিকা সন্নিবেশিত রয়েছে। এ তালিকায় মোট ২৮টি বিষয় উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে চেম্বার বিচারকের কর্মঘণ্টার সিংহভাগ ব্যয় হয় দুই ধরণের বিষয়ে শুনানি ও আদেশ প্রদানের জন্য, যথা: (ক) দেওয়ানী মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিতের আবেদন ও (২) ফৌজদারি মামলায় প্রদত্ত শাস্তি বা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিতের আবেদন।

সাম্প্রতিককালে, চেম্বার বিচারকের দৈনিক কার্যতালিকায় স্থগিতাদেশের আবেদন এত বিপুল সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যে, চেম্বার বিচারকের পক্ষে আবেদনগুলোর গুণাগুণ যথাযথভাবে পরীক্ষা করে একটি ভারসাম্যপূর্ন সিদ্ধান্তে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, চেম্বার বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আপীল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চ কর্তৃক বহাল রাখারও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায় বা আদেশের ব্যাপারে আপীল বিভাগের চেম্বার বিচারক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও, কার্যপদ্ধতিগত কারণে ও বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের এই প্রক্রিয়ার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কমিশনের কাছে অংশীজনদের প্রদত্ত মতামতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে।

চেম্বার বিচারক পর্যায়ে মামলা পরিচালনার আরেকটি পদ্ধতিগত সমস্যা হচ্ছে যে, স্থগিতাদেশের আবেদনের উপর একতরফাভাবে, অর্থাৎ, শুধুমাত্র আবেদনকারী পক্ষের বক্তব্য শুনে, আদেশ প্রদানের সুযোগ। চেম্বার বিচারকের কাছে উপস্থাপিত প্রতিটি আবেদনই হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা আদেশ থেকে উদ্ভুত হলেও, আপীল বিভাগে কেভিয়েট (caveat) দাখিল না করা হলে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনাকারী প্রতিপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য না শুনেই চেম্বার বিচারক স্থগিতাদেশ দিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বা রায়ের ব্যাপারে একটি কেভিয়েট দাখিল থাকা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট বিভাগের কার্যধারায় অন্তর্ভুক্ত একাধিক প্রতিপক্ষের মধ্য থেকে অন্য কোনো পক্ষ চেম্বার বিচারকের কাছ থেকে একতরফাভাবে আদেশ নিয়ে থাকেন।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য সংস্কার কমিশন অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস-এর সংশোধনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছে:

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের কোন আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের চেম্বার বিচারক বা নিয়মিত বেঞ্চ কর্তৃক আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিপক্ষের যে আইনজীবী মামলা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁকে নোটিশ দিতে হবে। আপীল বিভাগে কেভিয়েট (caveat) দাখিলের বিধান বিলোপ করতে হবে।

(খ) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা রায়ের কার্যকারিতার বিষয়ে সাধারণত আপীল বিভাগের চেম্বার বিচারক স্থগিতাদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকবেন এবং এ ধরণের বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত বেঞ্চে প্রেরণ করবেন। শুধুমাত্র অতিজরুরি কোন কারণ থাকলে (যেমন, মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা দোষী-সাব্যস্ত ব্যক্তির খালাস বা জামিন, উচ্ছেদের আদেশ, ইত্যাদি) তা উল্লেখপূর্বক চেম্বার বিচারক একটি সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে পারবেন, তবে আপীল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে স্থগিতাদেশের আবেদন আবার নতুনভাবে বিবেচনা করা হবে, এবং এক্ষেত্রে চেম্বার বিচারক প্রদত্ত আদেশ বা আদেশদানে অসম্মতি নিয়মিত বেঞ্চের বিবেচ্য হবে না।

(১২) খরচের আদেশ দেওয়ার প্রচলন

আপীল বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশ জুড়ে থাকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতির আবেদন (লিভ আবেদন) এর শুনানি। এই আবেদনগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য দুর্বল আইনগত ভিত্তির উপর নির্ভও করে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আবেদনকারী পক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে তার মামলার পক্ষে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করে অসফল হয়েছিলেন, সেগুলো প্রায় হুবহু আকারে আপীল বিভাগে দায়ের করা লিভ আবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ, হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা আদেশের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কি আইনগত যুক্তিতে আপীল দায়েরের অনুমতি প্রদান করা উচিৎ, সেই ব্যাপারে লিভ আবেদনে অনেক ক্ষেত্রেই কোন বক্তব্য থাকে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয়, সেগুলো বিচার্য বিষয়ের নিরিখে বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য হওয়ার মতো না। অথচ, এই ধরণের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ আদালতের বিপুল কর্মঘণ্টা ব্যয় হয়।

সুতরাং, এই ধরণের অপ্রয়োজনীয় লিভ আবেদন শুনানির ক্ষেত্রে আপীল বিভাগ কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদন খারিজ করার পাশাপাশি খরচের আদেশ দেয়ার রীতি প্রচলন করা প্রয়োজন, যাতে করে দুর্বল আইনগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে লিভ আবেদন দায়ের করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

(১৩) লিভ পিটিশন ও রিভিউ পিটিশনের অজুহাতে সময়ক্ষেপণ

আপীল বিভাগে বিচারাধীন লিভ পিটিশনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত না থাকা সত্ত্বেও এই অজুহাতে প্রায়ই রায় বা আদেশ বাস্তবায়নে গড়িমসি পরিলক্ষিত হয়। একই ভাবে রিভিউ পিটিশন বিচারাধীন থাকার অজুহাতে, আপীল বিভাগ প্রদত্ত রায় বা আদেশের বিষয়ে কোন স্থগিতাদেশ না থাকলেও, তা কার্যকর ও বাস্তবায়ন না করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতি বিচার বিভাগের কার্যকরতার পরিপন্থী এবং বিচারপ্রার্থীদের হতাশা ও দুর্ভোগের অন্যতম কারন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে আপীল বিভাগের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে আপীল বিভাগ কোন বিচারিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অথবা অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস সংশোধনের মাধ্যমে তার নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। এমনকি সাধারণভাবে সুপ্রীম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রকৃতি ও বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

(১৪) আপীল বিভাগে আইনজীবী নিবন্ধন

অধস্তন আদালত ও হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত আইনজীবীদের নিবন্ধনের এখতিয়ার বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। লিখিত ও মৌখিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বার কাউন্সিল আইনজীবীদের এই দুই পর্যায়ে নিবন্ধন দিয়ে থাকে। আপীল বিভাগ যেহেতু দেশের উচ্চতম আদালত এবং সেখানে আইনের উচ্চতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেহেতু আপীল বিভাগে আইনজীবী নিবন্ধনের দায়িত্ব আপীল বিভাগের উপরই অর্পিত রয়েছে। এছাড়া আপীল বিভাগে মামলা দায়ের থেকে শুরু করে কার্যধারার বিভিন্ন পর্যায়ে অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ডদের ভূমিকা অপরিহার্য। ফলে তাঁদের নিবন্ধনও আপীল বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত।

অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস-এর অর্ডার ৪ এ সিনিয়র এ্যাডভোকেট, আপীল বিভাগে মামলা পরিচালনাকারী এ্যাডভোকেট এবং এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ডদের নিবন্ধন সম্পর্কে বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। আপীল বিভাগের এ্যাডভোকেট হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নিম্নরূপ যোগ্যতা উল্লিখিত হয়েছে:

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের এ্যাডভোকেট হিসাবে নিবন্ধনের মেয়াদ ন্যূনতম পাঁচ বছর হতে হবে;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকবৃন্দ কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যয়ন থাকেতে হবে যে আবেদনকারী আপীল বিভাগে মামলা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত।

তবে, হাইকোর্ট বিভাগের কতজন বিচারকের ইতিবাচক প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে তার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত এই বিধিমালায় নেই। আপীল বিভাগের নিবন্ধন কমিটি উপরিউক্ত বিষয়গুলোর অতিরিক্ত আর কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করে আপীল বিভাগের এ্যাডভোকেটদের নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করবেন সেটাও বিধিমালায় উল্লিখিত হয়নি।

অনুরূপভাবে, এ্যাডভোকেট–অন–রেকর্ড হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্যতা হিসাবে হাইকোর্ট বিভাগে তিন বছর সহ আপীল বিভাগের অধস্তন আদালতে নিবন্ধনের মেয়াদ মোট সাত বছর হওয়া এবং কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করা হলেও যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে কি কি মানদণ্ড প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে কোন বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট হিসেবে নিবন্ধনের যোগ্যতা বা বিবেচ্য বিষয় সমন্ধে কোন বিধানই উক্ত বিধিমালায় উল্লিখিত হয়নি।

অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস–এর উপরিউক্ত অস্পষ্টতা এবং নিবন্ধন কমিটি কর্তৃক নিবন্ধনের আবেদন নিস্পত্তির সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলোর কারণে নিবন্ধনের বিদ্যমান প্রক্রিয়া নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে, যা সংস্কার কমিশনের কাছে প্রদত্ত মতামতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং, এই বিষয়ে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস সংশোধন করে আপীল বিভাগে এ্যাডভোকেট, এ্যাডভোকেট–অন–রেকর্ড এবং সিনিয়র এ্যাডভোকেট হিসেবে নিবন্ধনের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যাতে করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা ও অন্যান্য ভূমিকা পালনের জন্য বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও প্রশ্নাতীত প্রক্রিয়ায় আইনজীবীদের নিবন্ধন প্রদান করা হয় ।

(১৫) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলায় ম্যানুয়াল তৈরি ও প্রকাশ

সুপ্রীম কোর্টের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আইন হিসাবে গৃহীত না হলেও বাস্তবে অনুসৃত Appellate Division Rules, 1988, High Court Division Rules, 1973, Rules of Business of the Judicial Department, Appellate Side High Court, Calcutta, 1924– এই তিনটি আইন/বিধিমালার সবগুলোই ইংরেজিতে লেখা এবং দীর্ঘ বর্ণনাযুক্ত। সে কারণে বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল অংশীজন এগুলো ভালোভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে বিচার প্রশাসনে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ম্যানুয়াল তৈরি করে তা সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করতে হবে যেন বিচারক, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ বিচার প্রার্থী জনগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা

১. ভূমিকা

বর্তমানে বিচারাধীন প্রায় ৪৩ লাখ মামলার অধিকাংশ (প্রায় ৩৮ লাখ) নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে অধস্তন আদালতে। এসব মামলা নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে নানাবিধ আইন, বিভিন্ন স্তরের আদালত ও জনবল। কিন্তু এত আয়োজন থাকা সত্ত্বেও এগুলোর সুসমন্বিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে ত্রুটি, যা আদালত ব্যবস্থাপনার একটি দুর্বল দিক। সুতরাং, এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আলোকপাত ও কিছু সুপারিশ করা হলো।

২. আদালত ব্যবস্থাপনার উপাদান

মামলার উৎস, মামলা দায়ের, ব্যবস্থাপনা, বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিকতা, বিচার ব্যবস্থায় ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইত্যাদির নিরিখে আদালত ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট আইন চিহ্নিতকরণ;
(খ) বিচারিক কার্যক্রম;
(গ) জনবল;
(ঘ) অবকাঠামো;
(ঙ) সরঞ্জাম; এবং
(চ) আদালত কক্ষ ও প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দায়িত্বপালনকারী অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।

নিচে এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

৩. দৈনন্দিন বিচারিক কার্যক্রম বিষয়ক ব্যবস্থাপনা

অধস্তন আদালতের বিচার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক বিচারককে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যথা:

(ক) মামলা দাখিল পর্যায়ে বিচারক কর্তৃক নিরীক্ষণ

প্রত্যেক বিচারকের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দাখিল পর্যায়ে মামলা নিরীক্ষণ পূর্বক মামলাটি রক্ষণীয় বা গ্রহণ করার পর তা চালু রাখা যাবে কিনা সে বিষয়টি সবার আগে নির্ণয় করা। বর্তমানে দেওয়ানি মামলায় সেরেস্তাদার একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং বিচারক উক্ত প্রতিবেদনের সঠিকতা যাচাই না করেই তা অনুমোদন করেন। কিন্তু আইন বিষয়ে সেরেস্তাদারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান না থাকায় তার পক্ষে মামলাটি আইনগতভাবে রক্ষণীয় কিনা তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাই, বিচারক কর্তৃক কোনো মামলা পরবর্তী ধাপে অগ্রবর্তী করার আগে মামলাটির 'রক্ষণীয়তা' সংশ্লিষ্ট দিকগুলো নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনে শুনানি গ্রহণ করে অরক্ষণীয় মামলাগুলো খারিজ করার আদেশ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে করে আইন অনুযায়ী বারিত মামলা আদালতে চলমান থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ও ২০৩ ধারার এখতিয়ার প্রয়োগ করবেন যেন এখতিয়ার বহির্ভূত বা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করা না হয়।

(খ) ডায়রী ও কজলিস্ট

কার্যকর মামলা ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কজলিস্ট। প্রচলিত হার্ডকপি ভিত্তিক কজলিস্টের পাশাপাশি প্রত্যেক আদালতের একটি ডিজিটাল কজলিস্ট সংরক্ষণ করা এবং সঠিক তথ্যসহ তা প্রতিদিন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা জরুরি। যেহেতু কাগজের তৈরি কজলিস্ট আদালতে সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেহেতু যতদিন না আইন সংশোধিত হচ্ছে, ততদিন ডিজিটাল কজলিস্টে সমস্ত মামলার এন্ট্রি প্রদানের পর দিন শেষে তার একটি হার্ডকপি প্রিন্ট দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে যেন আইনী বাধ্যবাধকতা পূরণ হয়।

বিচারক প্রতিদিনের কজলিস্ট নিজে তদারক করবেন এবং মামলার রায় ও আদেশের সারসংক্ষেপ ঠিকমতো কজলিস্টে লেখা হয়েছে কি না সে বিষয়টি নিশ্চিত করা সহ মামলার পরবর্তী তারিখ নিজে নির্ধারণ করে তা কজলিস্টে উল্লেখের ব্যবস্থা নিবেন। কজলিস্টের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ের ফলাফলের ঘর ফাঁকা রাখা যাবে না।

সুপারিশ

১. জেলা পর্যায়ের আদালতের ওয়েব সাইটে ডিজিটাল কজলিস্ট সংরক্ষণ ও প্রকাশের বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগ রুলস এর অধ্যায় IIIB এর বিধি ১ অনুসারে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন জারি করতে হবে।
২. আদালতের ডায়রিতে প্রতিদিন শুনানির জন্য ততগুলো মামলা রাখতে হবে যতগুলোর শুনানি করা বা সাক্ষ্যগ্রহণ করা একজন বিচারকের পক্ষে সম্ভব।

(গ) দৈনিক নথি প্রাপ্তি

কোনো নির্দিষ্ট দিনে শুনানির জন্য কজ লিস্টে উল্লিখিত মামলার নথি আগের দিন সেরেস্তা বা অন্যত্র থেকে প্রাপ্তি এবং তা আদালতে উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি বিচারককে নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে যে মামলায় উচ্চ আদালত হতে নথি তলব দেয়া হয়, তা অনতিবিলম্বে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে বা অপরিহার্য বিলম্ব হলে কারণ উল্লেখ পূর্বক তা উচ্চ আদালতে প্রেরণের এবং উচ্চ আদালত হতে শুনানি শেষে উক্ত নথি বিচার আদালতে ফেরত আসলো কিনা সে বিষয়টি বিচারককে যথাযথভাবে তদারকি করতে হবে যেন; এই কারণে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি না হয়।

সুপারিশ

এ বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগ রুলস এর অধ্যায় IIIB এর বিধি ১ অনুসারে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন জারি করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি নথি বিষয়ে উন্মুক্ত আদালতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও জারি

আদালতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিচারককে ঈড়ফব ড়ভ ঈরারষ চৎড়পবফঁৎব, ঈড়ফব ড়ভ ঈৎরসরহধষ চৎড়পবফঁৎব, ঈরারষ জঁষবং ধহফ ঙৎফবৎং এবং ঈৎরসরহধষ জঁষবং ধহফ ঙৎফবৎং সহ অন্যান্য আইনের নির্দেশনার আলোকে প্রতিটি মামলায় প্রদত্ত রায় ও আদেশ উন্মুক্ত এজলাস কক্ষে ঘোষণা করতে হবে।

(ঙ) প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত সন্ধ্যা ৬.০০ টায় ওয়েব সাইটে প্রকাশ

বিচার প্রার্থীদের মামলার ফলাফল জানার অধিকার রয়েছে। তাই জনগণ যেন আদালতে না গিয়েও ঘরে বসে তাদের মামলার ফলাফল জানতে পারেন সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত হবার সাথে সাথে ডিজিটাল কজলিস্টে মামলার ফলাফল উল্লেখপূর্বক তা জেলা আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং ওই একই দিন সন্ধ্যা ছটার মধ্যে রায় বা আদেশের পিডিএফ কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

(চ) প্রসেস জারি ও রেকর্ডভুক্ত করা

বিচার প্রক্রিয়ায় এটি একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মামলার আরজি/ দরখাস্ত/ অভিযোগ দাখিল এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে শুনানির পরের বিষয়টি হচ্ছে প্রসেস জারি। এ প্রক্রিয়ায় বাদী/ অভিযোগকারী কর্তৃক রিকুইজিট বা প্রয়োজনীয় সমন, নোটিশ, আরজি/দরখাস্তের সংক্ষিপ্তসারসহ আইন নির্ধারিত খরচ দাখিল করার পর প্রসেস জারি করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত তিনটি পদ্ধতি হচ্ছে আদালতের জারিকারক, রেজিস্টার্ড পোস্ট এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রসেস জারি করা। এসব পদ্ধতি ছাড়াও যথাযথ মামলায় যেমন চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্য প্রকৃতির মামলায় ইমেইলের মাধ্যমে নোটিশ জারির বিধান যোগ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রসেস জারির ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে পোস্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৩৭ (২) এর বিধান অপ্রতুল ও অস্পষ্ট। কুরিয়ার সার্ভিসের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কেও সিপিসি তে বিধান নাই। তাই এই সকল আইন সংশোধন করে প্রসেস জারির পদ্ধতি সহজ করতে হবে এবং যারা প্রসেস জারির সাথে যুক্ত থাকবেন, তাদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ

১. দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।
২. দেওয়ানি কার্যবিধি ও পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ সংশোধনক্রমে রেজিস্টার্ড পোস্ট বিষয়ে ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন প্রদানসহ ডাক বিভাগের অন্যান্য দায়িত্ব বিষয়ে বিধান করতে হবে।
৩. সুপ্রীম কোর্ট থেকে জারিকারকদের দায়িত্ব বিষয়ে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন ইস্যু করতে হবে ।
৪. জারিকারকদের জন্য মান সম্মত টিএ/ডিএ এর ব্যবস্থা করতে হবে বা বিকল্প হিসেবে পক্ষগণ কর্তৃক জারিকারকদের খরচ জমা দেওয়ার বিষয়ে বিধান করতে হবে।

(ছ) অন লাইনে সরকারি সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

বর্তমানে আইন সংশোধনের মাধ্যমে অনলাইনে সাক্ষ্য গ্রহণকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এতে করে যে সকল মামলার গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সাক্ষীগণ তাদের সরকারি দায়িত্ব ফেলে দূরবর্তী স্থান হতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির হতে পারেন না, তাদের সাক্ষ্য অনলাইনে গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই প্র্যাকটিস কিছু কিছু আদালতে শুরু হয়েছে। তাই ফৌজদারি মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং ডাক্তার সাক্ষীর সাক্ষ্যসহ শতভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি কর্মচারি সাক্ষ্য সুপ্রীম কোর্টের গাইড লাইন অনুসারে অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) নকল প্রাপ্তি

উচ্চ আদালতে আপিল করা সহ অন্যান্য অনেক কারণে বিচারপ্রার্থীদের মামলার রায় বা আদেশ বা অন্য কোন দলিলের নকল প্রয়োজন হয়। আইনের বর্তমান বিধান হচ্ছে নির্ধারিত ফোলিওতে মূল রায় বা আদেশ ফটোকপি করে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তা প্রত্যায়িত করা হলেই সেটি নকল হিসেবে গৃহীত হবে। এরূপ ব্যবস্থায় ত্বরিত নকল প্রদান করা সম্ভব এবং তাতে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। নকলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারককে এ বিষয়টি তদারকি করতে হবে যেন দ্রুততম সময়ে বিচারপ্রার্থী জনগণ সরকার নির্ধারিত খরচে নকল সরবরাহ পেতে পারেন ।

(ঝ) রেকর্ডরুমে নথি প্রেরণ

অনেক সময় আদালতে মামলার কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরেও নথি সময় মতো রেকর্ডরুমে প্রেরণ করা হয় না। ফলে রেকর্ড রুমে নথি ব্যবস্থাপনায় একটি জটের সৃষ্টি হয়, যার ফলে পরবর্তীকালে সহজে প্রয়োজনীয় নথি খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সমস্যা দূর করার জন্য বিচার আদালতে নথির কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করতে হবে এবং রেকর্ডরুমে সেটি যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারককে প্রতিনিয়ত তদারক করতে হবে।

৪. জনবল, অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদি

(ক) পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং উহার সঠিক ব্যবহার

বিচার ব্যবস্থায় ভূমিকা পালনকারী গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে– ১. বিচারক, ২. আইনজীবী, ৩. বিচারের পক্ষগণ, ৪. আদালতের সহায়ক জনবল, ৫. তদন্ত সংস্থা এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং ৬. আইনজীবী সহকারিগণ।

এদের মধ্যে দেশের সকল স্থানে পর্যাপ্ত আইনজীবী ও আইনজীবী সহকারি থাকলেও বিচারক, সহায়ক জনবল, তদন্ত সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ঘাটতি থাকায় অনেক সময় মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। তবে আইনজীবীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততা একইভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। একই সমস্যা রয়েছে আইনজীবী সহকারিদের বিষয়েও।

এ অবস্থায় প্রতিটি আদালতে মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে বিচারকসহ যোগ্যতার ভিত্তিতে সহায়ক জনবল নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও দেশের প্রতিটি আদালতে ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে সাপোর্ট প্রদানের জন্য এ সংক্রান্ত পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের উক্ত পদে নিয়োগ করতে হবে।

সুপারিশ

১. আইনজীবীদের সনদ প্রাপ্তির পদ্ধতির উন্নয়ন;
২. দেশের প্রতিটি আদালতে প্রোগ্রামারসহ অন্যান্য আইটি স্পেশালিস্ট এর পদ সৃজন এবং উক্ত পদে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান;
৩. আইনজীবী সহকারিদের আইনী স্বীকৃতিসহ যোগ্যতা নির্ধারণ এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) জনবলের দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ

প্রতিটি আদালতে পেশকার, সেরেস্তাদার, জারিকারক, নকলনবিস, পিয়ন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার এক বা একাধিক সহায়ক কর্মচারি কাজ করে। দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তি প্রায় সব কাজে অংশগ্রহণ করছে, আর কাউকে কাউকে কোন কাজেই পাওয়া যাচ্ছে না। সহায়ক জনবল তাদের কর্মদক্ষতার সবটুকু যেন বিচার প্রশাসনের কাজে ব্যয় করেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে ডিউটি কার্ড তৈরি করে তাদের কর্মস্থলে রাখতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে আরো কর্মদক্ষ করার জন্য সময় সময়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(গ) আদালতে জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (JAO) এর পদ সৃষ্টি

দেশের বিভিন্ন আদালতে কাজের পরিমাণ ও ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। কোনো কোনো আদালতে বিশেষ করে বিভাগীয় এবং বড় শহরগুলোতে প্রচুর মামলা সমনজারিসহ চূড়ান্ত শুনানির পূর্বের বিভিন্ন স্তরে দীর্ঘদিন আটকে থাকে। আবার ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আদালতে সাক্ষী ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সকল বিষয় দেখভাল করার জন্য আদালতের যে সকল সহায়ক কর্মচারি কাজ করেন, তারা যথেষ্ট পারদর্শী নন বিধায় প্রতিটি কাজে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। আবার সহায়ক জনবলের কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে জাজ ইনচার্জ নেজারতসহ অন্যান্য যে সকল বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা কাজ করেন, তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আদালতের

বিচারিক কাজ শেষে এসব বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়। সুতরাং তাঁরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এই কারণে যে সকল জেলায় মামলাজটের পরিমাণ বেশি সেকল জেলায় Judicial Administrative Officer (JAO) এর পদ সৃষ্টি করে সেখানে সিনিয়র সহকারি জজ/সহকারি জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে যারা বিচার কাজ করবেন না, কিন্তু সাক্ষী ব্যবস্থাপনাসহ আদালত ব্যবস্থাপনার অন্যান্য প্রশাসনিক দিক সরাসরি তদারকি করবেন। প্রয়োজন বোধে যে সকল মামলা বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিচার আদালত মনে করবেন, সে সব মামলা এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য JAO এর কাছে পাঠানো যেতে পারে। কাজের পরিমাণ ভেদে একটি জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসিতে এক বা একাধিক JAO এর পদ সৃষ্টি করতে হবে। এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি ছাড়াও JAO নিম্নোক্ত দপ্তরগুলোর কাজের তদারকি করবেন:

(অ) নেজারত
(আ) নকল খানা
(ই) মালখানা
(ঈ) রেকর্ডরুম
(উ) হাজতখানা
(ঊ) জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসির প্রধান কর্তৃক আরোপিত প্রশাসনিক প্রকৃতির অন্যান্য দায়িত্ব

উল্লেখ্য যে, পদ সৃজন একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই যতদিন না পদ সৃজন হচ্ছে, ততদিন যে সকল জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসিতে JAO এর প্রয়োজন আছে মর্মে চিহ্নিত করা হবে, সেকল স্থানে JAO পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রথমে অফিসারকে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করতে হবে। অতঃপর সেই সংযুক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসিতে JAO এর দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যস্ত করতে হবে। অফিসারের বেতন-ভাতা আইন ও বিচার বিভাগ হতে হবে। এভাবে JAO পদে নিয়োগের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা

জেলা পর্যায়ের অনেক আদালতে অবকাঠামোগত স্বল্পতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারকদের এজলাস ভাগাভাগি করতে হয়। এ সমস্যা সমাধানে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

(ঙ) পর্যাপ্ত অফিস সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা

দেশের বিভিন্ন আদালতে অনেক সময় বিভিন্ন ফরম, অর্ডারশীট, সাক্ষ্য রেকর্ডকরণের ফরমসহ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদির ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি যেন কখনো সৃষ্টি না হয়, সে জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে যেন এসব অফিস সরঞ্জামাদির মজুত শেষ হওয়ার পূর্বেই তা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৫. আদালতের রেজিস্টার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

অধস্তন প্রতিটি আদালতে স্যুট রেজিস্টারসহ বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়। এই রেজিস্টারগুলো হাতে লিখে পূরণ করা হয়। হাতে লিখে পূরণ করতে যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনি হাতের লেখা অনেক সময় অস্পষ্ট হওয়ার কারণে তথ্যগুলো পরবর্তীতে বুঝতে অসুবিধা হয়। এ কারণে ডিজিটাইজেশনের এ যুগে যেখানে ভূমি ব্যবস্থাপনার অনেক কিছুই ডিজিটাইজড হয়ে গিয়েছে, সেখানে আদালতে হাতে লেখা রেজিস্টারের প্রচলন বিচার ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে একটি সুস্পষ্ট বাধা। তাই আদালতে সংরক্ষণযোগ্য রেজিস্টারগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে যেন একটি প্রধান রেজিস্টার (যেমন স্যুট রেজিস্টার) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যান্য রেজিস্টারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। এতে বিভিন্ন রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় তথ্য খুব কম সময়ে ইনপুট দেওয়া এবং সময়মত তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আইনের বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রয়োজনে প্রতিদিন রেজিস্টারে তথ্য ইনপুট দেওয়ার পর তা প্রিন্ট করে বাধাই ভলিউম এ সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. সিকিউরিটি/মার্শাল সার্ভিসের প্রচলন

আদালতের নিরাপত্তা বিধান এবং উহার রায় ও আদেশ কার্যকর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের অনুকরণে অধস্তন আদালতে মার্শাল সার্ভিসের প্রচলন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জেলা জজ ও সিজেএম এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পুলিশের একটি চৌকস দল প্রতিটি আদালতে নিয়োগ করতে হবে যাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বা এসিআর জেলা জজ বা সিজেএম এর হাতে থাকবে। মার্শাল সার্ভিসে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যগণ বিচারকগণের নিরাপত্তা বিধানসহ মামলার রায় ও আদেশ বাস্তবায়নে আদালতের নির্দেশ মত কাজ করবে।

এ ব্যবস্থা চালুর ফলে একদিকে আদালতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি জারি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে।

সুপারিশ

আদালতের জনবল কাঠামোতে সিকিউরিটি/মার্শাল সার্ভিসের কর্মচারিগণকে সংযোজন করতে হবে।

৭. অবকাঠামো এবং স্থানের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

অধস্তন আদালতের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিটি অবকাঠামো এবং স্থানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে:

(ক) অফিস: প্রত্যেক বিচারকের একক ব্যবহারের জন্য আলাদা অফিসকক্ষ থাকবে। বিচার কাজে প্রয়োজন হয় এমন বইপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি তথা কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রতিটি অফিস কক্ষে থাকতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি আদালতে সহায়ক কর্মচারিদের জন্য আলাদা অফিস রুম থাকতে হবে।

(খ) বিচারকের চেম্বার ও আদালত কক্ষ: প্রত্যেক বিচারকের জন্য আলাদা চেম্বার ও সংযুক্ত আদালত কক্ষ থাকতে হবে। আদালত কক্ষে আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী জনগণের বসার সুব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি আদালতের কার্যক্রম সিসিটিভির আওতাভুক্ত থাকতে হবে এবং আইনে বর্ণিত কারণে প্রয়োজন না হলে আদালতের সকল কার্যক্রম হবে উন্মুক্ত। আদালত কক্ষে সাক্ষীদের বসার এবং দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত নির্দোষ প্রতীয়মান হতে পারে এমন সুবিধাসম্বলিত ব্যবস্থা আসামীদের জন্য রাখতে হবে।

এছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সাক্ষ্য রেকর্ড করার সুবিধা সকল আদালতে প্রদান করতে হবে যেন, বিচারক চাইলে হাতে সাক্ষ্য রেকর্ড না করে কম্পিউটারে টাইপ করার মাধ্যমে সাক্ষ্য রেকর্ড ও তা প্রিন্ট করতে পারেন।

(গ) নেজারত: প্রতিটি জজশিপ/ ম্যাজিস্ট্রেসির নেজারতের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংরক্ষিত রাখতে হবে।

(ঘ) নকলখানা: প্রতিটি আদালতের নকলখানা এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হবে যেন, নকলখানায় কর্মরতদের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। নকলখানায় বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিদিনের জমা পড়া নকলের দরখাস্তের সংখ্যা এবং সরবরাহকৃত নকলের সংখ্যা একটি প্রকাশ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) রেকর্ড রুম: প্রতিটি জজশিপ/ম্যাজিস্ট্রেসী এবং ট্রাইব্যুনালে রেকর্ডরুমের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উক্ত রেকর্ডরুমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের মাধ্যমে মামলার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। রেকর্ডরুম ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রয়োজনে সফটওয়ার ব্যবহার করতে হবে।

(চ) মালখানা: অনেক আদালতে মালখানায় যথাযথভাবে আলামত না রাখার ফলে সময়মত সেগুলো আদালতে উপস্থাপন করা যায় না। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য প্রতিটি মালখানায় সুশৃঙ্খলভাবে

আলামত সাজিয়ে রাখা এবং সময়মত তা আদালতে উপস্থাপন করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

(ছ) কোর্ট হাজত: কোর্ট হাজতে আসামীদের বসার জন্য আসনের সুব্যবস্থা রাখা এবং পান করার জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া সম্ভব হলে কোর্ট হাজতে হাজতীদের পড়ার জন্য বিভিন্ন উপদেশমূলক বই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) ইনফরমেশন ডেস্ক: প্রতিটি জেলার জজশীপে ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে কমপক্ষে একটি ইনফরমেশন ডেস্ক থাকতে হবে যন বিচারপ্রার্থী জনগণ আদালতে এসে তাঁদের কাঙ্খিত তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

(ঝ) সাক্ষীর বসার জায়গা: বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাক্ষী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে অনেক সময় সারাদিন অপেক্ষা করে সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াই সাক্ষীরা আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে। এতে বিচার বিলম্বিত হয়। এই অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রতিটি আদালতে সাক্ষীদের বসার সুর্নির্দিষ্ট স্থান সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত বসার স্থানে সুপেয় খাবার পানিসহ শৌচাগার ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ঞ) ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও মহিলাদের বসার ব্যবস্থা: বিচারের জন্য আদালতে আসা মানুষদের একটি বড় অংশ মহিলা। অনেকের সাথে দুগ্ধপোষ্য শিশুও থাকে। শুনানির জন্য অনেক সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আদালত প্রাঙ্গলে অপেক্ষা করতে হয়। অথচ আদালতে মহিলাদের জন্য বসার এবং কোনো কোনো আদালতে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার এর ব্যবস্থা নেই। সুষ্ঠু আদালত ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে প্রতিটি আদালতে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, শৌচাগার এবং মহিলাদের বসার সুব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সময়ের সদ্ব্যবহার

অধস্তন আদালতের বিচারকদের মাথার ওপর যে বিপুল পরিমাণ মামলা জট আকারে অবস্থান করছে তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিনের কর্মঘণ্টার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিচারক ও আইনজীবীগণকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে:

(ক) সকলকে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আগমন করতে হবে;
(খ) নির্দিষ্ট সময়ে বিচারক ও এ্যাডভোকেটদের আদালতে আসন গ্রহণ করতে হবে;
(গ) অন্য আদালতে ব্যস্ততার কারণে আইনজীবীদের অতিরিক্ত সময় প্রদান না করা যাবে না;
(ঘ) আইনে বর্ণিত এজলাস সময়ে বিচারকদের বিচারকাজ বা রায় লেখা ব্যতীত অন্য কোনো কাজে প্রবৃত্ত না হওয়া;
(ঙ) কোনো আইনজীবী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর সম্মানে আদালতের কাজ মুলতবি না রেখে সকল প্রয়াত আইনজীবীর স্মরণে বছরের শেষে সম্ভব হলে দেওয়ানি অবকাশের প্রথম দিন স্মরণ সভা করতে হবে যেন বিচারপ্রার্থী জনগণের বিচার লাভে এরূপ স্মরণ সভা কোনো বাধার সৃষ্টি না করে।

৯. আদালত পরিদর্শন

জেলা জজ এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিটি জেলায় নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে। তাদের অধীনস্ত প্রতিটি আদালত নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং বিচারকের কার্যাবলি তদারকি করতে হবে। আদালত পরিদর্শনে প্রাপ্ত ভুল ত্রুটি সংশোধনে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে সেটা সংশোধিত হয়েছে কি না মনিটরিং করতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেক বিচারক মাসে একদিন নিজ আদালত পরিদর্শন করবেন।

১০. মাসিক, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সময়মত প্রেরণ

প্রচলিত আইন ও বিধিতে যেরূপভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য আদালতে প্রেরণের কথা উল্লেখ আছে, সেভাবে প্রতিটি আদালতকে উক্ত রিপোর্টগুলো নির্ভুল তথ্যসহ সঠিক সময়ে প্রেরণ

করতে হবে। প্রেরিত তথ্য ও রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কর্তৃপক্ষের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আদালতকে জানাতে হবে যেন একই ভুল-ত্রুটি বারংবার না হয়।

১১. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলায় ম্যানুয়াল তৈরি ও প্রকাশ

Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Civil Rules and Orders এবং Criminal Rules and Orders – এই চারটি আইন/বিধিমালার সবগুলোই ইংরেজিতে লেখা এবং দীর্ঘ বর্ণনা যুক্ত হওয়ায় বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল অংশীজন এগুলো ভালোভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে বিচার প্রশাসনে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ম্যানুয়াল তৈরি করে তা অধস্তন আদালতে সরবরাহ করতে হবে যেন বিচারক, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ বিচারপ্রার্থী জনগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

১২. আদালত প্রাঙ্গনের সিকিউরিটি

আদালত প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন মামলায় পক্ষগণ কর্তৃক যে সমস্ত মূল দলিল দাখিল করা হয় তা আদালতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। এছাড়াও ফৌজদারি মামলায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট আদালতে সংরক্ষিত থাকে। এ সমস্ত ডকুমেন্ট হারিয়ে গেলে বা কোনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তা বিচারপ্রার্থী জনগণের অধিকার বিনষ্ট করতে পারে। তাই আদালতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপরে বর্ণিত মার্শাল সার্ভিস চালু করাসহ আদালতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ও নাইটগার্ড নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্পূর্ণ আদালত প্রাঙ্গণ সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখতে হবে।

এছাড়াও আদালত কক্ষের বারান্দা ও খোলা জায়গায় যত্রতত্র অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র/আসবাব ফেলে না রেখে সেগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন করতে হবে। আইনজীবী, তাদের সহকারিগণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আদালত প্রাঙ্গণের একটি নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করতে হবে যেন তাদের অপ্রয়োজনীয় সরব উপস্থিতি বিচারকার্যকে কোনোভাবে ব্যাহত না করে।

১৩. আদালতের পরিচ্ছন্নতা

অনেক সময় আদালতের পরিছন্নতার দিকে যথাযথভাবে নজর দেওয়া হয় না। ফলে সাধারণভাবে আদালতের সামনের অংশে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা বা অপ্রয়োজনীয় কাগজের টুকরা ফেলে রাখা হয়, যা বিচারক বা বিচারপ্রার্থী জনগণের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ কারণে আদালত প্রাঙ্গণ সব সময় ময়লা আবর্জনা মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সম্ভব হলে আদালতের খোলা স্থানে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ফুলের গাছ লাগাতে হবে।

এছাড়াও বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যেন সাধারণের ব্যবহারের জন্য আদালত প্রাঙ্গণে নির্দিষ্টকৃত শৌচাগার নোংরা না থাকে এবং মহিলাদের ব্যবহারের জন্য মানসম্মত আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে।

১৪. কারাগার পরিদর্শন

অধস্তন আদালতের বিচারকগণ সময়ে সময়ে কারাগার পরিদর্শন করবেন এবং এটা নিশ্চিত করবেন যে হাজতী আসামিগণকে যেন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের হতে আলাদা রাখা হয়। মামলা ছাড়া কোন ব্যক্তি যেন হাজতে না থাকে এবং জামিন প্রাপ্ত আসামী বা কারাদণ্ড ভোগ শেষ হওয়ার পরে কেউ যেন কারাগারে অবস্থান না করে। এছাড়াও কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মানবাধিকার

ষোড়শ অধ্যায়
বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব

১.১ বিচারাঙ্গনে দুর্ভোগ ও হয়রানিজনিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের বিচারপ্রার্থী জনগণ আইন ও বিচারাঙ্গনে নানাভাবে দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সেবা গ্রহণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, মামলার কাজে দীর্ঘ সময় আদালতে অবস্থান করার ক্ষেত্রে কিংবা আইনজীবী ও আদালতের কর্মচারিদের সেবার মান বা আচরণ নিয়ে বেশির ভাগ মানুষের অভিজ্ঞতা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নয়। কখনো বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত কারণে, কখনো আদালতের অব্যবস্থাপনার জন্য, কখনো বা আইনজীবী বা আইনজীবী সমিতির দ্বারা, কখনো বা আদালতের সহায়ক কর্মচারির কারণে বিচারপ্রার্থী মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। কমিশন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে হয়রানির বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। আদালতের কার্যক্রম, আদালতের কর্মচারি এবং আইনজীবী সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে সেবাগ্রহীতাগণের সিংহভাগই নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছে। হয়রানি সংক্রান্ত বিষয়ে অনলাইন জরিপের ফলাফল নিম্নরূপ:

প্রশ্ন	মতামত প্রদানকারী গ্রুপ	প্রাপ্ত মোট মতামত	হয়রানিমূলক মর্মে মতামত ব্যক্তকারীর সংখ্যা
মামলার আইনজীবী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?	নাগরিক	১০,৬৬২	আইনজীবী অযথা সময় নষ্ট করেন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছে ৮৫১১ জন নাগরিক যা মতামত প্রদানকারী নাগরিকের ৮০.১০%
আদালতের কর্মচারি সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?	নাগরিক	১১,২২৫	আদালতের কর্মচারি হয়রানি করেন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছে ১০,২০৩ জন নাগরিক যা মতামত প্রদানকারী নাগরিকের ৯০.৯০%
বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন?	আইনজীবী	২২৮	আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছে ১৭৩ জন যা মতামত প্রদানকারী আইনজীবীর ৭৫.৯০%

বিচার বিভাগের অংশীজনদের মতামত হতে এটি স্পষ্ট যে, আদালতসহ বিচারিক সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের বড় অংশের কার্যক্রম হয়রানিমূলক। নাগরিকদের বেশির ভাগই বিচার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কারো সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

১.২ আদালত বা আদালতের ব্যবস্থাপনাজনিত ঘাটতির জন্য সৃষ্ট দুর্ভোগ

(ক) বিচারকের ছুটিজনিত কারণে দুর্ভোগ: প্রত্যেক আদালতের দৈনন্দিন কার্যতালিকা বেশ আগেই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সেই তালিকার তারিখ অনুসারে মামলার ধার্য তারিখে নিযুক্ত আইনজীবী ও পক্ষগণ আদালতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য হাজির হয়। কিন্তু অনেক সময় সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবী ও পক্ষগণ আদালতে হাজির

হওয়ার পর জানতে পারেন যে, বিচারক ছুটিতে আছেন এবং এ কারণে আদালতের কার্যক্রম হবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে মামলার আইনজীবী ও পক্ষগণ বেশ বিরক্ত হন এবং হতাশা প্রকাশ করেন। বিচারকের ছুটির বিষয়টি আগে থেকে জানতে পারলে তারা আদালতে হাজির হতেন না এবং এতে তাদের মূল্যবান সময় বেঁচে যেতো। আদালতে যাতায়াতের ব্যয়ভার থেকেও রক্ষা পেতো, অযথা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতো না। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে বিচারকের ছুটির বিষয়টি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিচারকের ছুটিজনিত কারণে মানুষ যাতে দুর্ভোগের সম্মুখীন না হয় তার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, বিচারকের ছুটি থাকার বিষয়টি আদালতের কোনো ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে আগে থেকে প্রকাশ করা হলে বিচারপ্রার্থীগণ তা দেখে ঐদিন আদালতে হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, অতীব প্রয়োজনীয় ছুটি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশ আগে থেকে পরিকল্পনা মোতাবেক ছুটি নেওয়ার প্রচলন শুরু করা যেতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মামলার কার্যতালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

(খ) বিভিন্ন দিবস উদযাপন বা অনুষ্ঠান আয়োজনের কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগঃ বাংলাদেশের আদালতগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবে আগে কখনো কোনো দিবস উদযাপন হতো না। অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির প্রচলনও তেমন বেশি ছিল না। বেশ কয়েক বছর যাবত আইন মন্ত্রণালয় সরকারি আদেশ জারি করা শুরু করলে জেলা পর্যায়ের আদালতে বিভিন্ন দিবস উদযাপনের সংস্কৃতি শুরু হয়। দিবস উদযাপন ছাড়াও আদালত প্রাঙ্গণে নানাবিধ উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। এগুলোর কারণে একদিকে আদালতের বিচারিক কাজ বিঘ্নিত হয়, অন্যদিকে স্থানীয় রাজনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষের সাথে বিচারকদের সম্পৃক্ততা বেড়ে যায়। এমতাবস্থায়, অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিরুৎসাহিত করা উচিত। একই সাথে ঘটা করে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে কোনো দিবস উদযাপন যাতে না হয় সেজন্য জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। আদালতের নির্ধারিত সময়সূচিতে কোনোভাবেই যেন সভা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা না হয় তার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(গ) তদন্তাধীন ফৌজদারি মামলায় প্রকাশ্য আদালতে তারিখ না দেওয়ার কারণে দুর্ভোগঃ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ধার্যকৃত দিনে জিআর বা সিআর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত কার্যক্রম শেষ না হওয়ার কারণে তদন্তের সময় আরো বৃদ্ধির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রায়শঃ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পেশকার মামলার নথি এজলাসে উপস্থাপন না করে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরা বা চেম্বারে গিয়ে দরখাস্তটি নিষ্পত্তি করতঃ মামলার নতুন তারিখ নির্ধারণ করে। প্রকাশ্য আদালতে শুনানির ভিত্তিতে আদেশ না হওয়ায় মামলার বাদী বা দরখাস্তকারীর বক্তব্য থাকলেও উহা নিবেদন করার সুযোগ পান না। এতে বাদী বা দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদন্তের বিলম্বের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার জবাবদিহিতা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বৃদ্ধির প্রতিটি দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী এবং মামলার বাদী বা দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে প্রকাশ্য আদালতের শুনানির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা জারি করতে পারে।

(ঘ) মাতৃদুগ্ধদানকারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগঃ দেশের কিছু কিছু আদালত অঙ্গনে নারী বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন করা হলেও বেশিরভাগ আদালতে মাতৃদুগ্ধ পানের জন্য পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই। কোথাও কোথাও ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার থাকলেও ঐ কক্ষের অবস্থা এতই নাজুক যে মহিলারা সেখানে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। আবার কোনো কোনো ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার বা কক্ষে বসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও আদালতগুলোতে প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার জন্য সহজ বা অনুকূল কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু আদালতে দোতলা থেকে লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে যা প্রতিবন্ধীদের জন্য সহজে ব্যবহার উপযোগী নয়।

(ঙ) মামলার তারিখ ও অন্যান্য তথ্য জানতে মানুষের দুর্ভোগ ও হয়রানি: দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকলেও মামলার তারিখ বা অন্যান্য তথ্যের জন্য পক্ষগণ পুরোপুরি আইনজীবী বা আইনজীবীর সহকারির উপর নির্ভরশীল। আইনজীবী বা আইনজীবীর সহকারি কিংবা আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া মামলার তারিখ বা তথ্য জানার অন্য কোনো উৎস নেই। মামলার ধার্য তারিখ বা পরবর্তী পদক্ষেপ কিংবা ফলাফল জানার জন্য মানুষকে অর্থ ও সময় ব্যয় করা সহ অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় কিছু দিন পূর্বে আইন ও বিচার বিভাগ দেশের বিভিন্ন আদালতে অনলাইন ভিত্তিক ই-কজলিস্ট চালু করেছে। ফলে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় দেশ-বিদেশের যেকোনো স্থান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে নিজের মামলার যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। মামলার পক্ষগণ ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে খুব সহজে মামলার পরবর্তী তারিখ জেনে নিতে পারে। এই উদ্যোগটি প্রাথমিকভাবে বেশির ভাগ জেলায় চালু করা হলেও নানা কারণে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বা সারাদেশে একযোগে চালু হয়নি। এমতাবস্থায় বিচারপ্রার্থী মানুষের হয়রানি ও দুর্ভোগ কমানোর জন্য অতিসত্বর অনলাইন ভিত্তিক ই-কজলিস্ট চালু করা প্রয়োজন।

(চ) নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেজ বা গেটওয়ে সার্ভারে আদালতের সরাসরি এন্ট্রি না থাকার কারণে মামলার পক্ষ বা আসামীর পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা ও দুর্ভোগ: আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরকালে কিংবা মামলা দায়ের পরবর্তী সময়ে অথবা শুনানিকালে মামলার কোনো পক্ষ, আসামী বা সাক্ষীগণের তাৎক্ষণিক পরিচয় যাচাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এরূপ ছোট একটি বিষয়ের জন্য আদালত কোনো তদন্ত সংস্থা বা থানা পুলিশকে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ প্রদান করে। এতে পুরো বিষয়টি বিলম্বিত হয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় নতুন মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে। থানা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন অফিসসহ অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের গেটওয়ে সার্ভারের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় পত্র সংক্রান্ত ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান যেকোনো ব্যক্তির পরিচয় মুহূর্তের মধ্যে যাচাই বা শনাক্ত করতে পারলেও আদালত বা ট্রাইব্যুনালগুলো পুরোপুরি পুলিশ বা তদন্ত সংস্থার উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সকল আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যাতে নির্বাচন কমিশনের এতদসংক্রান্ত গেটওয়ে সার্ভার ব্যবহার করে পরিচয়পত্র যাচাই করতে পারে তার জন্য সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।

(ছ) আদালতের উন্মুক্ত স্থানে মাদক পোড়ানোর কারণে অস্বস্তি ও দুর্ভোগ: দেশের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উন্মুক্ত চত্বরে মামলার আলামত হিসেবে জব্দকৃত গাঁজা, ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য পোড়ানো হয়। আদালত চত্বরে দিনের বেলায় চুল্লিতে মাদক পোড়ানোর ফলে আশপাশের বিরাট এলাকা জুড়ে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ ব্যবস্থায় মাদক পোড়ানোর কারণে ধোঁয়া ও উৎকট গন্ধে আদালত পাড়ার লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং অনেকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়। চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মাদক পোড়ানোর জন্য আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(জ) লিফটের অপর্যাপ্ততা ও অব্যবস্থাপনার কারণে ভোগান্তি: দেশের বিভাগীয় শহর ও জেলার অনেকগুলোতে বড় পরিসরে বহুতল আদালত ভবন নির্মিত হলেও বিচারপ্রার্থী মানুষ ও আইনজীবীর তুলনায় লিফটের পরিমাণ খুবই কম। আদালতে সরেজমিনে গেলে কর্মদিবসের শুরু থেকে বিকেল অব্দি প্রত্যেকটি লিফটের সামনে লিফটে উঠার জন্য অপেক্ষমান মানুষের লম্বা সারি দেখা যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলোতে লিফটে উঠার জন্য মানুষকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হন নারী, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা। বহু আদালতের লিফট প্রায় সময় অচল থাকে। আবার অনেক জায়গায় লিফট থাকলেও লিফট চালানোর জন্য লিফটম্যানের কোনো পদ নেই। মানুষের হয়রানি ও দুর্ভোগ লাঘবের জন্য লিফটের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়মিতভাবে লিফট রক্ষণবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) ডিসেম্বর মাসে আদালত বন্ধকালীন সময়ে দণ্ডিত আসামীর আত্মসমর্পণ বা গ্রেফতারকৃত আসামীর জামিন শুনানি জনিত জটিলতার কারণে দুর্ভোগ: বাংলাদেশে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ব্যতীত অধস্তন সকল আদালত প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে অবকাশকালীন ছুটির কারণে বন্ধ থাকে। ছুটি কালীন সময়ে অধস্তন আদালতের সকল বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। উক্ত সময়ে জরুরি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ এবং তা হতে উদ্ভূত জরুরি বিষয়গুলো শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারককে ভ্যাকেশন জজ নিয়োগ করা হয়। উক্ত ভ্যাকেশন জজ সাধারণত মিস কেইস ব্যতীত অন্য কোনো শুনানি গ্রহণ করেন না। এর ফলে বিভিন্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হতে সাজা পরোয়ানামুলে গ্রেফতারকৃত আসামীগণের জামিন শুনানি করা সম্ভব হয় না। চেকের মামলায় দণ্ডিত আসামী টাকা দাখিল করতঃ আপীলের শর্তে জামিন শুনানি করার সুযোগ পায় না। এমতাবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ভ্যাকেশন জজ নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে এ জাতীয় সকল দরখাস্তের শুনানি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১.৩ আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে সৃষ্ট হয়রানি

(ক) আইনজীবী সমিতি কর্তৃক আদালত বর্জন: সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় আদালত বর্জন একটি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদালত বর্জনের ফলে বিচারপ্রার্থী মানুষ চরম হয়রানি ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। মামলার পক্ষসহ সাক্ষীগণকে দূর দূরান্ত থেকে আদালতে এসেও ফেরৎ যেতে হয়। শুনানি না হওয়ার কারণে জামিন শুনানির জন্য অপেক্ষায় থাকা হাজতী আসামীদের হাজতবাস আরো বাড়তে থাকে। আইনজীবীগণ বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। আদালত বর্জনের মত আচরণ বা কর্মকাণ্ড তাদের নিকট থেকে কোনোভাবেই কাম্য হতে পারেনা। বিচারকের বিরুদ্ধে যদি কোনো আইনজীবী বা বারের অভিযোগ থাকে তাহলে আইনানুগ পন্থায় এটি কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের নিকট অভিযোগ বর্ণনা করে প্রতিকার চাইতে পারে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আদালত বর্জনকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের হাইকোর্ট বিভাগও ২৩ মে ২০০৫ তারিখের রায়ে আদালত বর্জনকে আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য করেছে। আদালত বর্জনের ঘটনা বন্ধের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের দায়িত্ব রয়েছে। আদালত বর্জনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বার কাউন্সিল আদেশ জারি করতে পারে। আদালত বর্জনের বিষয়টি স্থায়ীভাবে নিরসনের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট এবং বার কাউন্সিলের সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

(খ) আইনজীবীর মৃত্যুতে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ রেখে Death Reverence আয়োজন: দেশের বিভিন্ন জেলায় কোনো কোনো আইনজীবী সমিতি কর্তৃক উক্ত সমিতির সদস্য আইনজীবীর মৃত্যুর দিন তার সম্মানার্থে ডেথ রেভারেন্স্ (Death Reverence) অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এ কারণে আদালতের বিচারকার্য মূলতবী রাখা হয়। বহু বারে Death Reverence এর কারণে বছরের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় ব্যয়িত হয়। এতে আদালতে আগত বিচারপ্রার্থীরা বিড়ম্বনায় পড়ে। মামলার কোনো শুনানি বা পদক্ষেপ ছাড়াই তাদেরকে ফিরে যেতে হয়। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও অসহনীয় মামলাজট থেকে মানুষকে পরিত্রাণ দেয়ার লক্ষ্যে আইনজীবী মৃত্যুর প্রত্যেক ঘটনায় আলাদাভাবে Death Reverence আয়োজনের পরিবর্তে বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে প্রয়াত আইনজীবীদের স্মরণার্থে একটি Death Reverence আয়োজন করে সকলের প্রতি সম্মান জানানো যেতে পারে। উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট একাধিক সার্কুলার জারি করা সত্ত্বেও অনেক বারে এখনো এ প্রথা রয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের পাশাপাশি বার কাউন্সিলের কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

(গ) আইনজীবীদের ব্যক্তিগত মামলায় বার কর্তৃক বিপক্ষে আইনজীবী নিয়োগে বাধা প্রদান: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে। কিন্তু দেশের কোনো কোনো বারের পক্ষ হতে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায় আইনজীবীদের ব্যক্তিগত মামলায় বিপক্ষের হয়ে বারের কোনো সদস্য মামলা পরিচালনা করতে পারবে না। এটি বেআইনি এবং অন্যায্য। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারকে অস্বীকারের শামিল। এরূপ ঘটনা এড়াতে সুপ্রীম কোর্ট এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের উদ্যোগ প্রয়োজন।

(ঘ) ক্লায়েন্ট আইনজীবী দ্বারা হয়রানির শিকার হলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ও দুর্বল: বিচারপ্রার্থী মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই আইনজীবীর অসদাচরণের কারণে নানাভাবে দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হন। আইনজীবী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি, শুনানির সময় উপস্থিত না হওয়া, বিপক্ষের সাথে লেনদেনে জড়িয়ে যাওয়া কিংবা মক্কেলের সাথে অনৈতিক বা প্রতারণামূলক কোনো কাজের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী মক্কেল দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আইনজীবীর এরূপ হয়রানি ও দুর্ভোগের বিষয়ে বার কাউন্সিলে বর্তমানে যে প্রতিকার ব্যবস্থাপনা রয়েছে এটি খুবই অপর্যাপ্ত। একটি উপজেলা বা জেলা থেকে ঢাকাস্থ বার কাউন্সিলে এসে অভিযোগ দায়ের করা যে কোনো বিচারপ্রার্থীর জন্য কষ্টদায়ক এবং বিড়ম্বনাপূর্ণ। এমতাবস্থায় আইনজীবীদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আনীত অভিযোগের তদন্ত, শুনানি ও নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ে একটি প্রতিকার ব্যবস্থাপনা থাকা অতীব জরুরি। জেলা পর্যায়ে অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১.৪ আইনজীবী কর্তৃক সৃষ্ট হয়রানি ও দুর্ভোগ

(ক) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 'খরচ' বা 'জরিমানার টাকা' সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরিবর্তে আইনজীবী কর্তৃক গ্রহণ: মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে আদালত মামলার কোনো একটি পক্ষের অবহেলা বা বিলম্বের কারণে অন্য পক্ষকে খরচ বা জরিমানা পরিশোধের আদেশ প্রদান করে। আদালত সংশ্লিষ্ট নানা অংশীজনের মাধ্যমে কমিশন এই মর্মে জ্ঞাত হয়েছে যে, এরূপ খরচ বা জরিমানা মামলার অপর পক্ষকে পরিশোধের জন্য করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নিযুক্তীয় আইনজীবীগণ এই টাকা উত্তোলন করে এবং তারা ক্লায়েন্ট বা মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষকে উহা পরিশোধ করেন না। এদিক থেকেও মামলার পক্ষগণ আইনজীবী দ্বারা ক্ষতিগস্ত হন। উক্ত খরচ বা জরিমানার টাকা বাস্তবিক পক্ষে যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ পান তার জন্য সুপ্রীম কোর্ট একটি সার্কুলার জারি করতে পারে।

(খ) ক্লায়েন্টের ইচ্ছা অনুসারে আইনজীবী কর্তৃক মামলা ফেরৎ না দেয়া বা অনাপত্তি পত্র (NOC) ইস্যু না করা: বিভিন্ন বারে অনেক সময় দেখা যায় বিচারপ্রার্থী ক্লায়েন্ট আইনজীবীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার নিকট থেকে মামলা ফেরৎ নিয়ে অন্য আইনজীবী নিযুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ক্লায়েন্টের অনুকূলে NOC ইস্যু করে মামলা ফেরৎ দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবী এটা করেন না। ক্লায়েন্ট বার বার তাগিদ প্রদান করলেও তিনি NOC সহ ফাইল ফেরৎ দেন না। এতে ক্লায়েন্ট অবর্ণনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় এবং এ কারণেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে বার কাউন্সিল NOC প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক আইনজীবীদের অনুসরণের জন্য একটি সার্কুলার জারি করতে পারে।

১.৫ সরকারি আইনজীবী কর্তৃক হয়রানি

(ক) মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অসহযোগিতা: ফৌজদারি মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে পাবলিক প্রসিকিউটরগণ রাষ্ট্র তথা বাদীপক্ষে যাবতীয় দায়িত্ব পালনের কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তারা দায়িত্বে গাফিলতি করেন। মামলার প্রতি যথাযথ যত্ন নেন না। সময়মত সাক্ষী উপস্থাপন করেন না অথবা বিপক্ষের সাক্ষীকে যথাযথভাবে জেরা করেন না। এছাড়াও মামলায় বাদীর স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। এতে মামলার বাদী বড় রকমের ক্ষতির শিকার হন। এক্ষেত্রেও একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সলিসিটির অফিস অন্যান্য তদারকি ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করতে পারে।

(খ) বাদী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট অর্থ দাবি ইত্যাদি: সরকারি আইনজীবীগণের একটি অংশ মামলায় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মামলার পক্ষগণের নিকট থেকে অনৈতিকভাবে অর্থ আদায় করে মর্মে অভিযোগ বিভিন্ন সময় শোনা যায়। অনেক সময় এরূপ অভিযোগের কোনোরূপ তদন্ত হয়না কিংবা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়না। এ বিষয়েও সলিসিটর অফিস একটি শক্তিশালী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করতে পারে।

১.৬ আদালতের কর্মচারি কর্তৃক হয়রানি ও দুর্ভোগ

(ক) অসহযোগিতা, দুর্ব্যবহার ও অর্থ দাবি: আদালতের কর্মচারি বিশেষত পেশকার, সেরেস্তাদার, অফিস সহায়ক, নকলখানার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারি বিরুদ্ধে অসহযোগিতা, দুর্ব্যবহার ও অর্থ দাবির অভিযোগ বেশ পুরনো। কমিশনের অনলাইন জরিপে ও এর সত্যতা পাওয়া গেছে। কমিশনের জরিপে অংশ নেওয়া **১১,২২৫** জন নাগরিকের ৯০ শতাংশই আদালতের কর্মচারিরা হয়রানি করেন মর্মে মত ব্যক্ত করেছেন। একই জরিপে ৮৪.৯০ শতাংশ নাগরিক আদালতের কর্মচারিগণ ঘুষ চান মর্মে মত ব্যক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় আদালতের কর্মচারিদের হয়রানি দূরীকরণের জন্য প্রত্যেক আদালতে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো আদালতের একটি কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই ও তদন্ত সাপেক্ষে দায়ী কর্মচারি বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) মামলার আদেশ, রায়, ডিক্রির নকল তুলতে হয়রানি: মামলার আরজি, এজাহার, পুলিশ প্রতিবেদন, অভিযোগপত্র, সাক্ষীর জবানবন্দি, রায় এবং বিভিন্ন ধরণের আদেশের জাবেদা নকল দেয় সংশ্লিষ্ট আদালতের নকলখানা। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোর্ট ফি আর ফোলিও দাখিল করা সাপেক্ষে নকল সরবরাহের নিয়ম থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা দাবিসহ নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ শোনা যায়। নকলের দরখাস্ত দেওয়ার পর নকলখানার কর্মকর্তা হয়ে এটি সংশ্লিষ্ট আদালতে যায়। সেখানে সংশ্লিষ্ট পেশকার বা সেরেস্তাদার এই নথি প্রেরণ করে নকলখানায়। এই নথি প্রেরণ করার ক্ষেত্রে অনেকেই কৃত্রিম বিলম্বের সৃষ্টি করে। বিচারপ্রার্থী মানুষ এ ক্ষেত্রেও হয়রানির শিকার হয়। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ২ মার্চ ২০১৭ তারিখে এজলাস বা খাস-কামরায় কম্পিউটারে টাইপকৃত আদেশ, রায় বা নথির অন্যান্য অংশগুলো প্রিন্ট করে অনুলিপি প্রস্তুতকারী হিসেবে স্বাক্ষর প্রদান করে তাৎক্ষণিকভাবে অনুলিপি শাখায় প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে দ্রুত নকল সরবরাহের নির্দেশ দিলেও অনেক ক্ষেত্রে এগুলো মানা হচ্ছে না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে উক্ত বিষয়ে জেলা ও দায়রা জজের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা: বিচারপ্রার্থী জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা

২.১ মানুষের দুর্ভোগ ও হয়রানির বিষয়ে অনলাইন জরিপে প্রাপ্ত মতামত

স্বচ্ছ, জনকল্যাণমুখী এবং হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা বাংলাদেশের বিচারপ্রার্থী জনগণের দীর্ঘলালিত আকাঙ্ক্ষা। কমিশন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে অনলাইন জরিপ পরিচালনা করেছে তার ফলাফলই মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। জরিপে সাধারণ নাগরিক, আইনজীবী, বিচারকের একটি বড় অংশ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছে। উক্ত জরিপের ফলাফল নিম্নরূপ:

প্রশ্ন	মতামত প্রদানকারী গ্রুপ	প্রাপ্ত মোট মতামত	হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থার পক্ষে মতামতের সংখ্যা
আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান?	নাগরিক	১১,৮২১	হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত প্রদান করেছে ১০,৬৫৬ জন নাগরিক যা মতামত প্রদানকারী নাগরিকের ৯০.১০%
	আইনজীবী	২৩৫	হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত প্রদান করেছে ২০৬ জন আইনজীবী যা মতামত প্রদানকারী আইনজীবীর ৮৭.৭০%
	সহায়ক কর্মচারি	১৯২	হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত প্রদান করেছে ১৩২ জন সহায়ক কর্মচারি যা মতামত প্রদানকারী কর্মচারি ৬৮.৮০%

	বিচারক	২০২	হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত প্রদান করেছে ১৭৭ জন বিচারক যা মতামত প্রদানকারী বিচারকের ৮৭.৬০%
	সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী	৬৫	হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত প্রদান করেছে ৬০ জন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী যা মতামত প্রদানকারী আইনজীবীর ৯২.৩০%

অনলাইন জরিপের উপরিউক্ত মতামত হতে এটি স্পষ্ট যে, বিচার বিভাগের অংশীজন ও সেবাগ্রহীতাগণ হয়রানিমুক্ত বিচার চান। স্বচ্ছ, জনকল্যাণমূলক এবং হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আদালতের ভিতরে এবং বাইরে বিচারিক সেবার যতগুলো ধাপ বা ক্ষেত্র আছে সবগুলোকে হয়রানিমুক্ত করার বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশ

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
• আদালত প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করতে হবে এবং বিচার বিভাগে বিভিন্ন দিবস উদযাপন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের ক্ষেত্র সীমিত করার জন্য সার্কুলার জারি করতে হবে। • বিচারক ছুটিতে যাওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই ওয়েবসাইট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • তদন্তাধীন ফৌজদারি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত দরখাস্তের ক্ষেত্রে বাদীর উপস্থিতিতে শুনানির মাধ্যমে আদেশ প্রদান করতে হবে। • মামলার তারিখ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি জানার ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী মানুষের হয়রানি ও দুর্ভোগ কমানোর জন্য অনলাইন ভিত্তিক ই-কজলিস্ট চালু করতে হবে। • আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলার পক্ষগণের জাতীয় পরিচয় পত্র তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই বা সনাক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের গেটওয়ে সার্ভারে প্রবেশের ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। • চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উন্মুক্ত চত্বরে দিনের বেলায় মাদক পোড়ানো বন্ধ করে বিকল্প স্থান নির্ধারণ করতে হবে। • আদালতের আদেশ দ্বারা প্রদত্ত ‘খরচ’ বা ‘জরিমানার টাকা’ আইনজীবীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক গ্রহণের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক একটি সার্কুলার জারি করতে হবে।	১। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ২। আইন ও বিচার বিভাগ ৩। জেলা ও দায়রা জজ ৪। চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৫। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
• মামলার আদেশ, রায়, ডিক্রীসহ অন্যান্য কাগজ পত্রের জাবেদা নকল প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে সরবরাহ পদ্ধতি সহজীকরণপূর্বক একটি সার্কুলার জারি করতে হবে।	
• আদালত প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কক্ষ বা কর্নার স্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার সুবিধার্থে লিফট ও আদালত কক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। • বহুতল বিশিষ্ট আদালত ভবনে পর্যাপ্ত লিফট এবং লিফটম্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। আইন ও বিচার বিভাগ ২। গণপূর্ত অধিদপ্তর
• জেলা পর্যায়ে আদালত বর্জন কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং বার কাউন্সিলের কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। বার কাউন্সিলকে এই বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করতে হবে। • প্রত্যেক আইনজীবীর মৃত্যুতে Death Reverence আয়োজনের পরিবর্তে বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে ঐ বছরে প্রয়াত সকল আইনজীবীর সম্মানার্থে Death Reverence অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পুনরায় একটি সার্কুলার ইস্যু করা প্রয়োজন। • যেসব বারে আইনজীবীদের ব্যক্তিগত মামলায় বিপক্ষের হয়ে বারের কোনো সদস্য মামলা পরিচালনা করতে পারবে না মর্মে অলিখিত প্রচলন আছে সেসব বারের বিষয়ে বার কাউন্সিল কর্তৃক তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • আইনজীবীদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আনীত অভিযোগের তদন্ত, শুনানি ও নিষ্পত্তির বিষয়ে জেলা পর্যায়ে একটি প্রতিকার ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। • ক্লায়েন্টের ইচ্ছা অনুসারে আইনজীবী কর্তৃক মামলা ফেরৎ না দেয়া বা NOC ইস্যু করার বিষয়ে বিড়ম্বনা দূরীকরণার্থে বার কাউন্সিল একটি নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।	১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ২। জেলা আইনজীবী সমিতি
সরকারি আইনজীবীগণ কর্তৃক মামলায় গাফিলতি, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সাথে অপেশাদার আচরণের বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করতে হবে।	১। আইন ও বিচার বিভাগ ২। সলিসিটর অনুবিভাগ

সপ্তদশ অধ্যায়
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ

১. ভূমিকা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো আইন অনুযায়ী পরিচালিত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার প্রক্রিয়ায় বিচার নিষ্পত্তি ও বিচার প্রার্থীকে প্রতিকার প্রদান। এই নীতির আবশ্যক অনুষঙ্গ হচ্ছে বিচার বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিগণ নিজেরা থাকবেন দুর্নীতিমুক্ত এবং সকল সন্দেহের উর্দ্ধে। তাদের কাজেও থাকতে হবে জবাবদিহিতা।

সংবিধান দেশে সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত নামে দুই স্তরের বিচার প্রশাসন সৃষ্টি করেছে। সুপ্রীম কোর্টের দুই বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল রয়েছে। অন্যদিকে সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে হাইকোর্ট বিভাগ। তাই, বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এবং হাইকোর্ট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিহীনতা।

২. কমিশন কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন জরিপে দুর্নীতি বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন বিচারাঙ্গনে দুর্নীতির বিষয়ে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপের ফলাফল নিম্নরূপ:

প্রশ্ন	মতামত প্রদানকারী গ্রুপ	প্রাপ্ত মোট মতামত	হয়রানিমূলক মর্মে মতামত ব্যক্তকারীর সংখ্যা
আদালতের কর্মচারি সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?	নাগরিক	১১,২২৫	আদালতের কর্মচারিরা ঘুষ চান মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন ৯,৫৩০ জন নাগরিক, যা মতামত প্রদানকারী নাগরিকদের ৮৪.৯০%
আদালতের কর্মচারি সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?	আইনজীবী	২২৮	আদালতের কর্মচারিরা ঘুষ চান মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন ২০৯ জন আইনজীবী, যা মতামত প্রদানকারী আইনজীবীদের ৯১.৭০%
কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?	বিচারক	১৮৮	আদালতের কর্মচারিরা ঘুষ চান মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন ১২৪ জন বিচারক, যা মতামত প্রদানকারী বিচারকদের ৬৬%

উল্লিখিত মতামত হতে এটি স্পষ্ট যে, আদালতের কর্মচারিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নানাভাবে ঘুষ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত।

৩. বিচারাঙ্গনে দুর্নীতি-অনিয়মের সম্ভাব্য কারণ:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটিরও বেশি। অথচ দেশে উচ্চ ও অধস্তন আদালত মিলিয়ে মোট বিচারকের সংখ্যা মাত্র ২,৩০০ এর কিছু বেশি। এই স্বল্প সংখ্যক বিচারকের মাধ্যমে জমে থাকা প্রায় ৪৩ লাখ মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারক ছাড়াও অপরিহার্য অংশীজন হচ্ছে আইনজীবী, পুলিশ, আইনজীবী সহকারি, আদালতের সহায়ক জনবল, তথা পেশকার, সেরেস্তাদার, জারিকারক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

একজন বিচারপ্রার্থীকে উপরি-উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হয় এবং তাদের কারো কারো দ্বারা বিচার প্রার্থী জনগণ হয়রানির শিকার হন। হয়রানি এড়িয়ে সেবা লাভ করতে অনেকে বাধ্য হন ঘুষ বা অন্যবিধভাবে অর্থ প্রদান করতে। অনেকে আবার অবৈধ সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঘুষ প্রদান করে থাকেন। মোটা দাগে এগুলোই হচ্ছে বিচারাঙ্গনে দুর্নীতি-অনিয়মের মূল কারণ। এছাড়াও বিচারাঙ্গনে দুর্নীতি-অনিয়মের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়। যথা:

- বিচার ও বিচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বিচারক, আইনজীবী, আদালতের কর্মচারি, আইনজীবী সহকারি, পুলিশ বা তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি;
- মামলার কজলিস্ট আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির দায়িত্বহীনতা;
- আদালত প্রাঙ্গণে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য কোনো তথ্য কেন্দ্র না থাকা;
- সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক দৈনিক কর্মঘন্টার সর্বোচ্চ ব্যবহার না করা;
- আদালতের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরে সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ না থাকা বা প্রদর্শন না করা;
- আইনজীবীদের মধ্যে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের উদ্যোগহীনতা;
- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি;
- সংশ্লিষ্ট বিচারক বা অফিস প্রধান কর্তৃক অধীনস্ত কর্মচারিদের তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বা অভিযোগ বক্সের অনুপস্থিতি।

৪. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক বিচারিক সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র:

২০২৩ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি কর্তৃক প্রণীত দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদনে বিচারিক সেবা সংক্রান্ত দুর্নীতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে বিচারিক সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে বিচারপ্রার্থীগণ যে সকল দুর্নীতির শিকার হয়েছেন সেগুলো নিম্নরূপ:

(১)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া	৩৪.১ শতাংশ ক্ষেত্রে
(২)	অবহেলা	৩১.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৩)	হয়রানি	৩১ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৪)	প্রতারণা	১৭.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৫)	স্বজন প্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার	১০ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৬)	পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৭.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৭)	রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	৬ শতাংশ ক্ষেত্রে

উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে সেবা গ্রহীতাগণকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে:

(১)	আইনজীবী সহকারি	৩৬.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে
(২)	পেশকার	২৩.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৩)	নিয়োগকৃত আইনজীবী	২২.৪ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৪)	দালাল	৪.৬ শতাংশ ক্ষেত্রে

বিচারিক সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে যারা ঘুষ দিয়েছেন তারা ঘুষ প্রদানের কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি উল্লেখ করেছেন:

(১)	ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না তাই তারা ঘুষ দিয়েছেন	৭৩.৯% ক্ষেত্রে
(২)	যথাসময়ে সেবা পেতে ঘুষ দিয়েছেন	২৮.৭% ক্ষেত্রে
(৩)	নির্ধারিত ফি বা তথ্য জানা না থাকায় ঘুষ দিয়েছেন	১৮.১% ক্ষেত্রে
(৪)	বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষ দিয়েছেন	৪.৭% ক্ষেত্রে
(৫)	দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ দিয়েছেন	৭ % ক্ষেত্রে
(৬)	নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ দিয়েছেন	৬.৪ % ক্ষেত্রে
(৭)	সঠিক নথি উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে ঘুষ দিয়েছেন	৬ % ক্ষেত্রে
(৮)	নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা দ্রুত সেবা পেতে ঘুষ দিয়েছেন	৫.৪% ক্ষেত্রে

উল্লিখিত তালিকা হতে দেখা যায় বিচারিক সেবা পেতে যাদের ঘুষ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বিচারকদের কথা উল্লেখ নেই। আবার বিচার প্রার্থীগণ যারা ঘুষ দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবৈধ সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান করেছেন। সুতরাং যারা ঘুষ গ্রহণ করছে শুধু তাদের দায়ী করলে চলবে না, যারা ঘুষ প্রদান করেছে অবৈধ সুবিধা লাভের জন্য, তাদেরকেও আইনের আওতায় আনতে হবে।

প্রতিবেদনে যদিও বিচারকদের বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। তবে বাস্তবতা এই যে, কিছু বিচারকের ঘুষ গ্রহণ বা অন্যবিধ সুবিধা আদায়ের বিষয় বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে বিচারকদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার সাথে সাথে বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অন্য সকল অংশীজনদেরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সুপ্রীম কোর্টে দুর্নীতি প্রতিরোধ

সুপ্রীম কোর্টে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন:

(ক) সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি করাসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) সুপ্রীম কোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের (প্রেষণে কর্মরত জুডিসিয়াল অফিসারগণসহ) বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের তিনজন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি করাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৬. অধস্তন আদালতে দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন

অধস্তন আদালতে দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে বিচারকদের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি অধস্তন আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন এবং অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবেন।

জেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থানীয় কমিটি থাকবে যা, 'দুর্নীতি অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ কমিটি' নামে অভিহিত হতে পারে।

প্রতিটি জজশীপে একজন অতিরিক্ত জেলাজজ, একজন যুগ্ম জেলা জজ এবং একজন সিনিয়র সহকারি জজের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। একইভাবে প্রতিটি ম্যাজিস্ট্রেসিতে একজন এসিজেএম, একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

উল্লিখিত দুর্নীতি অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ কমিটিগুলেঅ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি করবেন।

৭. জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির কার্যপরিধি

১. অধস্তন আদালতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ;
২. আদালতের দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নীতি, পদ্ধতি ও বিধি প্রণয়ন;
৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে সময়ে সময়ে সার্কুলার জারি করা;
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কৌশল ও পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;
৫. দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮. জেলা পর্যায়ে কমিটির কার্যপরিধি

১. জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান;
২. বিধি মোতাবেক অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
৩. জেলা আদালতের দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
৪. জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৫. আদালতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা দানের ক্ষেত্রে কোনো নাগরিক যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যেকোনো অভিযোগ প্রদান করতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। সরকারি দপ্তরের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভূক্তভোগী ব্যক্তি কিভাবে অভিযোগ দাখিল করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কিভাবে অভিযোগ যাচাই-বাছাই, তদন্ত ও নিষ্পত্তি করবে তার একটি রূপরেখা উক্ত নির্দেশিকায় প্রদান করা হয়েছে। বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় অনুরূপ একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তাঁর আলোকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে বার-বেঞ্চের ঐক্য

বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন বৃহত্তর ঐক্য এবং বার ও বেঞ্চের মধ্যে সমন্বয়। আদালতের যে সহায়ক কর্মকর্তা বা কর্মচারি ঘুষ দাবি বা গ্রহণ করে তাঁর বিষয়ে আইনজীবীগণ ওয়াকিবহাল থাকলেও নানা কারণে তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন না। আবার ঘুষ দিয়ে দ্রুত কাজ আদায় করার জন্য যারা

সব সময় সচেষ্ট থাকেন সেইরূপ আইনজীবী বা আইনজীবী সহকারির বিষয়ে বার কাউন্সিলকেও যথা সময়ে অবহিত করা হয় না। ফলে দুর্নীতির বিষয়টি অনেক সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। এ কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন বার ও বেঞ্চের ঐক্য। এছাড়াও উপরে বর্ণিত প্রতিটি কমিটি গঠনর্পূবক তাদের শক্তিশালী করা হলে এবং জনসাধারণকে এই সকল কমিটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ভুক্তভোগীগণ যথাস্থানে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং আদালত অঙ্গন হতে দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে।

সুপারিশ

বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন সকল পর্যায়ের বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুর্নীতি বিরোধী সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আচরণবিধিমালা প্রণয়ন।

২. প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ এবং তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা।

৩. প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে এবং অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রে জেলা আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৪. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিখিতভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের কাছে পৌছানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের জন্য ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা।

৫. অধস্তন আদালতে কর্মরত বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা। তদন্ত কমিটি প্রতি ৩ মাস পর পর দাখিল হওয়া অভিযোগগুলো পরীক্ষা এবং অভিযুক্তের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক তাতে প্রাথমিক সত্যতা আছে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৬. অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ জানানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা।

৭. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সকল অভিযোগ পর্যালোচনা করা এবং অভিযুক্ত কর্মকতা-কর্মচারির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

৮. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা এবং ই-মেইলের মাধ্যমে দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি যেন তাঁর অভিযোগ জানাতে পারে, সে জন্য জনসাধারণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস (যা প্রতিটি জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য আলাদা হবে) প্রদান করা।

৯. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিকট তাদের কাজের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

১০. আইনজীবীগণের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় পৃথক পৃথক অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা।

১১. বিচারাঙ্গণে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু করা।

অষ্টাদশ অধ্যায়
আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

১. ভূমিকা
সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা (Access to justice) নিশ্চিত করা। বিচার ব্যবস্থায় সব শ্রেণির মানুষের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা না গেলে ন্যায়বিচার পুরোপুরি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। Access to Justice বলতে আমরা আনুষ্ঠানিক বিচার পদ্ধতি যেমন: আদালত, ট্রাইব্যুনালসহ মামলা-মোকদ্দমায় সব শ্রেণির মানুষের প্রবেশের সুযোগকে বুঝে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Access to Justice নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা চালু হয়। দারিদ্র বা আর্থিক অসচ্ছলতা হলো Access to Justice এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল দর্শন হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। ধর্ম, বর্ণ কিংবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কাউকে তার বিচারপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সমাজের সকল মানুষের আর্থিক সঙ্গতি সমান থাকে না। ফলে দরিদ্র মানুষ আইনের আশ্রয় নিতে ব্যর্থ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইনগত সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

আইনগত সহায়তার মূল বিষয় হলো অসহায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আইনগতভাবে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিচার লাভের সুযোগ করে দেওয়া। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আইনগত সহায়তাকে এতদিন দান বা Charity হিসেবে মনে করা হলেও সমতা ও মানবাধিকারের ধারণা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে এ ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের কোনো দান বা বদান্যতা নয় বরং এটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব এবং দরিদ্র জনগণের অধিকার।

২. কমিশনের অনলাইন জরিপে আইনগত সহায়তা সম্পর্কিত মতামত
কমিশন সাধারণ নাগরিকসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপের সরকারি আইনগত সহায়তা বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত নিম্নরূপ:

প্রশ্ন	মতামত প্রদানকারী	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	বিনামূল্যে আইনি সহায়তা কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত মর্মে মতামত প্রদানকারীর হার
দরিদ্র বিচার প্রার্থীদের জন্য কী ধরণের সংস্কার দরকার	নাগরিক	১১,৩৮০ জন	৮৯.৬০%
	সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী	৬৬ জন	৮৩.৩০%
	আইনজীবী	২২৯ জন	৮৮.৬০%
	আদালতের সহায়ক কর্মচারি	১৮৬ জন	৮৬%
	অধস্তন আদালতের বিচারক	১৯৯ জন	৯৮.৫%

৩. আইনগত সহায়তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের কথা বারংবার বিধৃত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" শুধু প্রস্তাবনা নয়, সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতেও উচ্চারিত হয়েছে মানবাধিকার ও সাম্যের শ্লোগান। রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য একটি মূলনীতি হিসেবে ১৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।" এছাড়া ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এই অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, যেমনঃ বেকারত্ব, ব্যাধি, পঙ্গুত্ব, বৈধব্য ইত্যাদি পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মানবাধিকার, সুবিচার ও সমতার ধারণাকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত তৃতীয় ভাগের একাধিক স্থানে বিধৃত করা হয়েছে। যেমন, 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'কে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" সকল নাগরিককে নীতিগতভাবে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলা হলেও সামাজিক বৈষম্য ও আর্থিক অসঙ্গতি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করে। ধনী ও সচ্ছল মানুষের পক্ষে 'আইনের আশ্রয় লাভ' করা যতটুকু সহজ দরিদ্র মানুষের পক্ষে ঠিক ততটুকুই কঠিন। আইনের সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জনগণকে ন্যায়বিচার তথা আদালতে প্রবেশে সক্ষম করার জন্য দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য দরকার আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা। সামগ্রিকভাবে এটি স্পষ্টভাবে বলা যায়, অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা সরকারের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

৪. দেওয়ানি কার্যবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় আইনগত সহায়তা

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ ৩৩ এ নিঃসম্বল (Pauper) ব্যক্তি কর্তৃক মোকদ্দমা দায়েরের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের আইন প্রণেতাগণ লিগ্যাল এইডের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। দেওয়ানি কার্যবিধিতে এরূপ বিধান সংযোজন করার মূল লক্ষ্য ছিল অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে আদালতের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কিন্তু দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ 'নিঃসম্বল' ব্যক্তির যে আর্থিক সীমারেখা প্রদান করা হয়েছে সেটি বর্তমান সময়ের আর্থিক মূল্যমানের দিক থেকে অতি নগণ্য ও অপর্যাপ্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থা প্রায় অকার্যকর হয়ে গেছে। তাছাড়া দেওয়ানি কার্যবিধিতে বর্ণিত নিঃসম্বল ব্যক্তির মামলা করার বিধি-বিধান অনেক বেশি আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ও জটিল প্রকৃতির।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এ আইনগত সহায়তা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ৩৪০ অনুসারে যে কোনো আসামী আইনজীবী দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে। ধারা ৩৪০ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে "ফৌজদারি আদালতে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির অথবা এইরূপ কোনো আদালতে এই আইনানুসারে যার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে, তাঁর কৌঁসুলীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে।" ফৌজদারি কার্যবিধির এই উপ-ধারায় মূলত অভিযুক্ত আসামীর বিচার চলাকালে আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে। আসামী হাজতে কিংবা হাজতের বাইরে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে আইনজীবীর সাথে পরামর্শের সুযোগ দিতে হবে। এ ধারার মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধু নয় বরং ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে পরিচালিত সকল কার্যক্রমে আইনজীবী নিয়োগ ও পরামর্শের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রত্যেক আসামীকে কৌসুলীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন নজির দ্বারা আরো স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু শতাব্দীকাল আগে প্রণীত এসব বিধি-বিধান বর্তমানে প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বিশেষ আইনের দ্বারা পরিচালিত আইনগত সহায়তা কর্মসূচির পাশাপাশি এসব পুরনো আইন সংশোধন করে সময়োপযোগী বিধান সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

৫. বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আইনগত সহায়তা

৫.১ সরকারি আইনগত সহায়তা কাঠামো

বাংলাদেশ সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের ইতিহাস বেশি দিন আগের না হলেও এর বিবর্তনের পেছনে একটি পটভূমি রয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম সরকারি উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৯৪ সনে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখের ৮ নম্বর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রথমবারের মতো আইনগত সহায়তা কমিটি গঠনের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় জেলা ও দায়রা জজকে চেয়ারম্যান করে একটি আইনগত সহায়তা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গরিব ও অসহায় বিচারপ্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কাউকে আইনি সহায়তা দানের জন্য উপযুক্ত মনে করলে আইনজীবী ফি পরিশোধের মাধ্যমে আইনি সহায়তা প্রদান করতো।

পরবর্তীতে আরো বৃহৎ পরিসরে আইনি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৪ সালের সিদ্ধান্ত বাতিল করে ১৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে আরেকটি সিদ্ধন্ত জারি করে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৭৪ নম্বরং এই সিদ্ধান্ত দ্বারা জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি পুনর্গঠনের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে একটি আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন মহলের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার ২৬ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ পাস করে। আইনটির প্রস্তাবনায় বলা হয়, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে এই আইনের আওতায় সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২ সরকারি আইনগত সহায়তা সম্পর্কিত আইন ও বিধি

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ অনুযায়ী সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৪ জুন ২০০০ তারিখের ১৪৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা নিম্নরূপঃ

আইন/বিধি/নীতিমালা	বিষয়বস্তু
আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০	সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ, প্যানেল আইনজীবীর তালিকা তৈরিসহ আইনগত সহায়তার সংজ্ঞা নিরূপণ ইত্যাদি।
আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (কর্মকর্তা-কর্মচারি) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১০	সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়াবলি
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন,	উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ

আইন/বিধি/নীতিমালা	বিষয়বস্তু
দায়িত্ব, কার্যাবলি ইত্যাদি) প্রবিধানমালা ২০১১	
আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪	আইনগত সহায়তা প্রাপকের যোগ্যতা নিরূপণ
আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫	আইন সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি, প্যানেল আইনজীবীর ফি নির্ধারণ, আইনজীবীর অনুসরণীয় বিষয়াবলি, সমন্বয় সভা আয়োজন ইত্যাদি
আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ কর্তৃক মামলা পূর্ব ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনার সংক্রান্ত নিয়ম ও অনুসৃত কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (শ্রম আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলি, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১৬	
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলি, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১৬	শ্রম আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ ইত্যাদি

৫.৩ সরকারি আইনি সেবার পরিসংখ্যান: ২০০৯-২০২৪ সাল

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনগত সহায়তা প্রদান					আইনি সহায়তা প্রাপ্ত উপকার ভোগীর সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ আদায় প্রি ও পোস্ট কেইস (টাকায়)
	আইনি পরামর্শ সেবা	আইন সহায়তা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	আইন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	কারাগারে আইনি সহায়তা প্রাপ্ত কারাবন্দীর সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/ বিরোধের সংখ্যা		
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	২,৫১৩৭	৩,২২৫	২,২৭৫			২৮,৩৬২	
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস (৬৪টি)	২২৬৬৯৯	৪,০২,২৩৩	২,০৪,২৯৪	১,২৩,১২৪	১,৩৩,৫১৫	৯,০২,৮০৯	২২২,৫৪,৭৮,৯৫৯/-
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	২১২৫৭	৪,৪০২	৭৯৫		১,৯১২	২৮,৯৫৮	৬,৬২,৭১,২১৫/-
জাতীয় হেল্প লাইন (কলসেন্টার)	১৮০৭৬৫					১,৮০,৭৬৫	
	৪,৫৩,৮৫৮	৪,০৯,৮৬০	২,০৭,৩৬৪	১,২৩,১২৪	১,৩৫,৪২৭	১১,৪০,৮৯৪	২২৯,১৭,৫০,১৭৪/-

৬. সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৬.১ আইন ও বিধিগত সীমাবদ্ধতা

(ক) আইনগত সহায়তার ধারণা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ 'আইনগত সহায়তা' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এ আইনের ২ ধারার (ক) উপ-ধারায় 'আইনগত সহায়তা' বলতে ৪টি অর্থ বোঝানো হয়েছে। 'আইনগত সহায়তা' বলতে প্রথমতঃ কোনো আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, দ্বিতীয়তঃ মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান, তৃতীয়তঃ মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোনো সহায়তা দান এবং চতুর্থতঃ আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান। 'আইনগত সহায়তা'র এ সংজ্ঞায় এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, সব রকমের পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি খরচ, ডিএনএ পরীক্ষার খরচ, সাক্ষী আনা নেওয়ার খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে দরিদ্র জনগণ একদিকে মামলা মোকদ্দমার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা পাচ্ছে না, অন্যদিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মামলা তারা সরকারি আইন সহায়তার আওতায় করতে পারছে না।

(খ) জাতীয় পরিচালনা বোর্ডসহ কমিটিগুলোর গঠন পুনর্বিন্যাস: জাতীয় পরিচালনা বোর্ড: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ধারা ৬ এর বিধান অনুযায়ী সংস্থার একটি জাতীয় পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। উক্ত পরিচালনা বোর্ডে জাতীয় সংসদ, অ্যাটর্নী-জেনারেল অফিস, আইন ও বিচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পুলিশ বিভাগ, সুপ্রীম কোর্ট, কারাগার, বার কাউন্সিল, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, জাতীয় মহিলা সংস্থাসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নারী সংস্থার সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকলেও স্থানীয় সরকার বিভাগ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব নেই। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন হওয়ায় জাতীয় পরিচালনা বোর্ডে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। দেশের শ্রমিক জনগোষ্ঠী এই আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হলেও বোর্ডে শ্রম মন্ত্রণালয়েরও কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। এ কারণে জাতীয় পরিচালনা বোর্ড পুনর্বিন্যাস করে এতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সুপ্রীম কোর্ট কমিটি: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ধারা ৮(ক) এর উপ-ধারা (১) এর (ছ) এ বলা হয়েছে, "অ্যাটর্নী-জেনারেল এর সহিত পরামর্শক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারি অ্যাটর্নী-জেনারেল, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্বও পালন করবেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির কোনো বিধান না থাকায় ২০১৩ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট কমিটির বিষয়টি আইনে সন্নিবেশিত করা হয়। সে সময় সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস না থাকায় এবং উক্ত অফিসের জন্য লিগ্যাল এইড অফিসার এর পদ সৃজিত না হওয়ায় সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত একজন সহকারি অ্যাটর্নী-জেনারেলকে কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার এর পদ সৃজিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসার সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করছেন। এ কারণে সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার-কে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

জেলা কমিটিঃ জেলা কমিটি জেলা পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এই কমিটি জেলা পর্যায়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম তদারকির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে সেটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত উপ-পরিচালক-স্থানীয় সরকার এর মাধ্যমে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাকে জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(গ) লিগ্যাল এইড অফিসারের ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধান: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ধারা ২১(ক) এর উপ-ধারা (২) এ বলা হয়, "লিগ্যাল এইড অফিসার আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রচলিত আইনের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোনো বিষয় প্রেরণ করা হইলে উহা নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের থাকিবে।" কিন্তু শুধুমাত্র এরূপ বিধান অপর্যাপ্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কিরূপ মামলা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এর নিকট প্রেরণ করবে, কি পদ্ধতিতে প্রেরণ করবে এবং লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মীমাংসা চুক্তির কার্যকারিতা কিভাবে হবে ইত্যাদি আইনে উল্লেখ না থাকায় লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক পরিচালিত মধ্যস্থতা কার্যক্রমের বিঘ্ন ঘটছে। কমিশন এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ৩ টি সমস্যাকে মূল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখছে:

প্রথমত, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট কিরূপ মামলা প্রেরণ করবে তৎসংক্রান্ত কোনো বিধান নেই;
দ্বিতীয়ত, লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক পরিচালিত মধ্যস্থতার কার্যপদ্ধতি আইনে বর্ণিত নেই;
তৃতীয়ত, লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মধ্যস্থতার মাধ্যমে গৃহীত চুক্তি বলবৎকরণ সম্পর্কিত কোনো বিধান নেই;

(ঘ) আপীলের বিধান: জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক আইন সহায়তার আবেদন প্রত্যাখাত হলে আইন অনুযায়ী উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের নিকট আপীল করতে হয়। গরিব ও অসহায় জনগণের জন্য বোর্ডে আবেদন করা খুবই কঠিন। আপীলের এরূপ বিধানটি আরো সহজতর হওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে আপীলের বিষয়টি জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের পরিবর্তে প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট করার বিধান সন্নিবেশিত করা যেতে পারে।

৬.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

(ক) সংস্থার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এই সংস্থার অধীনে ১টি সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, ৬৪ টি জেলা কমিটি, ১০ টি শ্রম আদালত কমিটি, ২৩ চৌকি আদালত কমিটি, ৪৯৫টি উপজেলা কমিটি এবং ৪৫৭৮টি ইউনিয়ন কমিটি রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত। দেশের সকল আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটির কার্যক্রম চালু রয়েছে। সংস্থাকে বিচার বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগ ও দপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। পুলিশ, প্রশাসন, কারাগার, বার এসোসিয়েশন, প্রসিকিউশনসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থার বিভিন্ন ধরণের সমন্বয়মূলক কার্যক্রম রয়েছে। বর্তমানে সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যাপ্তি এত বিস্তৃত হয়েছে যে, সংস্থার মাধ্যমে এগুলো নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

(খ) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল: বর্তমানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মোট জনবলের সংখ্যা ৩২৮ জন। তন্মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জনবল সংখ্যা ৩২ জন এবং সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মিলে জনবল মোট সংখ্যা ২৯৬ জন। তাছাড়া সংস্থার অধীনে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কমিটি রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে এত স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে সুপ্রীমকোর্টসহ সারাদেশের এতগুলো জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সম্ভব নয়। এ কারণে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করে জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৬.৩ কার্যকর ও মানসম্মত আইনি সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

(ক) সেবা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা: সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে প্রদত্ত সেবা নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সেবার ধরন	সেবা প্রাপক ব্যক্তি
১.	আইনগত তথ্য সেবা	যে কোনো ব্যক্তি
২.	আইনগত পরামর্শ সেবা	যে কোনো ব্যক্তি
৩.	মামলা দায়ের ও পরিচালনা	সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত ব্যক্তি
৪.	মামলাপূর্ব মীমাংসা বা মধ্যস্থতা	যে কোনো ব্যক্তি
৫.	মামলা পরবর্তী মীমাংসা বা মধ্যস্থতা	মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ
৬.	আইনগত সহায়তা প্রাপকের পক্ষে নিম্নোক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়: (ক) নিযুক্তীয় প্যানেল আইনজীবীর ফি পরিশোধ (খ) ফিক্সড কোর্ট ফি (গ) ডিএনএ টেস্ট এর ব্যয় (ঘ) সিআর মামলায় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির ব্যয় (ঙ) মামলা দায়ের ও পরিচালনা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়	

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উল্লিখিত সেবাগুলো প্রদান করা হলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্থার সেবা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। 'আইনগত সহায়তা'র সংজ্ঞায় মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হলেও ফি পরিশোধ সংক্রান্ত তালিকায় এসব বিষয়ে কোনো খাতের উল্লেখ নেই। ফলে গরিব ও অসহায় বিচারপ্রার্থীগণ এ্যাড ভেলোরেম কোর্ট ফি, সাক্ষী খরচ, জাবেদা নকল উত্তোলনের খরচ ইত্যাদি সরকারি তহবিল থেকে না পাওয়ায় বিভিন্ন মামলায় কাঙ্খিত প্রতিকার পাচ্ছেনা। কাজেই প্রাসঙ্গিক খরচ এর যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে উক্ত খাতগুলো ফি পরিশোধ সংক্রান্ত প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এই ক্ষেত্রে কমিশন মনে করে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যমান সরকারি আইনি সেবার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত সেবাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন:

ক্রমিক	আইনগত সহায়তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন
১.	এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি
২.	সাক্ষীর খরচ
৩.	এজাহার, আরজি, রায়, ডিক্রি ইত্যাদির জাবেদা নকল বিনামূল্যে অথবা লিগ্যাল এইডের তহবিল হতে উত্তোলনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
৪.	মামলার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ও দলিলাদি সংগ্রহের খরচ

(খ) অফিসার ও সহায়ক কর্মচারি সংকট: বর্তমানে প্রত্যেক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ১ জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও ১ জন জারিকারকের পদ রয়েছে। এছাড়া ৩২ টি জেলায় বেঞ্চ সহকারির পদ থাকলেও অপর ৩২ টি জেলায় বেঞ্চ সহকারির কোনো পদ নেই। অধিকন্তু

ইতিপূর্বে প্রত্যেক জেলায় ১ জন করে অফিস সহায়কের পদ থাকলেও উক্ত পদগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে। তীব্র জনবল সংকটে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক পরিচালিত মীমাংসা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমের বিস্তৃতি, আইনগত তথ্য ও পরামর্শ সেবা গ্রহীতার ব্যাপকতা, জেলা কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির তদারকি, লিগ্যাল এইড অফিসের প্রাত্যহিক কার্যাবলি সম্পাদন, অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন এবং প্রচার-প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন ১ জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যেহেতু লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে মীমাংসা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে সেহেতু লিগ্যাল এইড অফিসারসহ সহায়ক কর্মচারি পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(গ) লিগ্যাল এইড অফিসের স্থান ও অবকাঠামো সংকট: বেশির ভাগ জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নবনির্মিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে অবস্থিত। কিছু কিছু জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মিত না হওয়ায় জেলা জজ আদালতের ছোট একটি কক্ষ থেকে এই অফিসের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এতে বিচারপ্রার্থীদের বেশ অসুবিধা পোহাতে হচ্ছে। তদুপরি অধিকাংশ লিগ্যাল এইড অফিসে পৃথক কোনো মেডিয়েশন চেম্বার নেই। মীমাংসা কার্যক্রমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে আদর্শ মেডিয়েশন চেম্বারের বিকল্প নেই। একাধিক লিগ্যাল এইড অফিসারের দপ্তরসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক মেডিয়েশন চেম্বার এবং সেবাগ্রহীতা নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষের উপযোগী কক্ষসমৃদ্ধ লিগ্যাল এইড অফিস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অনেক জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস জেলা জজ আদালত ভবন বা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত। আইনগত সহায়তার জন্য গ্রাম-গঞ্জ বা তৃণমূল পর্যায় থেকে ছুটে আসা হত দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নারী, শিশু কিংবা বয়স্ক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের পক্ষে লিগ্যাল এইড অফিস খুঁজে পাওয়া এবং ভবনের উপরের ফ্লোরে উঠা-নামা করা খুবই কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় জেলা পর্যায়ের লিগ্যাল এইড অফিস ভবনের নীচ তলায় বা ২য় তলায় স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

(ঘ) প্যানেল আইনজীবীদের ফি অপর্যাপ্ত: সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সংস্থার প্যানেল আইনজীবীগণ বিভিন্ন আদালতে গরিব বিচারপ্রার্থীগণের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু বিদ্যমান ফি এতই অপ্রতুল যে পেশাদার, অভিজ্ঞ ও মানসম্পন্ন আইনজীবীগণের অনেকে লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনা করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। আবার অনেক আইনজীবী লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনা করলেও বিদ্যমান ফি'র অপ্রতুলতার কারণে গুরুত্বের সাথে মামলায় পদক্ষেপ নেন না বা আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন না। এতে আইন সহায়তা গ্রহীতাগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং মানসম্মত আইনি সেবা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

৬.৪ লিগ্যাল এইড অফিস: এডিআর বাস্তবায়নে নব দিগন্ত

সরকারি আইনি সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি সারা দেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংস্থার অধীন 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিস' কে ঘিরে বিচারপ্রার্থী মানুষের মাঝে আশার আলো সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিচারপ্রার্থী মানুষের জন্য মানসম্মত আইনি সেবা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সংস্থা ২০১৩ সালে আইন সংশোধন করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকেও সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এরপর থেকে মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড অফিস এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। লিগ্যাল এইড অফিসকে ঘিরে এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ২০১৩ সালে আইন সংশোধনের মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ কল্পে ২০১৪ সালে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ

বর্তমানে মধ্যস্থতার মাধ্যমে দুই রকম বিরোধ নিষ্পত্তি করছে। প্রথমটি হলো মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা বা Pre-case Mediation এবং দ্বিতীয়টি হলো মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা বা Post-case Mediation মামলা পূর্ব মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড অফিস দরিদ্র বিচারপ্রার্থী মানুষের জন্য একটি আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে ৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মীমাংসা/মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিগত ১০ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধ পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মীমাংসা/মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধের পরিসংখ্যান

সাল	প্রাপ্ত বিরোধের সংখ্যা (প্রি-কেইস)	প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা (পোস্ট কেইস)	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা (প্রি-কেইস)	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা (পোস্ট কেইস)	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা		এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধে আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ
					প্রি-কেইস	পোস্ট কেইস	
২০১৫	৪৫৪	২৫১	৩৩৬	১৯০	২৯০	১৬৮	৬৮,০১,৪০০
২০১৬	২,২৭৬	৩৩৩	১,৮৩২	২৭০	১,৪২০	২৯৪	২,০৪,২১,৭০০
২০১৭	৩,৮৪১	৩২১	৩,৫৭২	২৯২	২,৩৪২	২৬৮	৩,৯৬,৩৬,৮৪৯
২০১৮	৫,৯৯২	৫১৬	৪,৮৭৭	৪৬৭	৭,৪৭৪	৮২৩	৬,৯৬,১৬,৬৯৯
২০১৯	১১,৯৯৯	১,২৬৫	১০,৪০৩	৯৩২	১৮,৪৩৫	১,৫৬৫	১৩,২৭,৯৯,২৮৯
২০২০	১২,৩০৬	১,৮৭০	১০,৮৯৩	১,৭৪০	২১,০৯৮	৩,৩৫৫	১৯,৫৪,৬৯,৮৪৫
২০২১	১৩,৩৮৭	১,৯৯৩	১২,৪২৮	১,৮৯৬	২৪,৭১৭	৫,০২৩	২৭,১৪,৬৪,৯২৯
২০২২	২০,৫৩৬	৪,৫১২	১৯,৩৫২	৪,১৮৪	৪১,০৮২	১০,৩৫৫	৩৯,২৮,২২,১০৩
২০২৩	২৫,৮৭৮	৬,০২৪	২৪,১২৬	৫,৬৮৭	৪৭,১২৩	১১,৩৩৩	৫৩,০৭,৩১,৩৫৬
২০২৪ (নভেম্বর)	২৭,১৪৫	৫,২৯১	২৪,৯১৩	৪,৯৫৭	৪৬,৫৯৪	১২,৩২২	৫৬,১১,১৬,৭৮৯
মোট	১,২৩,৮১৪	২২,৩৭৬	১,১২,৭৩২	২০,৬১৫	২,১০,৫৭৫	৪৫,৫০৬	২২২,০৮,৮০,৯৫৯

উপরিউক্ত ছকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পদ সৃজন হওয়ার পর থেকে বিগত ১০ বছরে লিগ্যাল এইড অফিসারগণ ১,৪৬,১৯০ (এক লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার একশত নব্বই) টি মামলা ও বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে তম্মধ্যে ১,৩৩,৩৪৭ (এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত সাতচল্লিশ) টি মামলা ও বিরোধ তারা সফলভাবে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ কর্তৃক এডিআর এর মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির সাফল্যের হার ৯১.২১%। এছাড়া বিভিন্ন মামলা বা বিরোধে ক্ষতিপূরণ বা পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রেও জেলা লিগ্যাল এইড অফিস অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মীমাংসা/মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত প্রি-কেইস ও পোস্ট-কেইস মিলে লিগ্যাল এইড অফিসারগণ বিগত ১০ বছরে ২২২,০৮,৮০,৯৫৯.০০ (দুইশত বাইশ কোটি আট লক্ষ আশি হাজার নয়শত ঊনষাট) টাকা পাওনা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে এটি খুবই আশাব্যঞ্জক।

বিদ্যমান অবস্থায় লিগ্যাল এইড অফিসকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬.৫ প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

সুপ্রীম কোর্টসহ দেশের মাঠ পর্যায়ে অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নবর্ণিত ৪ ধরণের লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিস থাকবে:

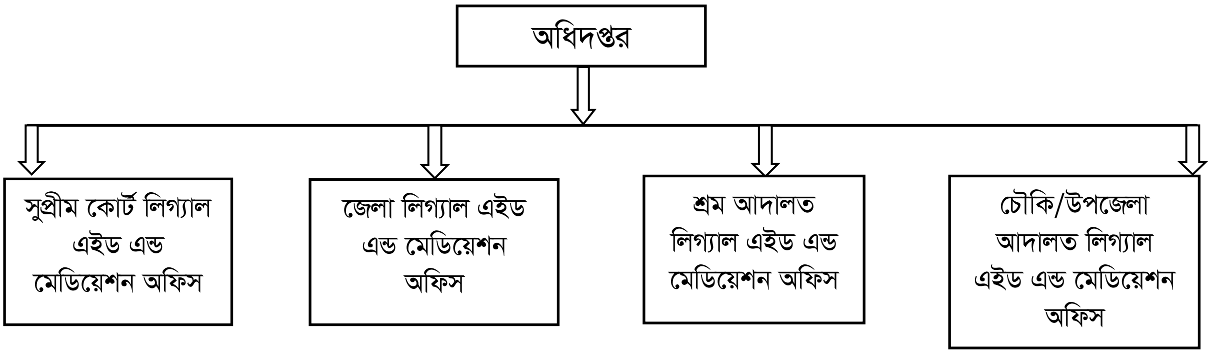

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত দপ্তরগুলো থাকবে:

১। মহাপরিচালকের দপ্তর

২। পরিচালকদের দপ্তর:

- ক. পরিচালক (প্রশাসন)
- খ. পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)
- গ. পরিচালক (মনিটরিং)
- ঘ. পরিচালক (প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)
- ঙ. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

৩। পরিচালক (প্রশাসন) এর আওতাধীন দপ্তর:

ক. উপ-পরিচালক (প্রশাসন-১) (নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি)
- সহকারি পরিচালক-১
- সহকারি পরিচালক-২

খ. উপ-পরিচালক (প্রশাসন-২) (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃঙ্খলা)
- সহকারি পরিচালক-১

গ. উপ-পরিচালক (প্রশাসন-৩) (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং ক্রয়)
- সহকারি পরিচালক-১

৪। পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) এর আওতাধীন দপ্তর:

ক. উপ-পরিচালক-১ (বাজেট)
- সহকারি পরিচালক-১

- সহকারি পরিচালক-২

খ. উপ-পরিচালক-২ (নিরীক্ষা)
- সহকারি পরিচালক-১

৫। পরিচালক (মনিটরিং) এর আওতাধীন দপ্তর:
ক. উপ-পরিচালক-১ (লিগ্যাল এইড)
- সহকারি পরিচালক-১
- সহকারি পরিচালক-২

খ. উপ-পরিচালক-২ (মেডিয়েশন)
- সহকারি পরিচালক-১
- সহকারি পরিচালক-২

৬। পরিচালক (প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) এর আওতাধীন দপ্তর:
ক. উপ-পরিচালক-১ (প্রকাশনা)
- সহকারি পরিচালক-১
- সহকারি পরিচালক-২

খ. উপ-পরিচালক-২ (প্রশিক্ষণ)
- সহকারি পরিচালক-১

৭। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর আওতাধীন দপ্তর:
ক. উপ-পরিচালক-১ (পরিকল্পনা)
- সহকারি পরিচালক-১
- সহকারি পরিচালক-২

খ. উপ-পরিচালক-২ (উন্নয়ন)
- সহকারি পরিচালক (উন্নয়ন)

মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারি পরিচালকদের প্রত্যেকটি দপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো স্থির করে উক্ত পদগুলো সৃষ্টি করতে হবে।

৬.৬ সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য ১৫ জনের জনবল কাঠামো সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত জনবল কাঠামোতে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন প্রধান লিগ্যাল এইড অফিসার, যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন কোর্ট এসিস্ট্যান্ট, ১ জন রেকর্ড কিপার, ১ জন হিসবারক্ষক, ৩ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. জেলা লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিসের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলার ক্ষেত্রে

দেশের ৮টি বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ) ৪ জন করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার থাকবে, যাদের পদবী ও কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

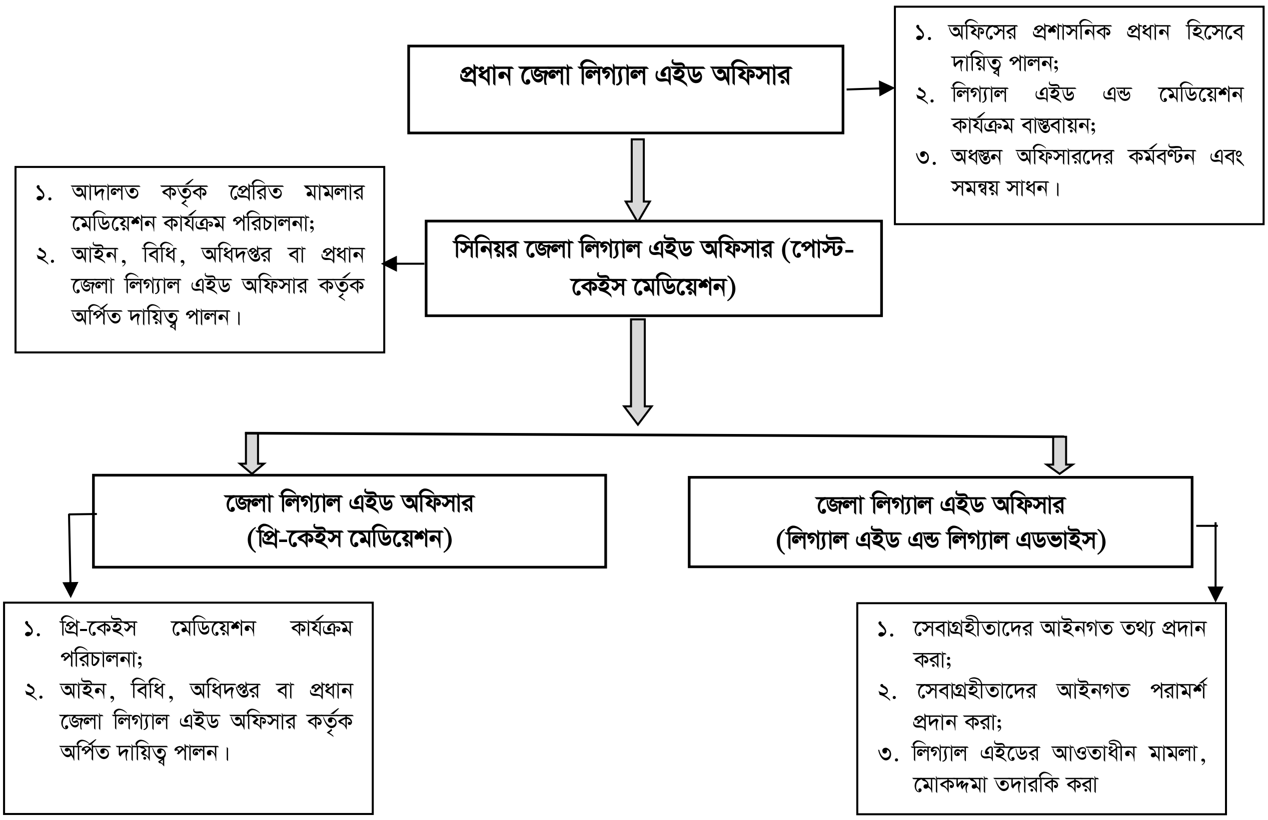

অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে:

বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলা বাদে দেশের অন্যান্য জেলায় ৩ জন করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার থাকবে, যাদের পদবি ও কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ:

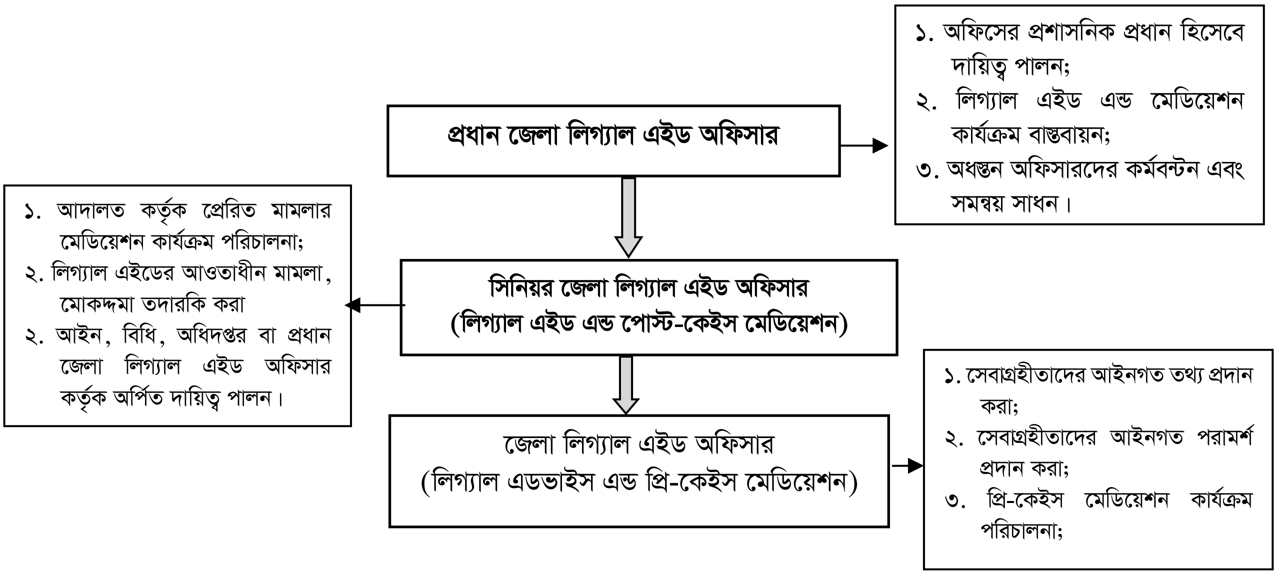

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে উল্লিখিত ৮টি জেলার প্রত্যেকটিতে ৪ জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন প্রধান জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন সিনিয়র জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এবং সহকারি/সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ২জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার) এবং অবশিষ্ট ৫৬টি জেলার প্রত্যেকটি ৩জন করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পদসহ ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ জন হিসাবরক্ষক, ৩ জন বেঞ্চ সহকারি, ১ জন সার্ভেয়ার, ২ জন জারিকারক, ৩ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. শ্রম আদালত ও চৌকি/উপজেলা আদালত লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

শ্রম আদালত লিগ্যাল এইড অফিস এবং চৌকি/উপজেলা আদালত লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য ৪ জনের জনবল কাঠামো সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত জনবল কাঠামোতে সিনিয়র সহকারি জজ/সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ

১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মেডিয়েশন কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিককরণের লক্ষ্যে সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করতে হবে।

২. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিতক্রমে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার বিধান সম্বলিত একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সন্নিবেশিত করে আইনের একটি খসড়া পরিশিষ্ট ৫ এ সংযোজন করা হয়েছে।

৩. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলায় ৪ জন এবং অন্যান্য জেলায় ৩ জন লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন প্রধান লিগ্যাল এইড অফিসার, সিনিয়ন সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন সিনিয়র লিগ্যাল এইড অফিসার এবং সহকারি/সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার), ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ জন হিসাবরক্ষক, ৩ জন বেঞ্চ সহকারি, ১ জন সার্ভেয়ার, ২ জন জারিকারক, ৩ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

৪. প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের কার্যালয় নিজস্ব ভবনে স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, শ্রম আদালত লিগ্যাল এইড অফিস এবং চৌকি আদালত লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য পৃথক ভবন বা সুপ্রশস্ত অফিস কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকটি লিগ্যাল এইড অফিসে পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিস কক্ষ, ক্লায়েন্ট চেম্বার, মেডিয়েশন চেম্বার স্থাপন করতে হবে। উক্ত অফিসগুলোতে সভাকক্ষ, পাঠাগার, ব্রেস্ট ফিডিং রুমসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. আইনগত পরামর্শ প্রদান, মীমাংসা বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা, মধ্যস্থতা কৌশল, ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং ইত্যাদি বিষয়ে লিগ্যাল এইড অফিসারকে দেশে বিদেশে ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৬. লিগ্যাল এইড অফিসের আইনি সেবা এবং মীমাংসা ও মধ্যস্থতা সেবা সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরির জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নিতে হবে।

উনবিংশ অধ্যায়
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১. ভূমিকা

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থাকে বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করে বিশ্বের বহু দেশ তাদের মামলাজট নিয়ন্ত্রণসহ সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ ফেডারেল কোর্ট কোনো না কোনো পদ্ধতির এডিআর ব্যবস্থা অনুসরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে এখনই এডিআর ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই বাংলাদেশে ক্রম বর্ধমান মামলার জট কমাতে, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, ব্যয়বহুলতা ও জটিলতা নিরসন করে দ্রুত মামলার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হলে বিস্তৃত পরিসরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার চালুর কোনো বিকল্প নেই।

২. বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

মামলার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস ও মামলাজট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার ২০০৩ সালে দেওয়ানি কার্যবিধিতে এডিআর ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধান যুক্ত হয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯এ এবং ৮৯বি সংযোজনের মাধ্যমে বিচারিক আদালতে এডিআর এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। এরপর ২০০৬ সালে ধারা ৮৯সি সংযুক্ত করে আপীল আদালতকেও এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ২০১২ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে দেওয়ানি কার্যবিধিতে এডিআর ব্যবস্থার ক্ষেত্র ও পরিধি আরো সম্প্রসারিত করা হয়। আপোশ-মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি পূর্বে ঐচ্ছিক থাকলেও এ সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়। দেওয়ানি কার্যবিধিতে ধারা ৮৯এ সংশোধন করতঃ May এর পরিবর্তে Shall প্রতিস্থাপন করা হয়। ২০১২ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ৮৯এ তে আরো কিছু বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়। এগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্তকরণ, মধ্যস্থতাকারীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ, মীমাংসা চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারণ, মধ্যস্থতা কার্যক্রমের ফলাফল আদালতকে অবহিতকরণ উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ ২০১৭ সালে ধারা ৮৯এ সংশোধনপূর্বক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে লিগ্যাল এইড অফিসারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে সালিস আইন প্রণয়ন করা হয়। এরপর ২০০৩ সালে প্রণীত অর্থঋণ আদালত আইনেও মধ্যস্থতার মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ আদায়ের মামলা নিষ্পত্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়। উক্ত আইনের ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ৩৮ ধারায় মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। ২০১০ সালে ৪৪ক ধারা সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে অর্থঋণ আদালতের মামলায় আপীল বা রিভিশন পর্যায়েও মধ্যস্থতার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের ছোট-খাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করে ২০০৪ সালে বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন এবং ২০০৬ সালে গ্রাম আদালত আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনের ২১০ ধারায় সীমিত আকারে আপোশ মীমাংসার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২০১৩ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ সংশোধন করে এতে নুতন করে ২১ক ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উক্ত ধারায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২৩ সালে প্রণীত পারিবরিক আদালত আইনের ১১ ধারায় বিচার পূর্ব শুনানিকালে পক্ষগণের মধ্যে আপোশ মীমাংসার চেষ্টা, ১৪ ধারায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আপোশ মীমাংসার পুনঃপ্রচেষ্টা এবং ১৫ ধারায় আপোশ বা মীমাংসা চুক্তির ভিত্তিতে ডিক্রির বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২০২৩ সালের আয়কর আইনে ১৩টি ধারা সম্বলিত তৃতীয় অধ্যায় নামে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কিন্তু সরকারের এত উদ্যোগ সত্ত্বেও দেশে এডিআর ব্যবস্থা এখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। আইন কমিশনের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এডিআরের মাধ্যমে ঢাকা ও গাজীপুরে মামলা নিষ্পত্তির হার মাত্র ০% থকে ২.৫%। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০২৩ সালে এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৫,১৫৮টি। এটি ঐ বছরের নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলা সংখ্যার ১.৪%। এডিআর এর সুফল সম্পর্কে বিচারক, বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী-কেউই সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল নন। এ কারণে এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির জন্য মানুষ ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসছে না। এখনো সনাতনী পদ্ধতিতে কেবল রায়ের মাধ্যমেই মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। ফলে মামলাজট বাড়ছে।

<u>বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান সম্বলিত আইনের তালিকা</u>

ক্রম	আইনের নাম	এডিআর বিধান সংশ্লিষ্ট ধারা
১.	দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮	৮৯এ, ৮৯বি ও ৮৯সি
২.	সালিশ আইন, ২০০১	
৩.	অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩	২২-২৫
৪.	পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩	১১, ১৪, ১৫
৫.	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১	৬ ও ৭
৬.	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬	৬খ
৭.	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬	২১০
৮.	কাস্টমস আইন, ২০২৩	২১৬-২১৯
৯.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২	১১৯, ১২৫
১০.	আয়কর আইন, ২০২৩	২৯৬-৩০৮
১১.	রিয়্যাল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	৩৬
১২.	বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪	৩

৩. বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান: আদালত ও লিগ্যাল এইড অফিস

(ক) সারাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ

সাল	নিষ্পত্তিকৃত দেওয়ানি মামলার মোট সংখ্যা	এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি	এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির শতকরা হার
২০২০	১,৪৫,০৮৫	৩,৪৯২	২.৪%
২০২১	১,৭৭,৩৯১	৪,১৭০	২.৩%

২০২২	৩,৩২,৮২৩	৫,৭৫৩	১.৭%
২০২৩	৩,৪৯,৬৬১	৫,১৫৮	১.৪%

(খ) জেলা লিগ্যাল এইড অফিস

সাল	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা (প্রি-কেইস)	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা (পোস্ট কেইস)	(২) + (৩)	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধে আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ	এডিআর এর ফলে প্রত্যাহারকৃত মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০২০	১০,৮৯৩	১,৭৪০	১২,৬৩৩	১৯,৫৪,৬৯,৮৪৫	৬৪৭
২০২১	১২,৪২৮	১,৮৯৬	১৪,৩২৪	২৭,১৪,৬৪,৯২৯	৯২৫
২০২২	১৯,৩৫২	৪,১৮৪	২৩,৫৩৬	৩৯,২৮,২২,১০৩	১,৪৬১
২০২৩	২৪,১২৬	৫,৬৮৭	২৯,৮১৩	৫৩,০৭,৩১,৩৫৬	১,৫৩৭

(গ) বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি: আদালত ও লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যে তুলনা

সাল	সারাদেশের আদালতসমূহ কর্তৃক এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৬৪ টি লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/ বিরোধের শতকরা হার	
			আদালত	লিগ্যাল এইড অফিস
২০২০	৩,৪৯২	১২৬৩৩	২১.৬৫%	৭৮.৩৪%
২০২১	৪,১৭০	১৪৩২৪	২২.৫৫%	৭৭.৪৫%
২০২২	৫,৭৫৩	২৩৫৩৬	১৯.৬৪%	৮০.৩৬%
২০২৩	৫,১৫৮	২৯৮১৩	১৪.৭৫%	৮৫.২৫%

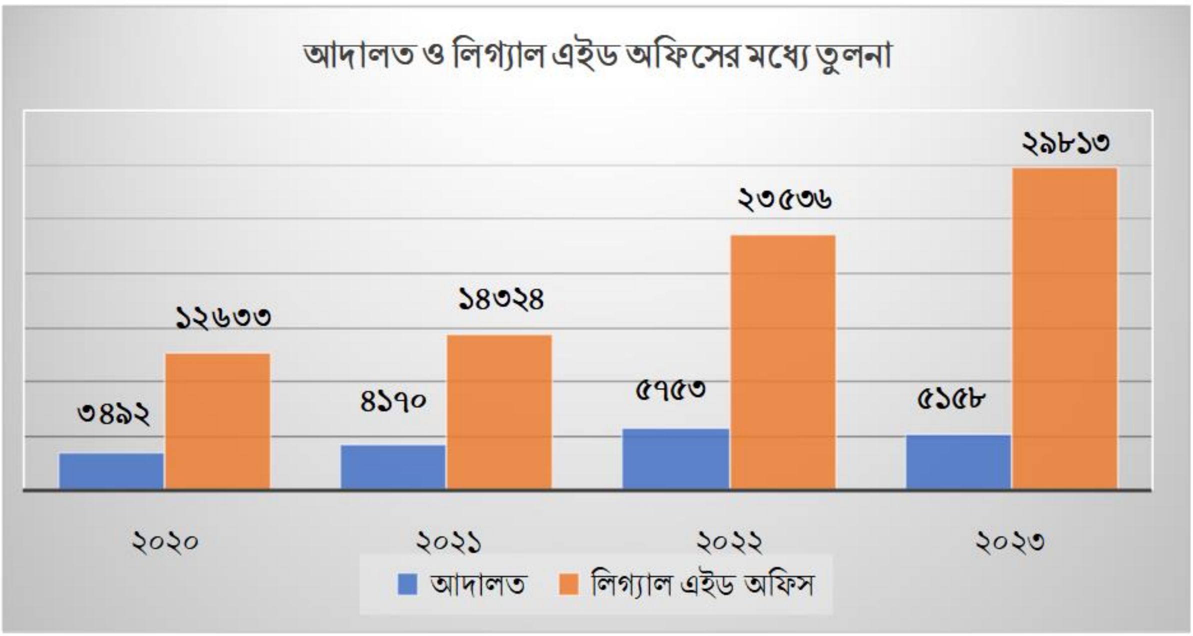

৪ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনা

৪.১ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য: উল্লিখিত পরিসংখ্যান এবং আদালত ও লিগ্যাল এইড অফিসের তুলনামূলক চিত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রচলিত আদালত পদ্ধতির মাধ্যমে এডিআর কার্যক্রম খুব একটা সফল হয়নি। তবে, লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে সীমিত আকারে গৃহীত উদ্যোগের সাফল্য সন্তোষজনক। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ও টেকসই সমাধান, দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস এবং সর্বোপরি সামাজিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি রক্ষায় দেশে একটি শক্তিশালী এডিআর ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই এবং সেই প্রক্রিয়াই জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

৪.২ বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ: এটি সত্য যে, এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে বাংলাদেশে বেশ কিছু আইনে পদ্ধতিগত বিধানাবলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এটি মোটেও যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটি পরিষ্কার যে, কেবল আইন প্রণয়ন বা আইনি সংস্কার করে সামাজিকভাবে কোনো বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এডিআর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিরাজমান মৌলিক সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

- এডিআর বা মধ্যস্থতা বিষয়ক পৃথক কোনো আইন নেই;
- এডিআর বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন এবং প্রচার-প্রসারের জন্য সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান নেই;
- আদালত ব্যতীত এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির স্বীকৃত কোনো আইনি কাঠামো নেই;
- দেশে প্রশিক্ষিত মধ্যস্থতাকারীর অভাব;
- মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আইনজীবীগণের প্রতি মামলার পক্ষগণের আস্থার অভাব;
- মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিগত বিষয়াবলি সম্বলিত কোনো বিধিমালা নেই;
- এডিআর এর মাধ্যমে সফল মামলা নিষ্পত্তি সত্ত্বেও বিচারকদের কৃতিত্ব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না;
- মধ্যস্থতাকারীর ফি পরিশোধের বিষয়ে কোনো নীতিমালা বা নির্দেশনা নেই;
- মধ্যস্থতার জন্য অফিস, জনবল ও সরঞ্জামাদিসহ ভৌত অবকাঠামো সুবিধা সম্বলিত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই।

৪.৩ অন্যান্য দেশে এডিআর বিষয়ক স্বতন্ত্র আইন এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে মামলা বা বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য এডিআর ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে বেশ আগেই। ইতিপূর্বে তারা বিভিন্ন আইনে এডিআর এর বিধান সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও এটিকে আরো কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সহজতর করার লক্ষ্যে ইদানিং তারা এডিআর বা মধ্যস্থতা বিষয়ক স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের দিকে অগ্রসর হয়েছে। কিছু কিছু দেশ স্বতন্ত্র এডিআর আইনের পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করেছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশের এডিআর বিষয়ক প্রণীত আইনের একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

দেশের নাম	এডিআর বা মধ্যস্থতা বিষয়ক প্রণীত আইন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	Alternative Dispute Resolution Act, 1998
সিঙ্গাপুর	Mediation Act, 2017
মালয়েশিয়া	Mediation Act, 2012

দেশের নাম	এডিআর বা মধ্যস্থতা বিষয়ক প্রণীত আইন
ভারত	Mediation Act, 2023
পাকিস্তান	Alternative Dispute Resolution Act, 2017
নেপাল	Mediation Act, 2068 of 2011
শ্রীলংকা	• Mediation Board Act 72 of 1988 • Commercial Mediation of Sri Lanka Act 44 of 2000 • Mediation (Special Categories of Disputes) Act 21 of 2003

উপরিউক্তাক্ত দেশগুলো এডিআর বা মধ্যস্থতা বিষয়ক আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হয়নি, অনেকগুলো দেশ এডিআর আইন বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি দেশের এডিআর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	দেশের নাম	মধ্যস্থতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান
১.	শ্রীলংকা	Mediation Board Commission
২.	নেপাল	Mediation Council
৩.	ভারত	Mediation Council of India

এডিআর বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠান বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার, পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মধ্যস্থতাকারী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স বা স্বীকৃতি প্রদান, মধ্যস্থতার কার্যপ্রণালী প্রণয়ন এবং মধ্যস্থতাকারীগণের জন্য সম্মানী নির্ধারণসহ মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

৫. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

৫.১ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন: বিকল্প বিরোধ পদ্ধতির মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশে চার ধরনের পদ্ধতি থাকলেও বেশির ভাগ দেওয়ানি ও পারিবারিক আইনে মধ্যস্থতার বিধান সন্নিবেশিত আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ। বর্তমানে মধ্যস্থতা সংক্রান্ত কোনো আইন না থাকার ফলে নিম্নরূপ সমস্যা দেখা দিচ্ছে:

- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা যাচ্ছেনা;
- পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি হচ্ছেনা;
- সব রকমের মধ্যস্থতা চুক্তি আইনি প্রক্রিয়ায় বলবৎ করা যাচ্ছেনা;
- মধ্যস্থতার বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাচ্ছেনা।

সামগ্রিক বিবেচনায়, উল্লিখিত সমস্যাসমূহ দূরীভূত করে বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য মধ্যস্থতা (Mediation) বিষয়ক একটি আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। যেহেতু লিগ্যাল এইড অফিসারগণ মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা দীর্ঘ ১০ বছর যাবত মীমাংসা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণী এবং তদারকিমূলক কাজ করে যাচ্ছে সেহেতু আইনগত সহায়তা প্রদান আইন,

২০০০ প্রতিস্থাপন করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তির আরো বৃহত্তর ক্ষেত্র তৈরি করার লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত নতুন একটি আইন তৈরি করা প্রয়োজন।

৫.২ প্রস্তাবিত আইনের বিষয়বস্তু

১. সুপ্রীম কোর্ট, জেলা আদালত, শ্রম আদালত ও চৌকি আদালত এবং প্রস্তাবিত উপজেলা আদালতে কার্যকর আইনি সেবা নিশ্চিতকরণ;
২. আইনগত সহায়তার ক্ষেত্র ও পরিধি বৃদ্ধি;
৩. লিগ্যাল এইড অফিসারকে আইনগত পরামর্শ এবং মধ্যস্থতার (Pre-case এবং Post-case mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান;
৪. Pre-case এবং Post-case mediation এর পদ্ধতি নির্ধারণ;
৫. বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ;
৬. মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রচার, প্রসার ও সহজীকরণ;
৭. মধ্যস্থতার মাধ্যমে গৃহীত চুক্তি বলবৎকরণ;
৮. পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৯.মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণকে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য 'অ্যাক্রেডেটিশন কমিটি' গঠন;
১০. মধ্যস্থতাকারীকে সার্টিফিকেট বা স্বীকৃতি (Accreditation) প্রদান;
১১. মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
১২. মধ্যস্থতার জন্য মামলা প্রেরণের বিষয়ে আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে ক্ষমতা প্রদান;
১৩. মধ্যস্থতার জন্য উপযুক্ত বিরোধ বা মামলার তপশিল অন্তর্ভুক্তি;
১৪. মধ্যস্থতার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ;
১৫. জেলা ভিত্তিক মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী প্যানেল তৈরির পদ্ধতি নির্ধারণ;
১৬. মধ্যস্থতাযোগ্য মামলাসমূহ চিহ্নিতকরণ;
১৭. মধ্যস্থতাকারীর সম্মানী নির্ধারণের বিধান;
১৮. মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

৫.৩ প্রস্তাবিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

৫.৩.১ কারা মধ্যস্থতাকারী (Mediator) হবেন

- মামলা পূর্ব ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতার (Both pre-case and post case mediation) ক্ষেত্রে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার।
- মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতার (Post-case mediation) ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনের আওতায় লাইসেন্স/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (Accredited) মধ্যস্থতাকারীগণ।

৫.৩.২ প্রস্তাবিত আইনে কি ধরণের মধ্যস্থতা সন্নিবেশিত হবে

মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-Case Mediation)

- বর্তমানে মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের বিধান যেমন: দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৮৯এ ধারা, অর্থঋণ আদালত আইনের ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ৩৮ ধারা, পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ এর ১১ ও ১৪ ধারাসহ অন্যান্য আইনে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির যে সব বিধান রয়েছে এগুলো কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে নিষ্পত্তিকরণ।

- আইনের তফসিলে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য একটি দেওয়ানি মামলার তালিকা (List of civil cases fit for mediation) এবং একটি আপোশযোগ্য ফৌজদারি মামলার তালিকা প্রদান।

মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-Case Mediation)

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ২১ক ধারা অনুসারে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ মামলা পূর্ব বিরোধ (Pre-Case) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেন। কিন্তু পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত মধ্যস্থতা চুক্তিটি আইনি কাঠামোতে বলবৎকরণের বিধান না থাকায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যস্থতা কার্যক্রম কাঙ্খিত মাত্রায় সফল হচ্ছে না। লিগ্যাল এইড অফিসারগণ কর্তৃক মামলা পূর্ব মধ্যস্থতার (Pre-Case) মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের মীমাংসা চুক্তি বলবৎকরণের পদ্ধতি প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

৫.৩.৩ মধ্যস্থতাযোগ্য মামলা প্রেরণের বিষয়ে আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা সম্বলিত বিধান

প্রস্তাবিত আইনের তফসিলে যেসব দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলা এবং আপোশযোগ্য ফৌজদারি মামলা সন্নিবেশিত করা হবে সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মামলার যে কোনো পর্যায়ে মধ্যস্থতার জন্য মধ্যস্থতাকারীগণের নিকট অনুরূপ মামলা প্রেরণ করতে পারবে মর্মে বিধান সন্নিবেশিতকরণ।

৫.৩.৪ মধ্যস্থতা চুক্তি বলবৎকরণের বিধান

মধ্যস্থতার মাধ্যমে তৈরিকৃত, পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রত্যয়িত (Authenticated) মীমাংসা চুক্তি চূড়ান্ত এবং পক্ষগণের উপর বাধ্যকর মর্মে গণ্য হবে। এছাড়া চুক্তির যে কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে মীমাংসা চুক্তিটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য হবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে সম্পাদিত সকল চুক্তি দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধান অনুসারে এরূপভাবে বলবৎযোগ্য হবে যেন এটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা রায়। এই উদ্দেশ্যে:

- মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতার (Post-Case Mediation) ক্ষেত্রে যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল থেকে মামলাটি প্রেরিত হয়েছে মধ্যস্থতা পরবর্তী কার্যক্রম বা বলবৎকরণের জন্য এটি সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রেরিত হবে;
- মামলা পূর্ববর্তী মধ্যস্থতার (Pre-Case Mediation) ক্ষেত্রে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মীমাংসা চুক্তির বিষয়বস্তু যে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন সে আদালত বা ট্রাইব্যুনালে জারি মামলা দায়েরের মাধ্যমে উক্ত চুক্তিটি বলবৎযোগ্য করা যাবে।

৫.৩.৫ মধ্যস্থতা চুক্তির চ্যালেঞ্জ বা এর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের

মধ্যস্থতা চুক্তিটি সাধারণভাবে আপীল বা চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়। তবে মধ্যস্থতা চুক্তিটি প্রতারণা (Fraud), দুর্নীতি (Corruption), মিথ্যা বা ভুয়া পরিচয়দানের (Impersonation) মাধ্যমে সম্পাদিত হলে এবং প্রস্তাবিত আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতাযোগ্য মামলা ব্যতিরেকে অন্যান্য মামলায় মধ্যস্থতা চুক্তি হলেই কেবল এটি চ্যালেঞ্জ করা যাবে।

৫.৩.৬ মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

মধ্যস্থতাকারী লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট (Accreditation) প্রদান, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্স নবায়ন, মধ্যস্থতাকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, মধ্যস্থতা কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার, মধ্যস্থতাকারীদের মানোন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বিধানসহ তাদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের উপর। মেডিয়েটরগণকে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান বা তালিকাভুক্তির জন্য 'অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে, যা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

(ক) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতি;
(খ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট- সদস্য;
(গ) সচিব, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল- সদস্য;
(ঘ) বাংলাদেশ পুলিশ এর মহা-পরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত ডিআইজি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা- সদস্য;
(ঙ) মহা-পরিচালক, লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর- সদস্য সচিব।

৫.৩.৭ মধ্যস্থতাযোগ্য মামলার তফসিল (Schedule of Cases Fit for Mediation)

৫.৩.৭.১ দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা ও বিরোধ

১. দেওয়ানি প্রকৃতির যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;
২. চুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;
৩. বাণিজ্যিক লেনদেন হতে সৃষ্ট যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;
৪. পারিবারিক আদালত আইন ২০২৩ এর অধীন পারিবারিক মোকদ্দমাসমূহ;
৫. বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ এর অধীন মোকদ্দমাসমূহ;
৬. জমিজমা সংক্রান্ত বণ্টন মোকদ্দমাসমূহ;
৭. The State Acquisition & Tenancy Act,1950 এর ধারা ৯৬ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তসমূহ;
৮. Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর ধারা ২৪ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তসমূহ;
৯. মুসলিম শরীয়া আইনের অধীন অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমাসমূহ;
১০. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৯, ১২, ১৩, ২১, ২১ক, ২২ ও ২৩ এর অধীন মোকদ্দমাসমূহ;
১১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২১০ এর অধীন উত্থিত শিল্প বিরোধসমূহ;
১২. পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে পিতা-মাতার ভরণপোষণ সংক্রান্ত দাবি;
১৩. ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন ২০১০ এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী শিল্প বিরোধ এবং ধারা ৪৩ অনুযায়ী ধর্মঘট বা লক আউট;
১৪. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ ও ২৩ অনুসারে অর্থঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিসমূহ;
১৫. দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী দেনাদার ও দেনার দায় মেটানো সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৫.৩.৭.২ ফৌজদারি মামলা ও বিরোধ

১. The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ৩৪৫ এর অধীন আপোশযোগ্য ফৌজদারি অপরাধসমূহ;
২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীন পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধসমূহ
৩. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ
৪. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন ধারা ৩২, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ এর অপরাধসমূহ
৫. বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭ এবং ৪০ এর অধীন অপরাধসমূহ
৬. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৭, ৮৯ ও ৯২ এর অধীন অপরাধসমূহ
৭. ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭, ৯, ১০ ও ১৩ এর অধীন অপরাধসমূহ

৬. ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে আপোশের পরিধি বিস্তৃতি: বর্তমানে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারা মোতাবেক কিছু অপরাধ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং কিছু অপরাধ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশের সুযোগ থাকলেও আদালত কর্তৃক স্বপ্রণোদিত হয়ে আপোশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইনি কোনো বিধান নেই। দণ্ডবিধিতে এরূপ অনেক মামলা রয়েছে যেগুলো ভিন্ন অপরাধের মধ্যে পড়লেও বস্তুতঃ পারিবারিক বা ভূমি

বিরোধের কারণেই এসব মামলার উদ্ভব হয়। এ জাতীয় বিপুল সংখ্যক মামলা ফৌজদারি আদালতে দায়ের হলেও সাক্ষীর অভাবে বছরের পর বছর বিচারাধীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত আসামীকে খালাস দেওয়া হয়। দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত এই জাতীয় অপরাধ বিচারের পূর্বে বা বিচার চলাকালে মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপোশের বিধান সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধিতে ৩৪৫ক নামে নতুন একটি ধারা সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। বিদ্যমান অবস্থায় গুরুতর প্রকৃতির নয় এরূপ ফৌজদারি অপরাধের বিষয়ে পক্ষদের নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপোশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দুটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। প্রথমতঃ বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আদালতে অত্যধিক মামলার চাপ বিবেচনায় নিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় উল্লিখিত আপোশযোগ্য মামলার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আদালত স্ব-উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের আবেদনের ভিত্তিতে মামলার বিরোধীয় বিষয়টি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণের বিধান ফৌজদারি কার্যবিধিতে সন্নিবেশিত করতে হবে।

৭. সালিস আইন, ২০০১ এর সংশোধন

ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে সালিস (arbitration) বিশ্বব্যাপি জনপ্রিয় একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। অভ্যন্তরীণ বিরোধ (অর্থাৎ, একই জাতীয়তার পক্ষের মধ্যে বিরোধ) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ (অর্থাৎ, বিরোধের অন্ততঃ একটি পক্ষ বিদেশি বা বিদেশিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) - এই উভয় প্রকারের বিরোধের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেই সালিস খুবই উপযোগী একটি পদ্ধতি। এর মাধ্যমে আদালতের স্বাভাবিক কার্য-পদ্ধতির বাইরে, পক্ষগুলোর নিজস্ব আয়োজনে, কম সময়ে ও কার্যকরভাবে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। ফলে, বিরোধের পক্ষগুলো যেমন লাভবান হয়, তেমনি আদালতের উপর বাণিজ্যিক মামলার চাপও অনেকাংশে হ্রাস পায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্ববর্তী সালিস আইন ১৯৪০-কে রহিত করে নতুন সালিস আইন ২০০১ প্রনীত হয়। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন বিষয়ক কমিশন (UNCITRAL) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাণিজ্যিক সালিস বিষয়ক আদর্শ আইন (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration)-কে বহুলাংশে অনুসরণ করে ২০০১ সালের আইনটি প্রনয়ন করা হয়। নতুন এই আইন কার্যকর হওয়ার পর নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক সালিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ কোনো বাণিজ্যিক চুক্তিতে বিদেশি বা বহুজাতিক কোনো প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকলে সে চুক্তিতে সাধারণত সালিসের বিধান রাখা হয়।

সালিস আইন ২০০১ -এ সালিসকারীদের জাতীয়তা, সালিসের স্থান, সালিশের কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বেশকিছু আধুনিক বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে বিদেশি জাতীয়তার অথবা বিদেশি মালিকানার বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান সালিসে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়। দেওয়ানি কার্যবিধিতে ৮৯বি ধারা সংশোধনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সালিস পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও সালিসের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অনেক বছর ধরেই সালিস আইন ২০০১-এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। আইন কমিশন তার ৬ষ্ঠ দ্বি-বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনায় (২০১২-২০১৩) সালিস আইন সংস্কারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আইন কমিশন "সালিশ আইন, ২০০১ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ খসড়া ও সুপারিশ" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর পর তিন বছর সময় অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত সংশোধনীগুলোকে আইনে সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি, যদিও সুপারিশগুলোর আলোকে সালিস আইনের সংস্কার করা হলে বাণিজ্যিক সালিস পদ্ধতি নিঃসন্দেহে আরো যুগপোযোগী ও কার্যকর হবে।

দুঃখজনক হলো, সালিশ আইনের বহুল প্রত্যাশিত সংস্কারের পরিবর্তে ইতোমধ্যে এমন কিছু আইন প্রনীত হয়েছে যা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সালিসের সুযোগকে সংকুচিত করেছে। যেমন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩-এর ৪০ ধারায় বিদ্যুৎ, গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিরোধকে

সালিসের পরিবর্তে ওই আইনের অধীনে গঠিত কমিশনে বাধ্যতামূলকভাবে প্রেরণের বিধান করা হয়েছে। একই ভাবে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১-এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সগুলোতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ওপর এখতিয়ার অর্পণ করা হয়েছে।

সালিস আইনের ৫৭ ধারায় এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়নের বিধান থাকলেও আজ পর্যন্ত সরকার এব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়নি। বিধিমালা না থাকায় এই আইনের অধীনে সালিস পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অভিন্ন কার্য-পদ্ধতি অনুসরণ না করে সালিস ট্রাইব্যুনালগুলো ভিন্ন ভিন্ন কার্য-পদ্ধতি প্রয়োগ করে, যার ফলে প্রায়ই সালিসের কার্যক্রম নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিবাদ তৈরি হয়।

আমাদের দেশের আইনে বাণিজ্যিক সালিসের সহায়ক বিধান অনুপস্থিত থাকলে এবং বাণিজ্যিক সালিসের সুযোগ সংকুচিত হলে দেশে বাণিজ্যের প্রসার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হুমকি তৈরি হবে। সালিসের ফলে আদালতের উপর চাপ কমার বদলে তা বৃদ্ধি পাবে, যা সামগ্রিকভাবে জনগনের সুবিচারপ্রাপ্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সুপারিশ

১. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিতক্রমে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করতে হবে যার খসড়া পরিশিষ্ট ৫ এ সন্নিবেশিত হলো।

২. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবা কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মেডিয়েশন কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিককরণের জন্য সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করতে হবে।

৩. মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-Case Mediation) ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-Case Mediation) এর ক্ষেত্রে পরিচালনার কার্যপ্রণালীসহ অন্যান্য পদ্ধতিগত বিষয় নির্ধারণের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. মধ্যস্থতাকারীদের ফি পরিশোধের বিধান ও নিয়মাবলি সম্বলিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মেডিয়েশনের সুবিধা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা, জনমত গঠন, সভা-সেমিনার, পোস্টার, লিফলেট এবং টিভিসি নির্মাণপূর্বক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

৬. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে মধ্যস্থতার 'কেন্দ্রস্থল' হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. অবিলম্বে বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রস্তাবিত সালিস আইনের সংশোধনীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অংশীজনদের সাথে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

৮. সালিসের মূল ধারণা এবং সালিস আইন, ২০০১ এর সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও বিধানগুলোকে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে বাণিজ্যিক সালিসের সুযোগ সংকুচিত না হয়;

৯. সালিস আইন, ২০০১-এর অধীনে পরিচালিত সালিসের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিধিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

বিংশ অধ্যায়
মামলাজট হ্রাস

১. নিষ্পন্নাধীন ৪৩ লক্ষ মামলার জট

সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচারাধীন মোট মামলার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

(ক) আপীল বিভাগে মোট ২৬,৫১৭ টি

(খ) হাইকোর্ট বিভাগে মোট ৫,৪৩,৮৪৭টি; এবং

(গ) জেলা পর্যায়ের আদালতে মোট ৩৭,২৯,২৩৫টি

অর্থাৎ সর্বমোট ৪২,৯৯,৫৯৯ টি মামলা বিচারাধীন।

আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগে মামলা ও বিচারকের সংখ্যার এই তুলনামূলক পরিসংখ্যানটি প্রণিধানযোগ্য

সাল	আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	বিচারকের সংখ্যা	বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা
১৯৭৫	৩৩,৬৫৭	১৭ জন	১,৯৭৯.৮২ টি
২০২৩	৫,৭০,৩৬৪	১০০ জন	৫,৭০৩. ৬৪ টি

অধস্তন আদালতে মামলা ও বিচারকের সংখ্যার পরিসংখ্যান

সাল	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	বিচারকের সংখ্যা	বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা
২০০৮	১৪,৮৯,১২১	৭৫২ জন	১,৯৮০.২১
২০২৩	৩৭,২৯,২৩৫	২,০০৩ জন	১,৮৬১.৮২

২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান:

দায়ের	নিষ্পত্তি	২০২৩ সালে দায়েরের তুলনায় কম নিষ্পত্তির সংখ্যা	২০২৩ সাল শেষে মোট বিচারাধীন
১৪,২৯,১৮৫	১৩,৩৭,১২৩	৯২,০৬২	৩৭,২৯,২৩৫

উপর্যুক্ত ছকসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে ২০০৩ জন বিচারক সক্রিয়ভাবে বিচারকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা ওই বছর মোট ১৩,৩৭,১২৩টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। ফলে গড়ে একজন বিচারক ওই বছর দেওয়ানি ও ফৌজদারি মিলিয়ে মোট ৬৬৭.৫৬টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন।

মামলার জট নিরসনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ও বিচারক সংখ্যার অনুপাত বিষয়ে "মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলার জট হ্রাসকরণে আইন কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন, ২০২৩" এ উপস্থাপিত বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক চিত্র প্রনিধানযোগ্য, যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা ও বিচারক সংখ্যার অনুপাত

দেশের নাম	বিচারকের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার কতজনের বিপরীতে
যুক্তরাজ্য	১ জন	৩,১৮৬ জন
যুক্তরাষ্ট্র	১ জন	১০,০০০ জন

দেশের নাম	বিচারকের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার কতজনের বিপরীতে
ভারত	১ জন	৪৭,৬১৯ জন
পাকিস্তান	১ জন	৫০,০০০ জন

উপরের টেবিলসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, মামলা ও জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশে বিচারকের সংখ্যা কমপক্ষে দুইগুণ বৃদ্ধি না করলে অর্থাৎ অধস্তন আদালতে কর্মরত মোট বিচারকের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০০০ এ উন্নীত না করলে মামলাজট কে সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু, একসঙ্গে অতিরিক্ত ৪০০০ বিচারক নিয়োগ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং নতুন নিয়োগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারক পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই ধাপে ধাপে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এরূপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার মামলার জন্য ১ (এক) জন বিচারক এই অনুপাতটি অনুসরণ করতে হবে। বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. অধস্তন /নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহের ধরন

জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের বিচারাধীন দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলা প্রধানত দুই ধরনের। যথা: (ক) মূল মামলা এবং (খ) আপীল/রিভিশন মামলা। আবার এসব মামলার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তিতে সাধারণত বেশি সময় প্রয়োজন হয় মূল মামলায়। দ্বিতীয় স্তরের মামলায় অর্থাৎ আপীল/ রিভিশন মামলায় অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগলেও এসব মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয় বেশি। কেননা, এসব মামলায় সাধারণত নিম্ন আদালতের নথিতে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি থাকে। তাছাড়া কোনো কোনো মামলায় থাকে আইনগত জটিলতা বিষয়ক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা।

৩. স্বল্পতম সময়ে নিষ্পত্তিযোগ্য মামলার পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত মামলার পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০২৩ সালে দেশের সকল অধস্তন আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানি আপীল ও রিভিশন এবং ফৌজদারি আপীল ও রিভিশন মামলার সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রম	মামলার ধরন	মামলার সংখ্যা
১.	দেওয়ানি আপীল	৭৯,৩২৭
২.	দেওয়ানি রিভিশন	৫,৬৮৭
৩.	ফৌজদারি আপীল	৬৮,০৪৪
৪.	ফৌজদারি রিভিশন	২৭,২৮১
	সর্বমোট	১,৮০,৩৩৯

দেওয়ানি বা ফৌজদারি আপীল বা রিভিশন মামলার যে কোনো এক ধরনের মামলা ১০০০টির বেশি বিচারাধীন আছে এমন জেলা আদালতের তালিকা ও বিচারাধীন মামলার সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	জেলার নাম	বিচারাধীন দেওয়ানি আপীল মামলা	বিচারাধীন ফৌজদারি আপীল মামলা	বিচারাধীন ফৌজদারি রিভিশন মামলা
১.	ঢাকা	২,৯৯৭	৫,৮৩৭	৩,৩৫৫
২.	নারায়নগঞ্জ	১,০৮১		
৩.	গাজীপুর	১,৫৫৫	১,১৯৪	
৪.	মানিকগঞ্জ	১৫৫৭		
৫.	মুন্সীগঞ্জ	১৫১৫	১৩৯২	
৬.	নরসিংদী	১৩৫৯	২৫৫৫	
৭.	টাঙ্গাইল	১২১৪		
৮.	কিশোরগঞ্জ	৩৫৯০	১৭৪৭	

ক্রমিক	জেলার নাম	বিচারাধীন দেওয়ানি আপীল মামলা	বিচারাধীন ফৌজদারি আপীল মামলা	বিচারাধীন ফৌজদারি রিভিশন মামলা
৯.	ফরিদপুর	১৮১৯		
১০.	শরীয়তপুর	-	১১৪৪	
১১.	চট্টগ্রাম	৫৮৭০	৩৮৫০	১৬১৪
১২.	কক্সবাজার	১৬১২	৩১৫৭	১৭৬১
১৩.	নোয়াখালী	১২৫৮		
১৪.	ফেনী		১৬১৩	
১৫.	লক্ষীপুর	১৭৬২	১২৩০	
১৬.	কুমিল্লা	১০৯৪		
১৭.	ব্রাক্ষণবাড়িয়া		১৬৮০	
১৮.	চাঁদপুর	১১৪৬	১৬৯৫	
১৯.	রাজশাহী	১৯২৮	২৭৩৮	
২০.	নওগা	১৩৬৮		
২১.	নাটোর	১০৮৩		
২২.	বগুড়া	২১৭৭	২০২৬	
২৩.	পাবনা	১৬০৪	১৩৫৪	
২৪.	সিরাজগঞ্জ	১৩৯০		
২৫.	খুলনা	১৭১১	১৪৭৬	
২৬.	বাগেরহাট	২২৯৬		
২৭.	কুমিল্লা	১২০৫		
২৮.	ঝিনাইদহ	১৭৩৬		
২৯.	সাতক্ষীরা	১১০৩		
৩০.	মাগুরা		১১৮০	
৩১.	বরিশাল	১২২৮		
৩২.	ভোলা		১০৫৯	
৩৩.	পটুয়াখালী		১০০৭	
৩৪.	সিলেট	১৬৩৯		
৩৫.	সুনামগঞ্জ	২৬৩৮		
৩৬.	মৌলভিবাজার	১১২৭	১১১৭	
৩৭.	হবিগঞ্জ	২০৮৮	২৩৩৪	
৩৮.	গাইবান্ধা	১৯৬২	১২৪২	
৩৯.	কুড়িগ্রাম	১২০৫		
৪০.	নীলফামারি	১৩০১	১০৪২	১২৭৫
৪১.	দিনাজপুর	১২৬১		
৪২.	ময়মনসিংহ	১২০৩	১৬৮১	
৪৩.	নেত্রকোণা	২০৭১		

উপরিউক্ত আদালতগুলোতে মামলাজট নিরসনের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম নেওয়া যেতে পারে।

৪. মামলা জট নিরসনে বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩ এর অপর্যাপ্ততা

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ আদালত তৈরি করা হয়েছে। যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, দুর্নীতি বিষয়ক বিশেষ জজ আদালত, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, শিশু আদালত, ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন জেলায় এই সব

বিশেষ আদালতে দায়েরকৃত/নিষ্পন্নাধীন মামলার সংখ্যা বিভিন্ন রকম। সেই কারণে বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩ এ এই মর্মে বিধান করা হয় যে, জেলার জেলা ও দায়রা জজ তাঁর নিজস্ব বা অধীনস্ত অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ ঐ জেলার বিশেষ আদালতে বদলি করতে পারবেন।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বিশেষ আদালত আইনের অধীনে প্রায় সব জেলাতেই বিশেষায়িত আদালত/ট্রাইব্যুনালগুলোকে (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ছাড়া) জেলা ও দায়রা জজ আদালত হতে বিভিন্ন পর্যায়ের মামলা বদলি করা হয়েছে। তবে কয়েকটি জেলায় এরূপে বদলিকৃত মামলার সংখ্যার কম। উক্তরূপে "বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩" এর অধীনে মামলা বদলি সত্ত্বেও নিষ্পত্তির সামগ্রিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি যা পূর্ববর্তী ছকগুলো থেকে স্পষ্ট।

৫. লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের মাধ্যমে এডিআর পদ্ধতির সফলতা

বেশ কিছু জেলায় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধীনে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রমাণ রেখেছে। ২০২৩ সালে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৪,১২৬টি প্রি-কেইস মামলা এবং ৫৬৮৭টি পোস্ট কেইস মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ মোট ২৯,৮১৩টি মামলা এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মোট ৫৩,০৭,৩১,৩৬৫ টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এডিআরের কারণে পক্ষগণ ২০২৩ সালে মোট ১৫৩৭টি মামলা আদালত থেকে প্রত্যাহার করেছে।

এই চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্বল্প সময়ে এবং মামলার পক্ষগণের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতা ও শান্তি বজায় রেখে এবং সম্ভাব্য আপীল/রিভিশন ইত্যাদি জটিল পদ্ধতি পরিহারক্রমে মামলা নিষ্পত্তিতে এই পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সিনিয়র সহকারি জজ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এডিআর কার্যক্রমে অপেক্ষাকৃত কম জটিল মামলাগুলো, বিশেষত পারিবারিক মামলা এবং অনুরূপ ছোট ছোট মামলা নিষ্পত্তি করে থাকেন।

অন্যান্য মামলাও বিশেষত টাকা পয়সার লেনদেন সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার মামলা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় উল্লিখিত দণ্ডবিধির বিভিন্ন আপোশযোগ্য ধারার মামলাগুলোকে লিগ্যাল এইড তথা এডিআর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন এবং প্রয়োজনে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনক্রমে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ, যেমন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এডিআর/লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

৬. বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের প্রস্তাব

মামলাজট নিরসনে বা ভবিষ্যতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জট নিরসনকল্পে প্রয়োজন বিচার বিভাগের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি সংস্কার প্রয়োজন। পূর্ববর্তী ছকগুলোতে উপস্থাপিত পরিসংখ্যানের আলোকে এ বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(ক) দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার

(১) সুপ্রীম কোর্টের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;

(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিশন[৪৬] গঠন;

(৩) অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার[৪৭];

(৪) বিচার বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস[৪৮] প্রতিষ্ঠা;

[৪৬] তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

[৪৭] চতুর্থ অধ্যায় দেখুন।

[৪৮] সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

(৫) দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত কাজ পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস[৪৯] প্রতিষ্ঠা;

(৬) আইনজীবীদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্তিকরণ ও মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ[৫০];

(৭) সুপ্রীম কোর্টসহ সকল আদালতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা[৫১]:

(৮) বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ[৫২] এবং যথাসম্ভব নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা;

(৯) বিভিন্ন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারি নিয়োগের[৫৩] জন্য বিদ্যমান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার;

(১০) মামলা মোকদ্দমা এবং বিচার বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের আস্থা সৃষ্টির জন্য সামগ্রিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা[৫৪] বৃদ্ধি;

(১১) বিচার বিভাগের যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ[৫৫];

(১২) গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয়ভাবে কার্যকর এডিআর ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রয়োজনে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের সহায়তা গ্রহণ[৫৬];

(১৩) বিচার ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা (Access to Justice) নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর এবং জনবান্ধব পুলিশি সহায়তা এবং লিগ্যাল এইড কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ[৫৭];

(১৪) বর্তমানে চালু থাকা গ্রাম আদালতের আমূল সংস্কারের মাধ্যমে বিচারকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো[৫৮];

(১৫) বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধি[৫৯]।

(খ) স্বল্প মেয়াদি সংস্কারঃ

বিদ্যমান জট নিরসন কল্পে জরুরি ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

(১) অধিক সংখ্যক ফৌজদারি আপীল, ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি আপীল ও দেওয়ানি রিভিশন নিষ্পন্নাধীন আছে এরূপ জেলায় অবসরপ্রাপ্ত সৎ, দক্ষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজদের ২/৩ বছরের মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০০০টি আপীল/রিভিশন বিচারাধীন আছে এরূপ জেলাতে চুক্তি ভিত্তিক জেলা জজগণকে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(২) অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজকে বিশেষ আদালত আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে এবং সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৪৯ ধারা অনুসারে নিয়োগ করা যেতে পারে। উক্তরূপ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের জন্য আইন সংশোধনের পূর্বে মাসদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত কনটিন্যুয়াস ম্যানডামাস (Continuous Mandamus) এর আওতায় প্রণীত বিধিমালার সাথে সম্ভাব্য আইনগত জটিলতা এড়ানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, উক্তরূপে চাকরি বিধিমালায় শুধুমাত্র পদোন্নতির মাধ্যমে জেলাজজ নিয়োগের বিধান আছে।

---

[৪৯] নবম অধ্যায় দেখুন।
[৫০] ষষ্ঠবিংশ অধ্যায় দেখুন।
[৫১] পঞ্চম ও চতুর্দশ অধ্যায় দেখুন।
[৫২] দ্বাদশ অধ্যায় দেখুন।
[৫৩] একাদশ অধ্যায় দেখুন।
[৫৪] সপ্তদশ অধ্যায় দেখুন।
[৫৫] ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।
[৫৬] অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায় দেখুন।
[৫৭] অষ্টাদশ অধ্যায় দেখুন।
[৫৮] একবিংশ অধ্যায় দেখুন।
[৫৯] সপ্তবিংশ অধ্যায় দেখুন।

(৩) জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে নিষ্পন্নাধীন বিপুল সংখ্যক ফৌজদারি মামলার (২১লক্ষ+) একটি বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে মিথ্যা মামলা মর্মে নানাবিধ প্রচার মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে। তবে প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে না। বরং প্রতিটি মামলার নথিপত্র পরীক্ষাক্রমে সহজেই ঐসব মামলার আংশিক সত্যতা বা অসত্যতা সম্পর্কে একটি কার্যকর ধারণা পাওয়া যাবে। তাই প্রশাসনিকভাবে সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা এবং তদন্তাধীন মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, বিচার শুরু হয়ে গেছে অথচ দীর্ঘদিন সাক্ষী আসছে না বিধায় অনিষ্পন্ন আছে এরূপ মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৯ ও ২৬৫জ ধারা অনুসারে সাক্ষ্য কার্যক্রম বন্ধ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইন কর্মকর্তাগণ আদালতকে অনুরোধ করবেন মর্মে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

(৪) পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ত্বরিত ও দক্ষ সেবা পাওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। যথা:

(ক) পিপি/জিপিগণের জন্য অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এর সমমর্যাদার আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তার (এডিশনাল পিপি/জিপি ইত্যাদি) জন্য যুক্তিসঙ্গত হারে পারিশ্রমিক এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) ভাড়ার ভিত্তিতে তাদের জন্য ভৌত অবকাঠামো, বিশেষত অফিসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সহায়ক জনবল নিয়োগ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পুলিশের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট আদালতের বাইরে অবস্থানরত সাক্ষীদের ই-টেকনোলজির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য আইন ও সুপ্রীম কোর্টের ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৪৯০এ, এর মাধ্যমে প্রকাশিত প্র্যাকটিস ডাইরেকশন প্রতিপালন করতে হবে।

একবিংশ অধ্যায়

গ্রাম আদালত

১. ভূমিকা

সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় গ্রাম আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পর্যায়ের ছোটখাটো বিরোধ সহজ ও শান্তিপূর্ণভাবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রণীত গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে স্থানীয় পর্যায়ের এই আদালত ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য প্রণীত হয় গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬। উক্ত আইন অনুসারে গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য আইনসহ পদ্ধতিগত বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ না থাকায় মানুষকে দ্রুত প্রতিকার দেয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রথাগত আদালতের ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষকে প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত হতে পারে একটি কার্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার আশাব্যঞ্জক নয়। তৎপ্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে উপস্থাপন করা হল।

১.১ গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান

নমুনা হিসেবে নিম্নে ৬টি জেলা হতে সংগৃহীত গ্রাম আদালতের মামলার একটি পরিসংখ্যান ২২০ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রদত্ত ছকে বর্ণিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়:

- গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তিকৃত মামলায় আপোশের হার ৮৯%।
- ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৫০ জন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছয়টি জেলার ৪৩৮টি গ্রাম আদালতের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার বাৎসরিক গড় সংখ্যা ৭,১৮৫টি।
- প্রতিটি গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার বাৎসরিক গড় সংখ্যা ১৬টি।

৪৩৮টি গ্রাম আদালতে বিগত ৪ বছরে মোট ২৮,৬০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে আপোশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৫,৪৬৭টি মামলা। অর্থাৎ আপোশের হার সন্তোষজনক।

ছকে প্রদর্শিত প্রতিটি আদালতের দায়েরকৃত মামলার বার্ষিক গড় সংখ্যা ১৬টি। প্রকৃত পক্ষে এটি ইউনিয়ন পর্যায়ের ছোটখাটো বিরোধের বাস্তব সংখ্যার সঠিক প্রতিফলন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় শুধু এক বছরেই (২০২৩ সাল) এই ৬টি জেলার বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৯৯,৮১৬টি। এ সকল জেলার জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতগুলোতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ইঙ্গিত দেয় যে, প্রকৃত পক্ষে ছোট ছোট বিরোধের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক ছোট খাটো বিরোধ গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য হলেও মানুষ উক্ত আদালতে যাচ্ছে না। অর্থাৎ বিরোধগুলো অন্যভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছে কিংবা অতিরঞ্জিত আকারে নিয়মিত আদালতে মামলা দায়ের হচ্ছে। এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, গ্রাম আদালতের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না।

১.২ গ্রাম আদালতের সমস্যা চিহ্নিতকরণ

(ক) গ্রাম আদালতের গঠনজনিত সমস্যা

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫ অনুসারে ৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত ২ জন সদস্য (যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ১ জন সদস্য থাকবেন) নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানসহ ২ জন সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তারা মেয়াদ ভিত্তিক নির্বাচিত। এসব প্রতিনিধিগণের অনেকেরই গ্রাম আদালত বা স্থানীয় সালিস বিচার নিয়ে পূর্ব ধ্যান-ধারণা বা অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকে। এ কারণে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম কার্যকর ও গতিশীল হচ্ছে না। আবার বিদ্যমান আইন অনুসারে গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন নিয়েও বেশ বিলম্ব হয়।

ছক: ৬টি জেলা হতে সংগৃহীত গ্রাম আদালতের মামলার পরিসংখ্যান

সময়কাল: ২০২১ হতে ২০২৪ সাল; গ্রাম আদালতের মোট সংখ্যা: ৪৩৮

জেলার নাম	জেলার জনসংখ্যা[৬০]	ইউনিয়নের সংখ্যা	ধরন	অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত ও অন্যান্য আদালত থেকে প্রেরিত মামলার সংখ্যা	বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	আপোশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
কিশোরগঞ্জ	৩২,৬৭,৬৩০	১০৮	দেওয়ানি	৫৬৪২	১২২৬	৬,৮৬৮	১,৩৫৫	১,৩০৬
			ফৌজদারি	৩৯৬৫	৫৩২	৪,৪৯৭	৬২৯	৬২২
মাদারীপুর	১২,৯৩,০২৭	৫৯	দেওয়ানি	১৩৩	৮৩৭	৮২	৯০০	৮৭৮
			ফৌজদারি	২০১	১৭১৭	১৩৪	১,৭৮৪	১,৭৪৮
সুনামগঞ্জ	২৬,৯৫,৪৯৫	৮৮	দেওয়ানি	৩৩১	১,৬৪৩	১,৯৭৩	১,৬৯৭	১,৪৪০
			ফৌজদারি	৫৬৪	২,৭৯৭	৩,৩৬২	২,৮৮৮	২,৪৫৫
নওগাঁ	২৭,৮৪,৫৯৮	৯৯	দেওয়ানি	১,৭০৬	৬,৪৪৪	২,১২৫	৬,০২৫	৫,১৬৯
			ফৌজদারি	২,০১৮	৯,৭৫১	২,৭০৩	৯,০৬৬	৮,৩০৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৮,৩৫,৫২৭	৪৫	দেওয়ানি	১৩৭	৮৫০	৯৮৭	৮৭৯	৭২৪
			ফৌজদারি	৩৮২	১,১০৯	১,৪৯১	১,৩৬৬	১,১৮৯
নড়াইল	৭,৮৮,৬৭৩	৩৯	দেওয়ানি	৭৯	১,০০৩	৯২	১,১১৩	৮১৮
			ফৌজদারি	৩৬	৮৩২	৪৮	৮৯৯	৮১৫
মোট	**১,২৬,৬৪,৯৫০**	**৪৩৮**		**১৫,১৯৪**	**২৮,৭৪১**	**২৪,৩৬২**	**২৮,৬০১**	**২৫,৪৬৭**

[৬০] ২০২২ সালের জনশুমারি প্রতিবেদন অনুসারে

(খ) গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মানের ঘাটতি

'গ্রাম আদালত' এর নামে যেহেতু 'আদালত' অভিব্যক্তিটি আছে সেহেতু এই আদালতের যাবতীয় কার্যধারায় বিচার প্রক্রিয়ার ন্যূনতম শর্তাবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গ্রাম আদালতে অভিগম্যতা, আদালত কক্ষের পরিবেশ, উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ, জবানবন্দি বা সাক্ষ্যের সারমর্ম লিপিকরণ, আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিকরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ন্যূনতম যে বিচারিক মানদণ্ড রয়েছে তা নিশ্চিত করা হয় না।

(গ) গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত সময়সূচি না থাকা

গ্রাম আদালত সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের ক্ষমতাবলে সৃষ্ঠ একটি আদালত। এই আদালত যেহেতু বিভিন্ন মামলা বা বিরোধের বিচার করে সেহেতু সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যাতে নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির হতে পারে তার জন্য প্রতিটি গ্রাম আদালতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ সম্বলিত একটি সময়সূচি থাকা অত্যাবশ্যক। নির্ধারিত দিনে এবং নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক কাজ করতে না পারলে বিচারপ্রার্থী মানুষ এই আদালতের প্রতি আস্থাশীল হবে না এবং এই আদালতের কার্যক্রমও দৃশ্যমান হবে না। মামলা বিচারাধীন থাকুক বা না থাকুক কিংবা মামলার পরিমাণ যা-ই হোক না কেন সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে।

(ঘ) গ্রাম আদালতের উপর বিচারিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থা না থাকা

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ বর্তমানে তাদের যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার) এর নিকট দায়বদ্ধ। কিন্তু গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আইন মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে কোনো তদারকি ব্যবস্থা নেই। ফলে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে ভুল ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এ কারণে গ্রাম আদালতের তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থার ভার সুনির্দিষ্ট একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা প্রয়োজন।

(ঙ) গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা অপেক্ষাকৃত বেশি

গ্রাম আদালতে একটি মামলা/মামলার আবেদন দায়ের থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত সময়সীমা আইনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। উক্ত আইন অনুসারে মামলা বিচারের জন্য গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন থেকে শুরু করে রায় প্রদান পর্যন্ত একজন বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিকে সাড়ে ৫ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এটি গ্রাম আদালতের উদ্দেশ্যেকে ব্যাহত করছে। যেহেতু এই আদালতের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোনো আইনের প্রয়োগ নেই, সাক্ষ্য আইনের ব্যবহার নেই এবং আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ নেই সেহেতু গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা আরো কমানো প্রয়োজন।

(চ) থানা বা আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালতে মামলা প্রেরণের ক্ষেত্রে সমস্যা

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ফৌজদারি মামলা দায়েরের পর সংশ্লিষ্ট মামলা বা বিরোধটি গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। থানার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। থানায় এজাহারের মাধ্যমে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হলে বিষয়টি গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য কিনা তার জন্য তদন্ত রিপোর্ট দাখিল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ফৌজদারি কার্যবিধিতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। বিভিন্ন পর্যায়ের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ জানান, বিদ্যমান আইন অনুসারে চার্জ গঠনের পূর্বে গ্রাম আদালতে মামলা প্রেরণের সুযোগ নেই। অর্থাৎ কোনো মামলা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে গ্রাম আদালতে বিচার্য প্রতীয়মান হলেও প্রাথমিক

অবস্থায় এটি সেখানে প্রেরণের সুযোগ নেই। ফলশ্রুতিতে মামলার পক্ষগণের সময় অপচয় হচ্ছে, অনর্থক অর্থ ব্যয় হচ্ছে এবং নানাবিধ হয়রানির শিকার হচ্ছে।

(ছ) গ্রাম আদালতের নিরাপত্তাজনিত ঘাটতি

গ্রাম আদালত যেহেতু বেশ কিছু ফৌজদারি অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত সেহেতু গ্রাম আদালতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গ্রাম আদালত চলাকালে নিকটতম পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের যাবতীয় নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও ক্ষমতাসহ দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(জ) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিচারিক প্রশিক্ষণে ঘাটতি

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত আদালত পরিচালনা করার নিয়ম থাকলেও ন্যায়বিচারবোধ ও নিরপেক্ষতার ধারণা, গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও পদ্ধতিগত বিভিন্ন দিক বিষয়ক জ্ঞানের ঘাটতি ও অনভিজ্ঞতার কারণে বিচারিক কার্যক্রমে নানাবিধ ভুল ত্রুটি করছে। আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষ্য মূল্যায়ন এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচার সুলভ মনোভাব প্রদর্শন করতে পারছে না। এর ফলে গ্রাম আদালতের বিচার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানসম্মত হচ্ছে না। এ কারণে আদালত পরিচালনায় দক্ষতা সৃষ্টির জন্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

২. কমিশনের প্রস্তাবসমূহ

(১) **গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ:** গ্রাম আদালতের বিদ্যমান কাঠামোর অতিরিক্ত হিসেবে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা প্যানেল গঠন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তির সমন্বয়ে উপদেষ্টা প্যানেল গঠিত হবে। গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হলে চেয়ারম্যান উপদেষ্টা প্যানেলের কোনো সদস্যকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবে। গ্রাম আদালত নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেষ্টা প্যানেলের যেকোনো সদস্যের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

(২) **গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মান রক্ষার জন্য করণীয়:** এজলাস বা আদালত কক্ষের কর্ম পরিবেশসহ গ্রাম আদালতের সকল কার্যক্রমে বিচারিক পরিবেশ, বিচারিক মূল্যবোধ এবং যথাযথ বিচারিক পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম আদালতের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনাসহ আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে:

- সহজে দরখাস্ত দাখিলসহ আদালতে অভিগম্যতা;
- আদালত কক্ষে নারীসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণ;
- সাক্ষীদের শপথ গ্রহণে অনাগ্রহ;
- জবানবন্দি বা সাক্ষ্য লিপিকরণে আদালতের অনাগ্রহ;
- আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিকরণের প্রক্রিয়া;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায়ের অনুলিপি সরবরাহ করা;
- প্রয়োজনীয় ফরম, রেজিস্টারসহ অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি।

(৩) গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত সময়সূচির ব্যবস্থা করা: গ্রাম আদালতের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি ধার্য করতে হবে। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে।

(৪) গ্রাম আদালতের উপর বিচারিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার যেহেতু জেলা পর্যায়ে প্রেষণে কর্মরত বিচার বিভাগের একজন সদস্য সেহেতু তার সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে। গ্রাম আদালতের বিচারিক তত্ত্বাবধান ও তদারকির জন্য কমিটির গঠন ও কার্যক্রম নিম্নরূপ:

গ্রাম আদালত তদারকি কমিটির গঠন

১. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার-------------------------------------- সভাপতি;
২. সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার---------------------------------- সদস্য;
৩. সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা -----------------------------------সদস্য

গ্রাম আদালত তদারকি কমিটির কার্যাবলি

১. গ্রাম আদালত তদারকি কমিটি গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও তদারকি করবেন;
২. তদারকি কমিটির সদস্যগণ সময়ে সময়ে গ্রাম আদালত পরিদর্শন করবেন;
৩. কমিটি গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রম স্বচ্ছ, কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় সার্কুলার, নির্দেশনা ইত্যাদি জারির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
৪. কমিটি গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রস্তাব প্রদান করবেন।

(৫) গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা কমানো: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬(গ)(২) এ উল্লিখিত সময়সীমা নিম্নরুপে সংশোধনের বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করছে:

ধারা	মামলার স্তর	নির্ধারিত সময়	প্রস্তাবিত সময়সীমা
৪	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন	--	
৬(খ)(১)	আদালত গঠিত হওয়ার পর প্রথম অধিবেশন	১৫ দিন	---
৬(খ)(২)	আপোশ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হলে উহার নিষ্পত্তি	১৫ দিন	---
৬(গ)(১)	আপোশ বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে মামলাটির শুনানির কার্যক্রম শুরু	১৫ দিন	---
৬(গ)(২)	শুনানির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর মামলার নিষ্পত্তি	৯০ দিন	৬০ দিন
৬(গ)(২)	এরই মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে অতিরিক্ত সময়	৩০ দিন	১৫ দিন

(৬) থানা বা আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালতে মামলা রেফারেলের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ: সহকারি জজ বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মামলা গ্রহণকালে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে

মামলাটি গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য প্রতীয়মান হলে এটি তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে প্রেরণ করতে পারবে মর্মে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতিগত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে।

(৭) গ্রাম আদালতের নিরাপত্তাজনিত ঘাটতি দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ: গ্রাম আদালতের কার্যক্রম চলাকালে নিরাপত্তার জন্য গ্রাম পুলিশের একটি দলকে নিয়োজিত করতে হবে অথবা প্রয়োজনে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করতে হবে।

(৮) আপীল আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালত পরিদর্শন: গ্রাম আদালতের আপীল আদালত হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারি জজ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে গ্রাম আদালত পরিদর্শন করবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ উক্ত পরিদর্শন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৩. কমিশনের সুপারিশসমূহ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তির সমন্বয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা প্যানেল গঠনের বিধান গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এ সন্নিবেশিত করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
২.	গ্রাম আদালত কক্ষের কর্ম পরিবেশসহ আদালতের সকল কার্যক্রমে বিচারিক পরিবেশ, বিচারিক মূল্যবোধ এবং যথাযথ বিচারিক পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। গ্রাম আদালত তদারকি কমিটি
৩.	গ্রাম আদালতের জন্য সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনকে বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি গ্রাম আদালত তদারকি কমিটি গঠনের বিধান গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এ সন্নিবেশিত করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ৩। আইন ও বিচার বিভাগ
৫.	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬(গ)(২) এ উল্লিখিত সময়সীমা যথাক্রমে ৯০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন এবং ৩০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিন নির্ধারণ করতঃ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সংশোধন করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬.	মামলা দায়েরের প্রাথমিক অবস্থায় থানা বা আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালতে মামলা প্রেরণের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতিগত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ৩। আইন ও বিচার বিভাগ
৭.	গ্রাম আদালতের কার্যক্রম চলাকালে নিরাপত্তার জন্য গ্রাম পুলিশের একটি দলকে নিয়োজিত করতে হবে অথবা প্রয়োজনে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারি জজ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে গ্রাম আদালত পরিদর্শন করবেন মর্মে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এ বিধান সন্নিবেশিত করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ৩। আইন ও বিচার বিভাগ
৯.	গ্রাম আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। অর্থ বিভাগ

দ্বাবিংশ অধ্যায়
মোবাইল কোর্ট

১. মোবাইল কোর্ট-এর এখতিয়ার

মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থা চালু হয়। তবে, নবম জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই অধ্যাদেশটি অকার্যকর হয়ে যায়। পরবর্তীতে, ২০০৯ সালে রাষ্ট্রপতি পুনরায় মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ জারি করেন। পরবর্তীতে, একই বছর সংসদ উক্ত অধ্যাদেশটিকে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) আকারে পাশ করে।

মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত ১৩০টি আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে মোবইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তফসিলভুক্ত আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দণ্ড বিধি, ১৮৬০; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, ইত্যাদি।

২. মোবাইল কোর্টের কার্যপদ্ধতি

২.১ অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং অভিযোগ গঠন

মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তার উপস্থিতিতে তফসিলভুক্ত আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত হলে ঘটনাস্থলেই উক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ করতে পারেন। অপরাধ আমলে নেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিত আকারে তৈরি করেন এবং তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনান এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করেন কি না এই মর্মে তার কাছে জানতে চান।

২.২ অভিযোগ স্বীকার করার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়। লিপিবদ্ধ স্বীকারোক্তিতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা টিপসই এবং উপস্থিত দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমতে টিপসই নেওয়া হয়। এরপর ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত আদেশে স্বাক্ষর প্রদান করে উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করতে পারেন।

২.৩ অভিযোগ স্বীকার না করার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অস্বীকার করলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। অভিযুক্তের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। আর যদি ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না

হয়, তবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করতে পারেন।

২.৪ দণ্ড আরোপ

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড আরোপ করা যায়। মোবাইল কোর্ট কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে আইনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যায়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য। তবে, তাৎক্ষণিকভাবে তা আদায় করা না গেলে অনধিক তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আরোপ করা যায়।

২.৫ আপিলের সুযোগ

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রথমত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপিল করতে পারেন। উক্ত আপিল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে শুনানি করেন অথবা তার অধীনস্ত অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তা প্রেরণ করেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দায়ের করা যায়।

৩. সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলা

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বৈধতা বিষয়ে ২০১৭ সালে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত তিনটি রিট আবেদনের (নম্বর: ৮৪৩৭/১১, ১০৪৮২/১১ এবং ৪৮৭৯/১২) একত্রে শুনানি শেষে আদালত মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫, ৬(১), ৬(২), ৬(৪), ৭, ৮(১), ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৫-কে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে ঘোষণা করেন। আদালত এই আইনকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর দু'টি উপাদান, অর্থাৎ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ-এর নীতির পরিপন্থী বলে সিদ্ধান্ত দেন। রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সংবিধান এবং মাসদার হোসেন মামলার রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দেন। পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল দায়ের করে, যা বর্তমানে আপিল বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

৪. মোবাইল কোর্ট আইনের ব্যাপারে আপত্তি

৪.১ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বিষয়ে প্রধান সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ:

(ক) এই আইনের মাধ্যমে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের নীতির পরিপন্থী।

(খ) এই আইন অনুযায়ী একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করেই অভিযুক্তের 'স্বীকারোক্তি'র ভিত্তিতে ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড আরোপ করতে পারেন, যা সংবিধানের ৩২, ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে বিধৃত মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে, এর চেয়ে কম দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রেও একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে বিচারের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

(গ) সাধারণত সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের কাছে থাকলেও মোবাইল কোর্ট আইনের ১৫ ধারায় এই আইনের তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে সরকার তফসিলে নতুন নতুন আইন সংযোজন করছে, যার ফলে বর্তমানে তফসিলে ১১৬টি আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে মোবাইল কোর্টের অধিক্ষেত্রের এধরণের সম্প্রসারণ আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থী ।

৫. মোবাইল কোর্টের উপযোগিতা

বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে মোবাইল কোর্টের উপযোগিতার বিষয়ে যেসব যুক্তি সাধারণত উপস্থাপিত হয়, তার মধ্যে রয়েছে:

(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থানেই দ্রুততার সাথে তার প্রতিকার করতে সক্ষম হন; এভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তির উদাহরণ সৃষ্টি হওয়ায় একই ধরণের অপরাধের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়;

(খ) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া এড়িয়ে স্বল্প সময়ে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়; ফলে জনগণের কাছে তা আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে;

(গ) মোবাইল কোর্ট প্রধানত পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, ভোক্তা অধিকার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, এবং অনুরূপ জনসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালিত হয় বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে।

৬. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত

বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালতের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট (অর্থাৎ একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে ভ্রাম্যমান আদালতের বিচার কাজ পরিচালনা করছেন। একইভাবে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর অধীনে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ আইন প্রয়োগের জন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছেন। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হলে অনেক ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে এবং এ বিষয়ে বিতর্ক ও অসন্তোষের ক্ষেত্রও সংকুচিত হবে। শুধুমাত্র যেসব পরিস্থিতিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত হবে না, শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হলে মোবাইল কোর্টকে ঘিরে চলমান বিতর্ক অনেকাংশে নিরসন হবে।

৭. কমিশনের প্রস্তাব

মোবাইল কোর্ট আইন-এর সাংবিধানিকতা বিষয়ে আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। ইতোমধ্যে, বাস্তবতার নিরিখে মোবাইল কোর্টের প্রয়োজনীয়তা, এবং এর সমান্তরালে মোবাইল কোর্ট আইন-এর সাংবিধানিক ও আইনগত অসঙ্গতিগুলোর বিবেচনায়, সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(ক) কোন ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় লাভের যথাযথ সুযোগ না দিয়ে কারাদণ্ড আরোপ করা সংবিধানের ৩২, ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সাথে অসাঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় মোবাইল কোর্ট আইন সংশোধন করে মোবাইল কোর্টের কারাদণ্ড আরোপের ক্ষমতা রহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে মোবাইল কোর্ট স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে আইনে নির্ধারিত অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারবে, এবং তার তল্লাশি (search), জব্দ (seizure) এবং জব্দকৃত বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) সম্পর্কিত ক্ষমতাও বহাল থাকবে।

(খ) অর্থদণ্ড আদায়ে জটিলতা নিরসনে সাধারণ কর্মঘণ্টার মধ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে, সাধারণ কর্মঘণ্টার বাইরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন হলে এর মাধ্যমে আরোপিত অর্থদণ্ড আদায়ে অভিযুক্তকে যৌক্তিক সময় ও সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(গ) মোবাইল কোর্ট আইনের ১৫ ধারা রহিত বা সংশোধন করে করে শুধুমাত্র সংসদ কর্তৃক আইনের তফসিল সংশোধনের বিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক।

(ঘ) নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে মোবাইল কোর্ট আইনের ১৩ ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে আপিল দায়েরের বিধান করা প্রয়োজন। আপিল দায়েরের অধিকার যাতে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য দণ্ডাদেশ প্রদানের পর সর্বোচ্চ ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্তকে আদেশের নকল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। নকল যথাসময়ে না পাওয়া গেলে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অভিযুক্তকে আপিল দায়েরের সুযোগ দেয়ার বিধান প্রণয়ন করলে ন্যায়বিচারের পথ সুগম হবে।

(ঙ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা, এবং যেসব পরিস্থিতিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত হবে না, শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আইনের সংস্কার

১. ভূমিকা

সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুয়ায়ী কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে একটি 'স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর' বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করা। এই দায়িত্বের নিরিখে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিচার বিভাগের উক্ত তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানাবিধ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সেগুলোতে সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কারের প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

(ক) বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংশোধন এবং নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ এর প্রস্তাবসহ সংশোধনীর খসড়া[৬১]।

(খ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ বিষয়ে নামক একটি কমিশন গঠনের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একটি খসড়া[৬২] প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে কমিশনের সুপারিশকৃত খসড়ার ভিত্তিতে সরকার ইতোমধ্যে–সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ ২০২৫ নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে।

(গ) সুপ্রীম কোর্ট এর দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখাসহ সংবিধানের ১১৩ অনুচ্ছেদ সংশোধনসহ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব[৬৩]।

(ঘ) বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিভাগকে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং অধস্তন আদালতের সিনিয়র সহকারি জজ/ ১ম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের প্রস্তাব[৬৪]।

(ঙ) অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরি বিষয়ে মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে প্রণীত পাঁচটি বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব[৬৫]।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য বিদ্যমান সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশের সুপারিশ[৬৬]।

(ছ) বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস নামে একটি একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল শিরোনামাধীন অধ্যায়ে একটি নতুন অনুচ্ছেদ ৬৪ক সংযোজন, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা সংশোধনক্রমে অ্যাটর্নি সার্ভিসকে উক্ত কমিশনের আওতাধীন করার প্রস্তাব এবং একটি আইন/বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপারিশসহ সার্ভিসের রূপরেখা সম্বলিত প্রস্তাব[৬৭]।

(জ) সুপ্রীম কোর্টের এবং অধস্তন আদালতের কর্মচারিদের নিয়োগ বিধি সংশোধনের প্রস্তাব[৬৮]।

---

[৬১] দশম অধ্যায় দেখুন।
[৬২] পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।
[৬৩] পঞ্চম দশম অধ্যায় দেখুন।
[৬৪] ষষ্ঠ দশম অধ্যায় দেখুন।
[৬৫] চতুর্থ দশম অধ্যায় দেখুন।
[৬৬] তৃতীয় দশম অধ্যায় দেখুন।
[৬৭] সপ্তম অধ্যায় দেখুন।
[৬৮] একাদশ দশম অধ্যায় দেখুন।

(ঝ) একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের রূপরেখাসহ নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং পুলিশ আইন, ১৮৬১সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব[৬৯]।

(ঞ) লিগ্যাল এইড কার্যক্রমকে ফলপ্রসু এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অধ্যাদেশ /আইন প্রণয়নের প্রস্তাব[৭০]।

(ট) গ্রাম আদালতকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে গ্রাম আদালত আইন সংস্কারের প্রস্তাব[৭১]।

(ঠ) মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থাকে কার্যকর ও প্রচলিত সংবিধান ও অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট আইন সংশোধনের প্রস্তাব[৭২]।

(ড) জেলা পর্যায়ের আদালত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও আইন অনুসারে মামলার শুরুতেই কাগজাদি নিরীক্ষণের লক্ষ্যে জুডিসিয়াল এডমিনিসট্রেসিভ অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব[৭৩]।

(ঢ) সুপ্রীম কোর্টের আদালত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস সংশোধনের প্রস্তাব[৭৪]।

(ণ) আইনজীবীদের শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত প্রস্তাব[৭৫]।

উল্লিখিত সংস্কার প্রস্তাব ছাড়াও বিচার বিভাগকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর করতে এবং মামলা পরিচালনার খরচ ও সময় কমিয়ে স্বল্প সময়ে বিচার প্রার্থীদের ন্যায়বিচার প্রদান করতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় অধিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনের সংশোধন, সংযোজন বা নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কমিশন বিচার বিভাগ সংস্কারের প্রস্তাব করছে:

২. দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত

অধস্তন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার কার্যকরতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, (১) দীর্ঘসূত্রিতা নিরসন এবং (২) বিচার আদালত ও আপিল/রিভিশন ইত্যাদি পর্যায়ে মামলা পরিচালনার খরচ কমানো। এ সকল বিষয়ে আইনে বিস্তারিত বিধান রয়েছে। যার সবকিছুর সংস্কারের সুপারিশ এই প্রতিবেদনে প্রদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং দেওয়ানি বিচার প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান স্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি আইনী সংস্কারের সুপারিশ নীচে উল্লেখ করা হলো।

২.১. মামলা দায়ের

মামলা দায়ের স্তরে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক এবং জেলা পর্যায়ে Judicial Administrative Officer (JAO) অফিসার দায়েরকৃত মামলা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিবেন। JAO হবেন একজন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা যিনি কোনো বিচারিক দায়িত্ব পালন করবেন না। বরং, আদালত ও মামলা ব্যবস্থাপনার সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব তদারকি ও নির্বাহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে JAO এর পদ সৃষ্টির জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার বা সংশোধন করতে হবে।

সুপারিশ

জেলা পর্যায়ে জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (JAO) অফিসার নিয়োগের জন্য উক্ত পদ সৃষ্টি এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

---

[৬৯] নবম দশম অধ্যায় দেখুন।
[৭০] অষ্টাদশ দশম অধ্যায় দেখুন।
[৭১] একবিংশ দশম অধ্যায় দেখুন।
[৭২] দ্বাবিংশ দশম অধ্যায় দেখুন।
[৭৩] পঞ্চদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।
[৭৪] পঞ্চদশ অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।
[৭৫] পঞ্চবিংশ অধ্যায় দেখুন।

২.২. সমন জারিতে দীর্ঘসূত্রিতা রোধকরণ

ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সমন জারি নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান আইনে বর্ণিত সমন জারির একাধিক পদ্ধতির মধ্যে ডাকযোগে ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সমান জারির পদ্ধতি আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে পোস্ট অফিস এ্যাক্ট সংশোধন করতে হবে। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সমন জারির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কুরিয়ার সার্ভিসের কার্যক্রম তদারকি করতে হবে। জারিকারকদের মাধ্যমে সমন জারি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের ভ্রমণভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। যে পদ্ধতিতেই সমন জারি করা হোক না কেন, সমন গ্রাহকের স্বাক্ষর সংগ্রহের পরিবর্তে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও স্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে সমান জারির প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ

১. জারিকারকদের ভ্রমণভাতা প্রদানের জন্য আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

২. সমন জারির প্রমাণ হিসাবে সমন গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও স্বাক্ষর সংগ্রহ পূর্বক জারির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

২.৩ আরজির সাথে দাবির সমর্থনে দলিল দাখিলের বিধান

আরজির সাথে দাবির সমর্থনে দলিল দাখিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় এই বিধান অনুসরণ করা হয় না। তাই এ বিধান কে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে আরজির সাথে দাবির সমর্থনে দলিল দাখিল না করলে তার পরিণাম হিসাবে সুনির্দিষ্ট ফলাফল সম্বলিত বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.৪ জবাব দাখিল বিষয়ে সংস্কার

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবাদীকে জবাব দাখিল করতে হবে। জবাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে–

ক) বাদীর দাবির কোন কোন বিষয় বিবাদী স্বীকার করে;

খ) বিবাদীর সুনির্দিষ্ট দাবি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে; এবং

গ) বিবাদী কর্তৃক অস্বীকৃত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা ভাবে অস্বীকৃতি প্রদান না করে এই মর্মে সাধারণ বক্তব্য প্রদান করতে হবে যে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত দাবি ব্যতীত, বাদীর সব দাবি বিবাদী অস্বীকার করে।

সুপারিশ

উল্লিখিত বিষয়ে সংস্কারের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ৮ আদেশের ৩-৫ বিধি সংশোধন করতে হবে।

২.৫ ইস্যু গঠন

উভয় পক্ষ কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট খসড়া ইস্যু উত্থাপন করতে হবে এবং আদালত কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে ইস্যু গঠন করতে হবে। ইস্যু গঠনের পূর্বে ডিসকভারি, ইন্সপেকশন এবং ইন্টারোগেটরি সম্পর্কিত বিধান বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবে। পক্ষগণ যেন এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে আদালতকে জোর প্রদান করতে হবে।

২.৬ ইস্যু গঠনের পরে

বিদ্যমান এডিআর সংক্রান্ত বিধান নানা কারণে বাস্তবে অনুসৃত হয় না। সে কারণে যথাযথ মামলায় আদালতের নিজস্ব উদ্যোগে লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মামলার পক্ষগণকে আপোশ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ দিতে হবে।

২.৭ বিচার পর্যায়ে

বিচার শুরু হওয়ার পরে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে বিচার শেষ করতে হবে।

২.৮ দেওয়ানি আপিল/ রিভিশন

দেওয়ানি আপিল বা রিভিশন এর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দায়সারা গোছের দাবি উত্থাপনের বিধান সংশোধন করে বিস্তারিত কারণ ও যুক্তি সম্বলিত আপিলের মেমো দাখিলের বিধান করতে হবে। আপিল দায়েরের সময়সীমা বর্তমানের চেয়ে দুই গুণ বৃদ্ধি করতে হবে, যেন আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ অসুবিধার না পড়ে। আপিলের প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ একইভাবে বিস্তারিত উত্তরসহ লিখিত আপত্তি দাখিল করবে। আপিল/রিভিশন শুনানিতে পক্ষগণ বা পক্ষগনের অ্যাডভোকেট উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক উল্লিখিত বিস্তারিত আপিল মেমো ও আপত্তির ভিত্তিতে আপীল আদালতকে রায় প্রদান করতে হবে।

২.৯. আরজি এবং লিখিত বর্ণনা এর সমর্থনে হলফনামা যুক্ত করা হলে উক্ত আরজি ও লিখিত বর্ণনাকে সাক্ষ্য (জবানবন্দি বা examination-in-chief) হিসাবে গণ্য করা

দেওয়ানি কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ এবং সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর বিদ্যমান আইনী কাঠামো অনুযায়ী আরজি ও লিখিত বর্ণনা তথা প্লিডিং অনেকটা হুবহু পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাক্ষীর জবানবন্দিতে গ্রহণ করা হয়। কেবল তাই নয় দেওয়ানী কার্যবিধির ৮নং আদেশ এর ৩-৫নং বিধির অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতার কারণে প্রতিটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট denial বা অস্বীকৃতিও লিপিবদ্ধ করতে হয়। অধিকন্তু ডিসকভারী ও এডমিশন প্রক্রিয়ার পরও বিজ্ঞ আইনজীবীগণ ঐ সকল বিষয়ে পুনরায় সাক্ষ্য উপস্থাপনের দাবি করেন।

এক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার চূড়ান্ত শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হলে উক্ত তারিখ কিংবা তার আগে আরজি এবং লিখিত বর্ণনার সমর্থনে হলফনামা দাখিল করে আরজি ও লিখিত বর্ণনার বক্তব্যকেই সাক্ষ্য (জবানবন্দি বা examination-in-chief) হিসেবে সাব্যস্ত করার বিধান করা হলে সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য অর্থঋণ আদালত ও ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে এরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

সুপারিশ

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ সংশোধন করে আরজি ও লিখিত বর্ণনার বক্তব্যকেই সাক্ষ্য (জবানবন্দি বা examination-in-chief) হিসেবে সাব্যস্ত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.১০. মামলার খরচ নির্ধারণের জন্য যুক্তিতর্ক শুনানির সময় পক্ষগণ কর্তৃক স্ব স্ব খরচের হিসাব দাখিল এবং আদালত কর্তৃক খরচসহ ডিক্রি প্রদান বাধ্যতামূলক করা

দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৫ ধারায় মামলার খরচ নির্ধারণ এবং উক্ত খরচ পরিশোধ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব ও পদ্ধতি নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণভাবে আদালতের স্বেচ্ছাধীন বিষয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিক্রি ফরমে খরচ হিসেবে কেবলমাত্র আদালতে পরিশোধিত কোর্ট ফি ব্যতীত অন্য কোন খাত লক্ষ্য করা যায় না। মামলার খরচ বলতে কি বুঝাবে এ নিয়ে আইনে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা নেই।

প্রকৃতপক্ষে খরচসহ কিংবা খরচবিহীন যেভাবেই ডিক্রি/খারিজ রায় প্রদান করা হোক না কেন ডিক্রিতে গতানুগতিকভাবে খুবই অল্প পরিমাণে কিছু খরচ উল্লেখ করা হয়। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়েছে মামলার জয় পরাজয় কোন ক্ষেত্রেই পক্ষদের মামলার খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃত ন্যায়বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যাটি নিরসণের জন্য মামলার খরচ নির্ধারণের লক্ষ্যে যুক্তিতর্ক শুনানির সময় পক্ষগণ কর্তৃক স্ব স্ব খরচের হিসাব দাখিল করার বিধান দেওয়ানি কার্যবিধি আইনে সংযোজন করতে হবে এবং খরচসহ ডিক্রি প্রদান বাধ্যতামূলক করার জন্য উক্ত আইনের ৩৫নং ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

সুপারিশ

মামলার খরচ নির্ধারণের লক্ষ্যে যুক্তিতর্ক শুনানির সময় পক্ষগণ কর্তৃক স্ব স্ব খরচের হিসাব দাখিল করার বিধান দেওয়ানি কার্যবিধি আইনে সংযোজন করতে হবে এবং খরচসহ ডিক্রি প্রদান বাধ্যতামূলক করার জন্য উক্ত আইনের ৩৫নং ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

২.১১. মিথ্যা মামলায় প্রকৃত ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৫ক। (১) ধারা সংশোধন

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৫ক। (১) ধারাটিতে মিথ্যা ও বিরক্তিকর মামলার জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিধান আছে, যা বর্তমানে খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া আইনে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারিত থাকা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে উক্ত নির্ধারিত অঙ্ক অতিদ্রুত অযৌক্তিক বলে সাব্যস্ত হতে পারে। এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রকৃত ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করে উক্ত ধারাটি সংশোধন করা আবশ্যক।

সুপারিশ

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৫ক। (১) ধারায় নির্ধারিত সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ ২০,০০০.০০ টাকার স্থলে আদালত কর্তৃক বিধি মোতাবেক ধার্যযোগ্য করে ৩৫ক ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

২.১২. জাল দলিল ও মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ে দণ্ডারোপ করার এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতকে প্রদান

কোনো দেওয়ানি আদালতে কোনো পক্ষ জাল দলিল উপস্থাপন করলে এবং সেটি বিচারান্তে জাল বলে সাব্যস্ত হলেও উক্ত দেওয়ানী আদালত দলিল জাল করার সাথে বা জাল দলিল দাখিল করার সাথে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সরাসরি শাস্তি প্রদান করতে পারে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৫(গ) ধারার বিধানের আলোকে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণিত বিষয়টি পুনরায় ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ আকারে প্রেরণ করতে হয়। ফলে জাল দলিল সংক্রান্তে দেওয়ানী আদালত তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। একারণে দেওয়ানী বিচার প্রক্রিয়ায় মিথ্যা মামলাকারীদের প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

সুপারিশ

জাল দলিল দাখিলের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতকে ফৌজদারি আদালতের ন্যায় দণ্ডারোপ করার এখতিয়ার প্রদান করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

২.১৩. সিভিল জেল এর ক্ষেত্রে Subsistence Allowance সংক্রান্ত বিধান সংস্কার

ডিক্রিজারিতে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার বিধান দেওয়ানি কার্যবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ডিক্রিদারকে আদালতে দায়িকের Subsistence Allowance প্রদান করতে হয়। দেওয়ানী কার্যবিধির ২১ আদেশের ৩৯ বিধিতে বিষয়টির উল্লেখ আছে।

আদালত কোনো আদেশ প্রদান করলে তা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশরূপে গণ করা হয়। এক্ষেত্রে উক্ত আদেশ লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখতে হলে ডিক্রিদারকে তার Subsistence Allowance প্রদানের বিষয়টি একটি অযৌক্তিক ব্যাপার। এতে আদালতের কর্তৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাই এ সংক্রান্ত বিধানটি বাতিল করা প্রয়োজন।

সুপারিশ

ডিক্রিজারিতে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার ক্ষেত্রে ডিক্রিদার কর্তৃক আদালতে দায়িকের Subsistence Allowance জমা দেওয়া সংক্রান্ত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৫৭ ধারা এবং ২১ আদেশের ৩৯ বিধিটি বাতিল করতে হবে।

২.১৪. আদালত অবমাননার সাজা সংযোজন ও জরিমানা বৃদ্ধিকরণ

The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৪৮০ ধারায় আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের যে বিধান রয়েছে তা দেওয়ানি আদালতের জন্যও প্রযোজ্য। তবে যে আদালতের অবমাননা করা হয়েছে, উক্ত আদালত শুধু ২০০ (দুইশত) টাকা জরিমানা করতে পারে। যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত অপ্রতুল এবং

আদালতের মর্যাদা হানিকর। তাই সংশ্লিষ্ট দেওয়ানি আদালত যাতে উক্ত ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার জন্য ০১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে সে সংক্রান্ত সংশোধনী আইনে আনয়ন করতে হবে।

সুপারিশ

The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৪৮০ ধারাটি সংশোধন করে উক্ত ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার জন্য ০১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা আদালতের উপর অর্পণ করতে হবে। উক্ত আইনের ৪৮২ ধারাটি বাতিল করতে হবে।

২.১৫. দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে Summary Procedure সংক্রান্ত বিধান

বাংলাদেশে দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মূলত আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার (Formal Court System) উপর নির্ভর করা হয়। সকল দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা হলে মামলা নিস্পত্তিতে সময় ও খরচ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের দুর্ভোগ বাড়ে। তাছাড়া সকল দেওয়ানী বিরোধ আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়োজন নেই। এজন্য আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে উপ-আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। এতে স্বল্প সময় ও খরচে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর দেওয়ানী বিচার সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ইংল্যান্ড, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে উপ-আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের উপ-আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেওয়ানি বিরোধ নিস্পত্তি হয় এবং কম সংখ্যক মামলা আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। ফলে আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ কম হওয়ায় জটিল মামলার বিচারও তুলনামূলকভাবে কম সময় ও খরচে করা সম্ভব হয়। উপ-আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য The Code of Civil Procedure, 1908 এর Order-XXXVII প্রতিস্থাপন করতে হবে। এখানে বর্ণিত Summary Procedure এর বিধান শুধু Negotiable Instruments এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উক্ত বিধান সংশোধন করে দেওয়ানী মামলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও পক্ষগণের সম্মতিতে উহা প্রয়োগ করার বিধান প্রবর্তন করতে হবে।

সুপারিশ

The Code of Civil Procedure, 1908 এর Order XXXVII প্রতিস্থাপন করতে হবে। এখানে বর্ণিত Summary Procedure এর বিধান শুধু Negotiable Instruments এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উক্ত বিধান সংশোধন করে দেওয়ানী মামলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও পক্ষগণের সম্মতিতে উহা প্রয়োগ করার বিধান প্রবর্তন করতে হবে।

৩. ফৌজদারি বিচার সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব

৩.১. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের উপর সমন জারি

বর্তমানে ফৌজদারি কার্যবিধির ৭০ ধারার বিধানমতে যার উপর সমন জারি করতে হবে তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের যেকোনো প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যের উপর সমন জারি করা হয়। বিদ্যমান এই বিধানটি জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়। । যদিও দেওয়ানী কার্যবিধিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো সাবালক সদস্যের উপর সমন জারির বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৭০ ধারার বিধান সংশোধন করে পরিবারের যেকোনো প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের উপর সমন জারি করা যাবে মর্মে বিধান করতে হবে।

সুপারিশ

ফৌজদারি কার্যবিধির ৭০ ধারার বিধান সংশোধন করে পরিবারের যেকোনো প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের উপর সমন জারি করা যাবে মর্মে বিধান করতে হবে।

৩.২. ফ্যাক্স বা ই-মেইল এর মাধ্যমে সমন জারি

বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের ওপর ফৌজদারি কার্যবিধির ৭২ ধারা অনুসারে সমন জারি করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সকল সরকারি দপ্তরে এখন ফ্যাক্স বা ই-মেইল ঠিকানা রয়েছে। এরূপ অবস্থায় আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে ৭২ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারি কর্মচারিদের ওপর সমন জারির পাশাপাশি বা ব্যাতীত ফ্যাক্স বা ই-মেইল এর মাধ্যমে সমন জারি করা সমীচীন তাহলে আদালত এই পদ্ধতিতে সমন জারি করতে পারবে এবং এভাবে জারি করা সমন যথাযথ সমন জারি হিসেবে গণ্য হবে-আইনে এরূপ বিধান সংযোজন করতে হবে।

সুপারিশ

সরকারি কর্মচারিদের ওপর সমন জারির পাশাপাশি বা ব্যতীত ফ্যাক্স বা ই-মেইল এর মাধ্যমে সমন জারির বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.৩ ফৌজদারি মামলায় আসামীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের বিধান সংশোধন

আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ৮৭ ও ৮৮ ধারার পদক্ষেপ অর্থাৎ হুলিয়া জারি এবং মালামাল ক্রোক করার বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। আদালতে আসামীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৩৯ক ধারায় উল্লিখিত দুইটি বাংলা জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান বাতিল করে রাজধানী থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং আসামির স্থানীয় এলাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান করতে হবে। এর মাধ্যমে মামলা হয়েছে এ বিষয়টি আসামীর জানার সুযোগ ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশ

আদালতে আসামীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৩৯ক ধারায় উল্লিখিত দুইটি বাংলা জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান বাতিল করে রাজধানী থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং আসামির স্থানীয় এলাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান করতে হবে।

৩.৪ ফৌজদারি আপিল বা রিভিশন এর ক্ষেত্রে বিস্তারিত মেমো দাখিলের বিধান

ফৌজদারি আপিল বা রিভিশন এর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দায়সারা গোছের মেমো দাখিলের বিধান সংশোধন করে বিস্তারিত কারণ ও যুক্তি সম্বলিত আপিলের মেমো দাখিলের বিধান করতে হবে। আপিলের প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ একইভাবে বিস্তারিত উত্তরসহ লিখিত আপত্তি দাখিল করবে। আপিল/রিভিশন শুনানিতে পক্ষগণ বা পক্ষগণের অ্যাডভোকেট উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক উল্লিখিত বিস্তারিত আপিল মেমো ও আপত্তির ভিত্তিতে আপীল আদালতকে রায় প্রদান করতে হবে।

৩.৫. ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জরিমানা আরোপের ক্ষমতা যুগোপযোগী করা

ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২ ধারায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের দণ্ড প্রদানের এখতিয়ার বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১০ হাজার টাকা দ্বিতীয় শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৫০০০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করতে পারেন। ১৯৮২ সালের XXIV নম্বর অধ্যাদেশের ৬ ধারার মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটদের জরিমানা করার পূর্ববর্তী এখতিয়ার সংশোধন করে নতুন আর্থিক এখতিয়ার অর্পণ করা হয়। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির বিবেচনায় ১৯৮২ সালের ১০ হাজার টাকার বর্তমান মূল্যমান বহুগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও আদালতের এখতিয়ার বৃদ্ধি পায়নি। ফলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অনেকাংশে তার কার্যকরতা হারিয়েছে। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য জরিমানা প্রদানের এখতিয়ার যুগোপযোগী করে বৃদ্ধি করতে হবে এবং আইনে একটি নতুন ধারা

সংযোজন এর মাধ্যমে উল্লেখ করতে হবে যে সরকার প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিমানার এই এখতিয়ার পুনঃনির্ধারণ করবেন।

সুপারিশ

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জরিমানা আরোপের ক্ষমতা যুগোপযোগী করতে হবে এবং সরকার প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিমানার এই এখতিয়ার পুনঃনির্ধারণ করবেন মর্মে আইনে বিধান সংযোজন করতে হবে।

৩.৬. দণ্ডবিধিসহ অন্যান্য আইনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অপ্রতুল জরিমানার বিধান সংশোধন করে যুগোপযোগী করা

দণ্ডবিধিসহ অন্যান্য আইনের বিভিন্ন স্থানে জরিমানার অপ্রতুল পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮০ ধারায় জরিমানা পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ২০০ টাকা। জরিমানার এই পরিমাণ ১৯৭৮ সালে নির্ধারিত হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে আর সংশোধন করা হয়নি। ফলে বিচার প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত ও অকার্যকর হয়েছে। তাই জরিমানার এই বিধানগুলো যুগোপযোগী করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিমানার পরিমাণ সংসদ কর্তৃক পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

সুপারিশ

দণ্ডবিধিসহ অন্যান্য আইনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অপ্রতুল জরিমানার বিধান সংশোধন করে যুগোপযোগী করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিমানার পরিমাণ সংসদ কর্তৃক পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

৩.৭. সাক্ষী ও ভিকটিমের সুরক্ষা, ভিকটিমের ক্ষতিপূরণ ও সাক্ষীর খরচ বিষয়ে প্রস্তাব

আমাদের বিচার ব্যবস্থায় ভিকটিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি নিয়ত ন্যায়বিচার ব্যহত হয়। সাক্ষ্য আইন, ১৯৭২-এর ১৫১ এবং ১৫২ ধারায় আদালতের ভিতরে সাক্ষীদের অপ্রয়োজনীয় ও মানহানিকর প্রশ্ন হতে সুরক্ষা দেওয়ার বিধান রয়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারায় সাক্ষীদের হুমকি দেয়ার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। তদুপরি আগস্ট ২০১৭ সালে ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যৌথ প্রচেষ্টায়, জেলা আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের জন্য সাক্ষী ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ খসড়া প্রণয়ন করা হয়। অন্যদিকে আইন কমিশন একাধিকবার সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রনয়নের সুপারিশ করেছে। কিন্তু, দেশে অদ্যবধি সাক্ষী সুরক্ষা জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

সাক্ষীর সুরক্ষার সাথে সাথে আদালতে সাক্ষীর আসা-যাওয়ার খরচ প্রদানের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে সাক্ষীর খরচ বাবদ সরকার থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হতো এবং সাক্ষীরা সে খরচ পেতেন। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো বিচারিক কার্যক্রম না থাকায় সাক্ষীদের খরচ প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে।

ভিকটিম একটি মামলার অন্যতম সাক্ষী। কিন্তু, আমাদের দেশে একইভাবে ভিকটিমের সুরক্ষা, ভিকটিমের খরচ বা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধান নাই। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪৫ ধারাটি অত্যন্ত অপ্রতুল।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ বিশ্বের অনেক দেশেই সাক্ষীর সুরক্ষায় আইন রয়েছে। উল্লিখিত কারণাধীনে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলোঃ

সুপারিশ

১। ভিকটিম ও সাক্ষীর এবং তাদের পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া, সাক্ষীদের যাতায়াত খাওয়া বাবদ খরচ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে পুলিশের একটি সাক্ষী প্রটেকশন সেল গঠন করতে হবে। সাক্ষী ও ভিকটিমের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সাক্ষী প্রটেকশন সেল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সাক্ষী ও ভিকটিমের নিরাপত্তায় সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারি বেসরকারি দপ্তর ও ব্যক্তি সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে মর্মে বিধান করতে হবে। নিরাপত্তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আদালত মনিটর করবে।

৩। ভিকটিমকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪৫ ধারা সংশোধন করতে হবে।

৩.৮. আপোশের ক্ষেত্র বৃদ্ধিকরণ

বিদ্যমান ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৪৫ ধারায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর কিছু ধারা আপোশযোগ্য ও কিছু ধারা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশযোগ্য রাখা হয়েছে। দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৪৩ ধারাটি আবশ্যিকভাবেই আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশযোগ্য হওয়া উচিত। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে "বেআইনী জনতার" সংজ্ঞার সুযোগে অনেক ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রেও কেবল আইনগত টেকনিক্যাল কারণে অভিযোগপত্রে ১৪৩ ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মামলাটি আপোসঅযোগ্য হয়ে যায়। অথচ এর অপরাপর ধারাগুলো আপোশযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৪৩ ধারার কারণে পক্ষগণ মামলাটি আপসে নিষ্পত্তি করতে পারেন না। তাই দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৪৩ ধারা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশযোগ্য করা যেতে পারে।

সুপারিশ

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৪৩ ধারাটি আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশযোগ্য করে আইন সংশোধন করতে হবে।

৩.৯. কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রবেশন আদেশ অথবা শুধু জরিমানা দণ্ড প্রদানের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ

দণ্ডবিধির অধিকাংশ ধারায় কারাদণ্ডের সাথে অর্থদণ্ডের উল্লেখ আছে। এতে অনেক ছোটখাটো অপরাধেও এবং প্রথমবার সংঘটিত অপরাধেও দোষী ব্যক্তিকে আদালত কারাদণ্ড প্রদান করে থাকেন। একজন অপরাধী কারাদণ্ড ভোগ করলে পরবর্তীতে তার সংশোধনের সুযোগ কমে যায়। এরূপ অবস্থায় তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে এরূপ অপরাধ প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রবেশন আদেশ অথবা শুধু জরিমানা দণ্ড প্রদানের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপীল /রিভিশনের সম্ভাবনা কমে যাবে এবং আদালতের উপর মামলার চাপ কমবে।

সুপারিশ

তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে এরূপ অপরাধ প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রবেশন আদেশ অথবা শুধু জরিমানা দণ্ড প্রদানের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.১০. দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৯ এর 'Document' এর সংজ্ঞাকে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৩ ধারায় সংজ্ঞায়িত 'Document' এর সমরূপকরণ

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে দলিল তথা Document শব্দটি কেবল কোন বস্তুর উপর প্রকাশিত বর্ণ, চিত্র, চিহ্ন ইত্যাদিকে বুঝায় না। বর্তমানে মানুষ লেনদেনের অনেক কিছুই ডিজিটাল পদ্ধতিতে করেন। অনেকক্ষেত্রেই সেগুলোর বস্তুগত প্রকাশ থাকে না। কেবল digital content হিসেবে virtual জগতে থাকে। তাই এসব বিষয়ে আইনী তর্ক সমাধানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৩ ধারায় 'Document' এর সংজ্ঞায় 'digital record' কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯ ধারার 'Document' এর সংজ্ঞায় 'digital

record’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় ‘Document’ শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। উক্ত শব্দটিকে যুগপোযোগী সংজ্ঞায়িত না করা হলে অনেকক্ষেত্রে আইনী তর্ক ন্যায়সঙ্গতভাবে নিষ্পত্তি করার পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। তাই দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৯ এর ‘Document’ এর সংজ্ঞাকে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৩ ধারায় সংজ্ঞায়িত ‘Document’ এর সমরূপ করতে হবে যেন বিচার বিভাগ কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারে।

সুপারিশ

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৯ এর ‘Document’ এর সংজ্ঞাকে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৩ ধারায় সংজ্ঞায়িত ‘Document’ এর সমরূপ করতে হবে।

৩.১১. “জাস্টিস অব দ্য পিস” এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আইনে সুস্পষ্টরূপে অন্তর্ভুক্তকরণ

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ২৫ ধারায় সকল ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের “জাস্টিস অব দ্য পিস” হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ করা যেতে পারে। অধিকন্তু “জাস্টিস অব দ্য পিস” এর ক্ষমতা বিষয়ে উক্ত আইন নীরব। “জাস্টিস অব দ্য পিস” এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সুস্পষ্ট করে আমাদের দেশের ফৌজদারি কার্যবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে পারে।

সুপারিশ

“জাস্টিস অব দ্য পিস” এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আইনে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১২. ফৌজদারি কার্যবিধিতে Plea Bargaining এর বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ

যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ইতোমধ্যেই Plea Bargaining এর বিধান ফৌজদারি আইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট Murlidhar Meghraj Loya v. State of Maharashtra[76]; Kasambhai Abdul Rehman Bhai Sheikh v. State of Gujarat[77]; Uttar Pradesh v. Chandrika[78]; ইত্যাদি মামলাগুলোতে Plea Bargaining কে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ফৌজদারি মামলার বিচার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ২০০৬ সালে তখনকার প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধিতে ২১ক অধ্যায় সংযুক্ত করে ভারত সরকার ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় Plea Bargaining বিধান সংযুক্ত করে। এই বিধান ২০২৪ সালে নতুন ভাবে প্রণীত ফোজদারি কাযবিধি আইনের ২৩ অধ্যায়েও সংযুক্ত আছে। মামলা জট কমাতে আমাদের দেশে প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধিতেও অনুরূপ Plea Bargaining এর বিধান সংযুক্ত করা যেতে পারে।

সুপারিশ

ফৌজদারি কার্যবিধিতে Plea Bargaining এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.১৩. শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি (Sentencing hearing) পুনঃপ্রবর্তন এবং দণ্ড প্রদান নির্দেশিকা (Sentencing guideline) প্রণয়ন

শাস্তি বা দণ্ড বিষয়ে শুনানি বিশ্বের অনেক দেশে প্রচলিত আছে। অভিযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে কিংবা অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ার পরে একটি পৃথক তারিখে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির যথাযথ শাস্তি কি হতে পারে তা বিবেচনা করা হয়।

---

[৭৬] AIR 1976 SC 1929

[৭৭] (1980) 3 SCC 120

[৭৮] AIR 2000 SC 164

আমাদের দেশে বিচারকেরা একই অধিবেশনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে শাস্তি দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন। ফলে, প্রদানকৃত শাস্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিংবা অপরাধী কিংবা ভিকটিমের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি না থাকার আরেকটি ফলাফল হলো শাস্তি সংক্রান্তে বৈষম্য। একটি অপরাধে একেকজন বিচারক একেক ভাবে শাস্তি প্রদান করেন। ফলে, একই অপরাধে বিচারকভেদে শাস্তি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একই অপরাধে কোন বিচারক যেমন প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন, ঠিক তেমনি অন্য কোন বিচারক ৫ বছরের কিংবা ৩ কিংবা ২ কিংবা ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করতে পারেন। এই পরিস্থিতি তৈরি হয় শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি না থাকা এবং শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নির্দেশনা (Sentencing Guideline) না থাকার কারণে। শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি এবং নির্দেশনা থাকলে উভয় পক্ষ উক্ত শুনানিতে নির্দেশনা অনুযায়ী শাস্তি কি রকম হতে পারে, কি কি বিষয় বিবেচিত হতে পারে তা উপস্থাপন করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু, উভয়টির অনুপস্থিতি আমাদের দেশে শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারককে অসীম ক্ষমতা দিয়েছে যা অযৌক্তিক এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

এই বিষয়ে রোকেয়া বেগম বনাম রাষ্ট্র মামলায়[৭৯] আপীল বিভাগ উল্লেখ করেছেন, আমাদের The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 250K(2) এবং 265K(2) ধারায় একসময় শাস্তি সংক্রান্ত শুনানির (sentence hearing) সুযোগ ছিলো। Law Reforms Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLIX of 1978) এর মাধ্যমে এই দুইটি ধারা আমাদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ধারা দুটি নিম্নরূপঃ

"250K(2): Where, in any case under this Chapter, the Magistrate finds the accused guilty, but does not proceed in accordance with the provisions of section 349 or section 562, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law".

"265K(2): If the accused is convicted, the Court shall, unless it proceeds in accordance with the provisions of section 562, hear the accused on the question of sentence, and then pass sentence on him according to law".

আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী এই বিধান দুইটির মাধ্যমে অভিযুক্ত আদালতে তাকে কম শাস্তি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতি বা সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারতো। দোষী সাব্যস্ত অভিযুক্ত সাক্ষ্য প্রমান উপস্থাপন করলে রাষ্ট্রপক্ষ সেটি সম্পর্কে বক্তব্য বা পাল্টা সাক্ষ্য, প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারতো। কিন্তু, ১৯৮২ সনের অধ্যাদেশ নং XXIV এর ২১ ধারা এবং ১৯৮৩ সনের অধ্যাদেশ নং- XXXVII এর ৩ ধারা দ্বারা উভয় ধারা বাতিল করা হয়। ফলে, আমাদের আইনে অভিযুক্ত কর্তৃক তার শাস্তি হ্রাস করার বিষয়ে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ নেই।

এমতাবস্থায়, ফৌজদারি কার্যবিধিতে শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি পুনঃপ্রবর্তন এবং পৃথক দণ্ড প্রদান নির্দেশিকা প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

সুপারিশ

ফৌজদারি কার্যবিধিতে শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি পুনঃপ্রবর্তন এবং পৃথক দণ্ড প্রদান নির্দেশিকা (Sentencing guideline) প্রণয়ন করতে হবে।

৩.১৪. ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা সংশোধন

আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের অধিকাংশ আদালতে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের মহামারির আকার ধারণ করেছে। এ কারণে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি বিশেষ করে ফৌজদারি মামলায় বিনা কারণে কারাভোগসহ অহেতুক হয়রানি ও বহুমুখী ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি পরিকাঠামোতে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২১১ ও ১৮২ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ২৫০ ধারাতে

[৭৯] 4 SCOB [2015] AD 20.

ক্ষতিপূরণের বিধান থাকলেও তার সর্বোচ্চ পরিমাণ মাত্র ১০০০.০০ টাকা, এর অতিরিক্তভাবে আরও ৩০০০.০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিবরণ রয়েছে, যা বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও হয়রানির শিকার ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। উক্ত পরিমাণ সময়োপযোগী করা আবশ্যক।
এছাড়াও ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা সংশোধন করে "ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দের পরে দায়রা আদালত বা অন্য কোনো ফৌজদারি আদালত যুক্ত করে এ ধারায় বর্ণিত ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ফৌজদারি আদালতকে সমরূপ ক্ষমতা প্রদান করাও আবশ্যক।

সুপারিশ

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা সংশোধন করে শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যুগোপযোগী করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও অন্যান্য সকল ফৌজদারি আদালতকে একই ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

৩. ১৫. শিশু আইন, ২০১৩ সংশোধন

শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বিচার শিশু আদালত করে থাকেন। কিন্তু একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত অপরাধে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামি ও শিশু অভিযুক্ত থাকলে শিশুর বিচার শিশু আদালত এবং প্রাপ্ত বয়স্কের বিচার উপযুক্ত ফৌজদারি আদালত করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আদালতে বিচারের ফলে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামী ও শিশুর ক্ষেত্রে অনেক সময় বিচারের ফল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়। এই প্রেক্ষিতে একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত অপরাধে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর সাথে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামি থাকলে তাদের বিচার যাতে শিশু আদালত আলাদা আলাদাভাবে করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন দরকার।

সুপারিশ

একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত অপরাধে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর সাথে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামি থাকলে তাদের বিচার যাতে শিশু আদালত আলাদা আলাদাভাবে করতে পারেন সে জন্য আইন সংশোধন করতে হবে।

৩. ১৬ মোহরানা ধার্যের বিধান সংশোধন

মুসলিম আইনে প্রদত্ত মোহরানা বিষয়ক আইনগত অধিকার সুরক্ষার স্বার্থে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অপরিশোধিত মোহরানা নির্ধারণের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে বিবাহের পরবর্তী যে কোনো সময়ে এমনকী ২০/২৫ বছর পরেও বিবাহ বিচ্ছেদ হলে নিকাহনামায় লিখিত টাকার অংকে প্রকাশিত মোহরানাকে ভিত্তি করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সাধারণত পারিবারিক আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে একই নিয়মে অপরিশোধিত মোহরানা ধার্য ও পরিশোধের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হল এই যে টাকার ক্রয় ক্ষমতা সময়ের সাথে সাথে নিম্নগামী। ফলে মোহরানা ধার্যকরণ এবং পরিশোধের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ন্যূনতম সুরক্ষার শর্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

সুপারিশ

এই বাস্তবতার আলোকে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১০ এই মর্মে সংশোধন করা প্রয়োজন যে,
(ক) বিবাহের সময় নিকাহনামাতে মোহরানার পরিমাণ টাকায় নির্ধারণের সাথে সাথে সমমূল্যে স্বর্ণের পরিমাণ (স্বর্ণের ক্যারেটসহ) উল্লেখ করতে হবে এবং পরিশোধের সময় উল্লিখিত স্বর্ণের পরিমাণের ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য মোহরানার অংক নির্ধারণ করতে হবে।
(খ) যেহেতু মোহরানা পরিশোধ করা ধর্মীয় দায়িত্ব এবং কেবলমাত্র চুক্তি হতে উদ্ভূত দায় নয়, সেহেতু মোহরানার দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে তামাদি আইন প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণ

১. ভূমিকা

কার্যকর বিচারব্যবস্থার সুফল বিচারপ্রার্থী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে বিচারকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বিচারকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। রাষ্ট্র বিচারকগণের দক্ষতা ও বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যে অর্থ খরচ করবে আর্থিক বিচারে তার বহুগুণ প্রাপ্তি মিলবে জনসাধারণের প্রতি সঠিক বিচারসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে।

বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিচারকদের জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্রমপরিবর্তন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে বিচারব্যবস্থাকে যুযোগযোগী রাখতে হবে। বিচার বিভাগ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিচারকদের দক্ষতার উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। একইসাথে বিচার বিভাগের অবকাঠাতোগত উন্নয়ন, সুষ্ঠু প্রাধিকার ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২. প্রশিক্ষণের সুযোগ

ভারতের আইন কমিশন বিচারকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে **১৯৮৬** সালে **১১৭**তম প্রতিবেদনের বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। উক্ত প্রতিবেদনে বিচারকগণের জন্য প্রশিক্ষণের কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন, প্রশিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ রাখা হয়। বিচার বিভাগের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়[৮০]:

> Judiciary being an important instrumentality for exercise of State judicial power, it had to shoulder the burden along with other wings to set up a welfare State in which justice – social, economic and political – shall inform all the institutions of national life. (...) Human resources constitute a critical element of any organisation; the quality and quantity of human resources significantly influence the level of effectiveness as well as efficiency of organisation. (...) If the human resources of an organisation thus form a very important part of an organisation, it is undeniable that it must remain up-to-date both with regard to changes in the hopes and aspirations of the people, demands from the justice system and contemporary needs of the society, research in the field of law, new and revised methods of resolving disputes in the society, the concept of equality in a society consisting of unequals and the goals of the Constitution.

কল্যাণ-রাষ্ট্র মাত্রই তার জনগণের জন্য সবচেয়ে চমৎকার ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে চায়। বিচারসংক্রান্ত সেবা এই চাওয়ার বাইরে নয়। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ বিচারকের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিচারিক সেবার মান নিঃসন্দেহে বেশি। ফলে বিচারকের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, স্কলারশিপ, ফেলোশিপ, বৈদেশিক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচির

---

[৮০] One Hundred Seventeenth Report on Training of Judicial Officers, November 1986, Law Commission of India, p. 1.

আয়োজন করলে, রাষ্ট্রের জনগণ দীর্ঘ মেয়াদে তার সুফল ভোগ করবেন মানসম্মত বিচারসেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে। ফলে বিচারকগণের প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে কেবল সংশ্লিষ্ট বিচারকের প্রাপ্ত সুবিধার সঙ্গে তুলনা না করে একে রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে চিন্তা করতে হবে।

৩. বিচারকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বৈশ্বিক ব্যবস্থা

দেশ	ব্যবস্থা
ভারত	১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারি অন্ধ্র প্রদেশ স্টেট জুডিসিয়াল একাডেমি অব এডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা করে অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট। পরবর্তীতে এর নাম হয় অন্ধ্র প্রদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি। ১৯৯৩ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি'। সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালের ১৭ আগস্ট রেজিস্ট্রিভূক্ত হয়। ভূপালে অবস্থিত এই জুডিসিয়াল একাডেমিটির উচ্চমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে সুনাম রয়েছে। জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি ছাড়াও বিচারকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভারতে ২৫টি একাডেমি/ইনস্টিটিউট রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়ায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের পেশাগত উন্নয়নের জন্য রয়েছে 'ন্যাশনাল জুডিসিয়াল কলেজ অব অস্ট্রেলিয়া (এনজেসিএ)। এটি ২০০২ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।
যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণের জন্য বিচার সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল জুডিসিয়াল কলেজ। প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানটি ১০০টির বেশি কোর্স/প্রোগ্রামের আয়োজন করে এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্য থেকে ৮ হাজারের বেশি বিচারক অংশগ্রহণ করেন। ১৫০টির বেশি দেশের বিচারকগণ এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন।
যুক্তরাজ্য	যুক্তরাজ্যের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের অফিসিয়াল প্রতিষ্ঠান হলো 'জুডিসিয়াল কলেজ'। এটি পূর্বে 'জুডিসিয়াল স্টাডিজ বোর্ড' নামে পরিচিত ছিল, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। ২০১১ সালে এর নামকরণ হয় 'জুডিসিয়াল কলেজ'।
কানাডা	কানাডার বিচারকগণের জন্য প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে 'ন্যাশনাল জুডিসিয়াল ইনস্টিটিউট'। অটোয়ায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
জাপান	জাপানের 'লিগ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' বিচারকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এটি জাপানের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়।
নেপাল	২০০৪ সালে নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি, নেপাল। এই প্রতিষ্ঠানটি নেপালের বিচারকগণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিচারকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করেছে এবং সেই অনুযায়ী জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলাদেশে 'বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) বিচারকগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। বিচারকগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয় 'বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আইন, ১৯৯৫'। ১৯৯৫ সালের ২০ আগস্ট বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আইন, ১৯৯৫ এর ৩(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। সুপ্রীম কোর্টের একজন সাবেক বিচারপতিকে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক

কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ১ মার্চ প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের বিচারকগণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এটিই একমাত্র নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

৪. জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা

বর্তমানে বিচারকদের ৪ মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৬ মাস মেয়াদি। ফলে বিচারকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস করা প্রয়োজন। সারাদেশের বিচারকদের প্রশিক্ষণের উন্নত ব্যবস্থার জন্য একটি জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। উক্ত জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমিতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং দেশের জেলা আদালতগুলোর বিচারকদের আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে একটি জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি' প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। একাডেমি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫. আঞ্চলিক জুডিসিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও আদালত সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক জুডিসিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক জুডিসিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটউটে আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সরকারি আইনজীবীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

৬. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন

২০০৩ সালে প্রণীত হয় 'পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং পলিসি'। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা' জারি করা হয়। তবে বিচারকদের জন্য পৃথক কোনো ট্রেনিং পলিসি প্রণয়ন করা হয়নি। বিচারকদের প্রশিক্ষণের পৃথক ধরন বিবেচনায় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার মান ও নীতি নির্ধারণ করতে পৃথক 'বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৭. বিচারকগণের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি

বিচারকদের জন্য নিয়মিতভাবে বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। বিদেশে প্রশিক্ষণের আয়োজন করলে বিচারব্যবস্থার বৈশ্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিচারকগণ ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন। বিচারকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা উল্লেখ করা হলো:

(অ) UNDP, USAID, UKAID, JAICA, KOICA, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বিচারকগণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(আ) বিচারকগণের জন্য লিডারশিপ ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা উচিত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশের বেশ কিছু খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় এ সংক্রান্ত শর্ট কোর্স আয়োজন করে। বিচারকদের জন্য এসব শর্টকোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হলে তা নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়ক হবে, যা বিচার প্রশাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(ই) বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন কোর্স চালু করা উচিত।

(ঈ) বিদেশের জুডিসিয়াল একাডেমিগুলোতে বিচারকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সুপারিশ

(১) বিচারকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) প্রতিটি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক জুডিসিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
(৩) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
(৪) বিচারকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

৮. গবেষণা ও সংস্কার

বিচারব্যবস্থা যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন নতুন বৈশ্বিক পরিবর্তনকে অভিযোজনসহ নিজ দেশে প্রয়োগের জন্য গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফল বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা সহজতর হয়। বিচার বিভাগ সংক্রান্ত গবেষণা ও সংস্কারের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত মানুষের জন্য বিচারিক সেবার মান উন্নয়ন। বিচারিক সেবার মান উন্নয়নের সাথে জুডিসিয়াল সার্ভিসের মান উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাশের জুডিসিয়াল সার্ভিসের মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত গবেষণা হওয়া উচিত। গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রয়োজন। এজন্য জুডিসিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

জুডিসিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করবে এবং নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব করবে। উক্ত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আওতাধীন পৃথক 'পলিসি রিসার্চ ও রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

সুপারিশ

(১) বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি জুডিসিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
(২) গবেষণালব্ধ ফলাফল বিবেচনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আওতাধীন পৃথক 'পলিসি রিসার্চ ও রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আইনপেশার সংস্কার

১. ভূমিকা

আইনজীবীরা একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধানের ৩৩(১) অনুচ্ছেদের গ্রেফতার ও আটক সংক্রান্ত বিধানে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত ৯৫(২) অনুচ্ছেদে এবং বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত নানাবিধ আইনে আইন পেশার স্বীকৃতির প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং, বিচার বিভাগ বিষয়ক যে কোনো সংস্কার প্রচেষ্টায় আইনজীবীদের প্রসঙ্গটি অপরিহার্য। তবে, নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রতিবেদনে মূলত তিনটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যথাঃ আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ এবং বিচার কার্যক্রমে তাদের আচরণ।

২. সনদপ্রাপ্তির বর্তমান পদ্ধতি

২.১ নাগরিকত্ব বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

Bangladesh Legal Practitioner and Bar Council Order 1972 এর অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করতে হবেঃ

(ক) তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
(খ) তাকে ২১ বছর বয়সী হতে হবে;
(গ) বাংলাদেশে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে অথবা বার কাউন্সিল স্বীকৃত বাংলাদেশের বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে তার আইনের ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা তাকে ব্যারিস্টার-এট-ল’ হতে হবে।

২.২ শিক্ষানবিশ পর্যায়

বাংলাদেশে এলএলবি পাশ করার পর একজন ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হওয়ার যোগ্য হন। তাকে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেটের অধীনে পিউপিলেজ চুক্তি সম্পাদনক্রমে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করতে হয়।

২.৩ আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা

২.৩.১ পরীক্ষার সিলেবাস

বর্তমানে মোট ৭টি বিষয়ের ওপর আইনজীবী তালিকাভুক্তির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলো হলোঃ

১। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮
২। দণ্ডবিধি, ১৮৬০
৩। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৪। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭
৫। তামাদি আইন, ১৯০৮
৬। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ ও
৭। বার কাউন্সিল অর্ডার এন্ড রুলস, ১৯৭২

২.৩.২। পরীক্ষা পদ্ধতি

আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষার মোট তিনটি ধাপ রয়েছে:

(ক) বহু-নির্বাচনি (এমসিকিউ)
(খ) লিখিত পরীক্ষা
(গ) মৌখিক পরীক্ষা

অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষার প্রার্থীদের প্রথমেই ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা নেওয়া হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এরপর ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। এমসিকিউ এবং লিখিত দুইটি পরীক্ষাতেই পাস নম্বর ৫০। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তীতে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয় যার পাশ নম্বর ২৫। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই একজন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে আইনজীবী হিসেবে সনদপ্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে গণ্য হন।

৩. পার্শ্ববর্তী দেশে আইনজীবী সনদপ্রাপ্তি পদ্ধতি

৩.১ ভারত

ভারতে আইনজীবী হতে হলে একজনকে রাজ্য বার কাউন্সিলে নিবন্ধন করতে হয় এবং অল ইন্ডিয়া বার এক্সামিনেশন (AIBE) পাস করতে হয়, যা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (BCI) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রার্থীদের অবশ্যই BCI স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ থেকে এলএলবি (৩ বছরের বা ৫ বছরের) ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। ভারতে আইন পেশা চর্চার জন্য অল ইন্ডিয়া বার এক্সামিনেশন (AIBE) একটি বাধ্যতামূলক সনদ পরীক্ষা। AIBE পরীক্ষায় একজন প্রার্থীকে ১০০ মার্কের MCQ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় যেখানে তিনি আইনের সরকারি প্রকাশনা (Bare Act)-এর সহায়তা নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন। বাংলাদেশের তুলনায় বেশ বিস্তৃত এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন AIBE পরীক্ষার সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাংবিধানিক আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি, দেওয়ানি কার্যবিধি, ভারতীয় দণ্ডবিধি, সাক্ষ্য আইন, পেশাগত নৈতিকতা, পারিবারিক আইন, প্রশাসনিক আইন, জনস্বার্থ মামলা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, পরিবেশ আইন, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি আইন, সালিশি আইন, কোম্পানি আইন, সাইবার আইন, ইত্যাদি ।

৩.২ শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় Attorney-at-Law বা আইনজীবী তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া এলএলবি এবং নন-এলএলবি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুটা ভিন্ন। সাধারণত, অ্যাটর্নি-এট-ল হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের শ্রীলঙ্কা ল' কলেজ (SLLC) এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি স্নাতকরা SLLC'র প্রিলিমিনারি এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি পান, অর্থ্যাৎ তারা সরাসরি ফাইনাল বর্ষে ভর্তি হন। তবে, নন এলএলবি শিক্ষার্থীদের SLLC-তে সম্পূর্ণ তিন বছর অধ্যয়ন করতে হয়। SLLC'র প্রশিক্ষণে বিভিন্ন আইনি বিষয়ের উপর লেকচার, টিউটোরিয়াল এবং ব্যবহারিক অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা ননএলএলবি শিক্ষার্থীদের জন্য তিন বছর এবং এলএলবি স্নাতকদের জন্য এক বছর স্থায়ী হয়। SLLC তে অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পরে, শ্রীলঙ্কার সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক Attorney-at-Law হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে সকল শিক্ষার্থীকে আট বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সিনিয়র অ্যাটর্নির অধীনে ছয় মাসের শিক্ষানবিশীতে অংশ নিতে হয়। যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখার ফলে বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর চাইতে শ্রীলঙ্কার আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া বেশ এগিয়ে আছে।

৪. বাংলাদেশে আইনজীবীগণের যোগ্যতা এবং সনদপ্রাপ্তিতে বিদ্যমান সমস্যা

৪.১ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষার সিলেবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা নতুন আইনজীবীদের পেশাগত জীবনে প্রবেশের যোগ্যতা নির্ধারণ করে। তবে বর্তমানে বার কাউন্সিল পরীক্ষার সীমাবদ্ধ সিলেবাস দেশের পরিবর্তনশীল আইনগত প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশে আইন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং নতুন নতুন আইনগত চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। বার কাউন্সিলের বর্তমান সিলেবাসে এসব পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় না। এর ফলে প্রার্থীরা শুধু পুরোনো আইনি ধারণাগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকে যান, যা তাদের ভবিষ্যত পেশাগত জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে মাত্র ৭টি আইন বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। এক্ষেত্রে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন সিলেবাসে যোগ করা আবশ্যক, যেমনঃ সংবিধান, পারিবারিক আইন, অর্থ ঋণ আদালত আইন, Negotiable Instruments Act, 1881, শ্রম আইন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ইত্যাদি। তাছাড়া, আইন-পেশায় নৈতিকতা (Legal Ethics) একটি বাধ্যতামূলক পৃথক বিষয় হিসাবে পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

৪.২ বিলম্বিত অর্ন্তভুক্তি পরীক্ষা

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ। তবে, এই পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় বারবার বিলম্ব একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আইনপেশার প্রার্থীদের নানা আর্থিক, মানসিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করছে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক সাধারণত বছরে একবার অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা নেওয়ার কথা থাকলেও, সংস্থাটিকে প্রায় সবসময় পরীক্ষা আয়োজনে বিলম্ব করতে দেখা যায়। এমনকি দুই থেকে তিন বছর বিরতিতে অনেক সময় পরীক্ষা আয়োজনের উদাহরণ আছে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বনাম এ কে এম ফজলুল কমির এবং অন্যান্য (২০১৭) মামলার রায়ে প্রতি বছর অন্তত একবার পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে ব্যর্থতার কথা উঠে এসেছে। এছাড়া উক্ত মামলার রায়ে বার কাউন্সিলকে প্রতি ক্যালেন্ডার বছরে জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনকারীদের অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। তবে ২০২০-২৩ সালের মধ্যে পূর্বের অতি বিলম্ব কাটিয়ে তিনবার অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা নেওয়া হলেও সম্প্রতি আবারো অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা গ্রহণে বার কাউন্সিল কালক্ষেপন করছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রতি বছর দুইবার আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি (AIBE) পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষা গ্রহণের দুই মাসের মধ্যেই আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া শ্রীলঙ্কাতেও বছরে দুইবার SLLC কর্তৃক Attorney-at-Law অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। স্পষ্টত ভারত ও শ্রীলঙ্কার তুলনায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিল অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা গ্রহণে বেশ পিছিয়ে আছে।

বাংলাদেশে বার কাউন্সিল পরীক্ষার মাধ্যমে আইনজীবীদের তালিকাভুক্তির জন্য বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১(খ) এর মাধ্যমে ৫-সদস্য বিশিষ্ট তালিকাভুক্তি কমিটি গঠন করা হয়। আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারপতি , বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং বার কাউন্সিলের একজন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে তালিকাভুক্তি কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। বাস্তবতা হচ্ছে কমিটির বিচারপতি সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই বিশাল সংখ্যক মামলার বিচারিক কার্যক্রমের চাপে ভারাক্রান্ত থাকেন। বিচারিক দায়িত্বের বাইরে গিয়ে তালিকাভুক্তি কমিটির দায়িত্ব পালন তাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষে তাঁর নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে তালিকাভুক্তি কমিটির কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যার ফলে বার কাউন্সিল পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব বেড়েই চলেছে যা আইনপেশায় যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের জন্য চরম হতাশাজনক একটি বিষয়।

৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক আইনজীবীদের জন্য এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই। কিন্তু আইনজীবীদের আইন বিষয়ক জ্ঞান ছাড়াও মামলার কৌশল, আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা, ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, এবং পেশাগত আচরণ সম্পর্কে দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। এছাড়া এই বিশেষ প্রশিক্ষণ নবীন আইনজীবীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে এবং তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের উন্নত এবং বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আইনজীবীদের প্রি-এনরোলমেন্ট প্রশিক্ষণ বেশ সাধারণ বিষয়। ইংল্যান্ডে আইনের ডিগ্রির পর Bar Standard Board কর্তৃক এক বছর মেয়াদি BPTC (Bar Professional Training Course) কোর্সে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে আইনের ডিগ্রি শেষে ২১ সপ্তাহ মেয়াদি বাধ্যতামূলক PLT (Practical Legal Training) কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় SLLC কর্তৃক তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আইন পেশায় যোগদানের পূর্ব-যোগ্যতা হিসেবে SLLC প্রদত্ত ছয় মাস মেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানবীশকাল সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত ছয় মাসব্যাপী শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা চাওয়া হলেও বাস্তবে এই শিক্ষানবীশীর তেমন কার্যকারিতা দেখা যায় না।

৫. পেশাগত শৃঙ্খলা ও বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা

আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল এই বিষয়ে নজরদারি করার জন্য গঠিত হলেও, এর কার্যকারিতা এবং আইনজীবীদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব আইন পেশার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে। পেশাগত নৈতিকতা বিষয়ক বিধি থাকলেও, তাদের প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীদের পেশাগত সংস্কার এবং বার কাউন্সিলের কার্যক্রমের উন্নয়ন করা জরুরি।

৬. পেশাগত শৃঙ্খলার গুরুত্ব

স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগে নৈতিকতা, দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশে আইনজীবীদের আচরণ ও পেশাগত কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল। তাদের পেশাগত শৃঙ্খলা নিশ্চিত না হলে আইনের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায়। সুতরাং, পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখা আইনজীবীদের নৈতিক দায়িত্বই শুধু নয়, এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

তবে বাস্তবতা এই যে, পেশাগত মান রক্ষায় ও আচরণগত বিষয়ে কার্যত রয়েছে অনেক আইনজীবীর মধ্যেই রয়েছে অবহেলা। যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ডে:

(১) মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রিতা;
(২) বিচারকের সাথে অপেশাদার অচরণ;
(৩) মামলা পরিচালনায় অবহেলা;
(৪) মক্কেলের অনুরোধ সত্ত্বেও অনাপত্তিপত্র (NOC) প্রদান না করা;
(৫) আইনজীবী সমিতিগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার;
(৬) কোনো মামলায় কোনো আইনজীবী ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকলে তাঁর বিপক্ষে অন্য আইনজীবীর নিয়োগে বাধাপ্রদান এবং আদালত বর্জন;
(৭) মিথ্যা মামলাকে নিরুৎসাহিত না করা;

(৮) টিআইবি রিপোর্ট অনুসারে বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে কতিপয় আইনজীবীর অংশগ্রহণ;

(৯) মামলার ফি গ্রহণে রশিদ না দেয়া; ইত্যাদি।

বাংলাদেশে আইনজীবীদের মধ্যে মক্কেলের কাছ থেকে মামলার ফি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো লিখিত রেকর্ড রাখার প্রবণতা খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে মক্কেল এবং আইনজীবীর মধ্যে আর্থিক বিরোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এছাড়া ফি গ্রহণের রশিদ না থাকার ফলে মামলার কোনো পর্যায়ে মক্কেল কত ফি দিয়েছেন তা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে । রেকর্ড না থাকায় এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, ফি গ্রহণে কোনো লিখিত রেকর্ড না থাকা আয়কর আইনের বিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ।

৭. অভিযোগ নিষ্পত্তির অসন্তোষজনক পরিস্থিতি

বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাক্টিশনার ও বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ (বার কাউন্সিল আদেশ) এর অনুচ্ছেদ ৩২-৩৮ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালায় আইনজীবীদের পেশাগত অসাদাচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের এবং ট্রাইবুনাল কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তির বিস্তারিত বিধান আছে। বার কাউন্সিল প্রদত্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় ২০২০-২০২৪ সালে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৪০১ টি এবং নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৪০ টি।

৭.১ পেশাগত অসদাচরণকে সুনির্দিষ্ট করা

১৯৭২ সালের বার কাউন্সিল অর্ডার কিংবা বার কাউন্সিল বিধিতে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের কোনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নেই। 'পেশাগত অসদাচরণ' একটি ব্যাপক ধারণা, যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় ট্রাইব্যুনালকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অস্পষ্টতার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরি হতে পারে, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। ২০২৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়েও বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসাদাচরণের সংজ্ঞা না থাকা এবং যথাযথভাবে এর সংজ্ঞা নিরূপণের গুরুত্বের বিষয়টি উঠে আসে।

৭.২ ট্রাইব্যুনালের প্রশ্নবিদ্ধ নিরপেক্ষতা

বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের তিনজন সদস্যের সবাই আইনজীবী হওয়ায় ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ট্রাইব্যুনালের তিনজন সদস্যের মধ্যে দুইজনই বার কাউন্সিলের সদস্য হওয়ায় ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যে বার কাউন্সিলের নির্বাচনী বিবেচনার প্রভাবও কাজ করতে পারে। এই কারণে অভিযোগকারী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

৭.৩ তদন্তের সীমিত সুযোগ

বার কাউন্সিল আদেশ কিংবা বিধিতে অভিযোগের তদন্তের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা বা সংস্থার উল্লেখ নেই। ফলে, অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ পর্যায়ের তদন্তের সুযোগ সীমিত। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা বিচারিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে।

৭.৪ মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে অপ্রতুল জরিমানা

আইনজীবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানার বিধান অত্যন্ত অপ্রতুল। এই সামান্য জরিমানা অভিযোগকারীদের মিথ্যা অভিযোগ করতে উৎসাহিত করতে পারে, যেহেতু এর মাধ্যমে তাদের তেমন কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আইনজীবীদের হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সুপারিশ

(ক) প্রচলিত মামলার ধরন বিবেচনায় সনদপ্রাপ্তির পরীক্ষার সিলেবাসে আরো কিছু আইন, যেমনঃ পারিবারিক আইন, অর্থঋণ আদালত আইন, নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, শ্রম আইন, ইত্যাদি সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আইনজীবীদের সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য সাংবিধানিক আইনকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

(খ) আইনজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে, আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর প্রথম ছয় মাসে আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত বাস্তবতার নিরিখে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) আইনজীবীদের পেশাগত বিধিমালা Canons of Professional Conduct and Etiquette কে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। উক্ত বিধিমালায় বর্তমানে আইন পেশায় বিদ্যমান শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাবলিকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন বিধি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া এই পেশাগত বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগে গুরুত্বারোপ করতে হবে। ।

(ঘ) বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা থাকতে হবে। উক্ত সংজ্ঞায় আইনজীবীর পেশাগত দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত বা গুরুতর অবহেলা, অসততা, দুর্নীতি, মক্কেলের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ, আইন লংঘনের পরামর্শ, আদালতের প্রতি অসম্মান, সহকর্মীদের প্রতি অসদাচরণ, এবং বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত Canons of Professional Conduct and Etiquette এর নির্দেশনা ভঙ্গের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।।

(ঙ) আইনজীবীদের সংখ্যা এবং দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা বিবেচনা করে অবিলম্বে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ঢাকায় স্থায়ীভাবে ৫টি ট্রাইব্যুনাল এবং ঢাকার বাইরে প্রতিটি জেলায় একটি করে ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে আইনজীবী এবং অভিযোগকারী তাদের নিজ জেলার ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের এবং পরিচালনা করতে পারেন।। ট্রাইব্যুনালের গঠন সংশোধন করা উচিত যাতে এর প্রধান হিসাবে একজন বিচারক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং অন্য দুইজন সদস্য আইনজীবীগণের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন।

(চ) আদালতে এজলাস কক্ষের পাশাপাশি, সেরেস্তা, নেজারতখানা, রেকর্ডরুম, নকলখানা এবং আদালতের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি সেগুলোর যথাযথ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে নিরাপত্তা প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আইনজীবী এবং অন্যান্যদের অসদাচরণের অভিযোগের তদন্ত সুষ্ঠু ও কাযকর হবে।

(ছ) আইনজীবীর ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং একটি লিখিত চুক্তি থাকা আবশ্যক। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবার ফি পরিশোধের পর আইনজীবীর মক্কেলকে একটি রসিদ প্রদান করবেন। উক্ত রসিদে ফি পরিশোধের তারিখ, পরিশোধিত ফি'র পরিমাণ, কোন মামলার জন্য ফি পরিশোধ করা হয়েছে তার বিবরণ এবং আইনজীবীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(জ) আইনজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক অভিযোগ দায়েরের কারণে আইনজীবীর ব্যক্তিগত এবং পেশাগত ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে জরিমানার বিধান যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

(ঝ) আইনজীবী সমিতিগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। বিচারিক প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং গতিশীল রাখার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে হবে[৮১]।

[৮১] ঊনত্রিংশ অধ্যায় দেখুন।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

আইন শিক্ষার সংস্কার

বর্তমানে বাংলাদেশে আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন দেখভাল করার জন্য একক কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এবং আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা সমন্বয়হীনভাবে আইন শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে। আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন বিভাগ এবং আইন কলেজ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৮২টি আইন কলেজ প্রাতিষ্ঠিনাকি ভাবে আইন স্নাতক (সম্মান) ও পাস ডিগ্রি প্রদান করছে। এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যাপূর্ণ ক্ষেত্র বিভিন্ন গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- সমন্বয়হীন পাঠ্যসূচি
- আইন শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই
- আইন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে উৎসাহিত না করে চাপিয়ে দেওয়া
- আইন শিক্ষায় ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

এসব সমস্যা লাঘবের জন্য বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন নিম্নরূপ প্রস্তাব করছে:

আইন শিক্ষা বোর্ড: আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন দেখভালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র আইন শিক্ষা বোর্ড থাকা উচিত। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে উক্ত বোর্ড আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উক্ত আইন শিক্ষা বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ হতে পারে:

১.	জেলা আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক	চেয়ারম্যান
২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আইনের অধ্যাপক	সদস্য
৬.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আইনের অধ্যাপক	সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন (সম্মান) কোর্সে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা: আইন শিক্ষা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইন (সম্মান) কোর্সে ভর্তি এবং ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করে এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবে। উক্ত নীতিমালায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদনের যোগ্যতা
- ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
- মেধা তালিকা প্রকাশ: ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য জাতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বনিম্ন নম্বর নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকবে।

অনুরূপভাবে, আইন শিক্ষা বোর্ড ল কলেজগুলোতে ভর্তির সমন্বিত একটি পদ্ধতি প্রচলনের ব্যবস্থা করবে যাতে ভর্তিচ্ছুদের ন্যূনতম মান বজায় রাখা যায়।

পাঠ্যসূচি আধুনিকায়ন: অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিলেবাস অত্যন্ত ব্যাপক। এ ধরনের সিলেবাস শিক্ষার্থীদের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত জিইডি কোর্সের বাইরেও অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ আইন বিষয়ক কোর্স পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত কোর্সের চাপে শিক্ষার্থীরা আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আইন শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোর্সের চাপ কমাতে হবে।

আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটির উপর আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কোর্ট ভিজিট, মুটিং, ল ক্লিনিকের পাশাপাশি গবেষণার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। কম্যুনিটি লিগ্যাল সার্ভিস, সমসাময়িক আইনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ নিয়মিত আয়োজন করা উচিত।

স্নাতক পর্যায়ে আইন শিক্ষায় আধুনিক কিছু কোর্স পড়ানো উচিত, যেমন: সাইবার আইন, ফরেনসিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, আদালত ও মামলা ব্যবস্থাপনা, লিগ্যাল ও প্রফেশনাল এথিকস এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।

আইন শিক্ষার মাধ্যম: বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগগুলোতে ছাত্রদের পরীক্ষায় ইংরেজিতে উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং আইন শিক্ষার মান কমছে। আইন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে, কিন্তু বাধ্য করা উচিত নয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে আইন শিক্ষা: মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা, আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এবং সর্বোপরি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে প্রোথিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাধ্যমিক শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে আইন একটি পূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের আইন অঙ্গনে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং সেগুলোর কারণে আসামিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের ভোগান্তি একটি নৈমিত্তিক বিষয়। এই বিষয়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বিভিন্ন আইনের অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগের ঘটনাও কম নয়।

বস্তুত: বাংলাদেশের বাস্তবতা এই যে, দেওয়ানী বা ফৌজদারি প্রায় সব ধরনের মামলাতেই কিছু না কিছু মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা দাবি, অতিরঞ্জন এবং অনুদঘাটিত সত্য থাকে।

মিথ্যা মামলার বিষয়ে দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধিসহ বিভিন্ন বিশেষ আইনে দণ্ড আরোপ এবং মামলা দায়েরের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও এসব বিধান প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত এর দায়ভার চাপানো হয় বিচার বিভাগের ওপর।

সুতরাং, বিচার ব্যবস্থার কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিগত দিনের এবং বর্তমানে বিরাজমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন।

২. বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে মিথ্যা মামলার শাস্তি

মিথ্যা মামলা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিচের টেবিলে দেয়া হলো:

ক্রম	আইনের নাম	মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত ধারা	শাস্তি	কে মামলা দায়ের করতে পারে
১.	The Penal Code, 1860	২১১	Imprisonment for two to seven years and fine.	শুধু মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট বা আপীল আদালত
		২০৩	Imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.	
		২০৯	Imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.	
২.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০	১৭	অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড	যে কোনো ব্যক্তি
৩.	এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২	৪০	অনূর্ধ্ব সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
৪.	এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২	৮	অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদণ্ড।	যে কোনো ব্যক্তি

ক্রম	আইনের নাম	মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত ধারা	শাস্তি	কে মামলা দায়ের করতে পারে
৫.	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২	৬	অন্যুন দুই বৎসর এবং অনধিক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
৬.	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪	২৮গ	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
৭.	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০	৩২	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
৮.	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২	১৫	অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড।	কোনো লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বা আদালত নিজে
৯.	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২	১৩	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
১০.	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৪২	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
১১.	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫	২৬	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড, তবে ৩ (তিন) মাসের নিচে নয়, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নিচে নয়, বা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই।
১২.	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭	৪৪	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পযন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
১৩.	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭	৬	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
১৪.	যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮	৬	অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
১৫.	সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩	৩৪	মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে সেই দণ্ড।	যে কোনো ব্যক্তি

ক্রম	আইনের নাম	মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত ধারা	শাস্তি	কে মামলা দায়ের করতে পারে
১৬.	The Code of Criminal Procedure, 1898	250	Compensation to such amount not exceeding one thousand Taka or, if the Magistrate is a Magistrate of the third Class, not exceeding five hundred Taka, as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them. Also suffer imprisonment for a period not exceeding six months or pay a fine not exceeding three thousand Taka.	Magistrate himself

৩. বিদ্যমান আইনগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য

বিদ্যমান আইনগুলো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে মামলা দায়েরের পদ্ধতি এবং আরোপযোগ্য দণ্ডের বিষয়ে বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন রকম বিধান রয়েছে। এসবের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

(ক) দণ্ডবিধির ২০৩ এবং ২১১ ধারায় এর ভিত্তিতে কোন মামলা দায়ের করার এখতিয়ার শুধুমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আপিল আদালতের।

(খ) কয়েকটি বিশেষ আইন (Special Law) যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুসারে মিথ্যা মামলা দায়ের এর বিষয়ে মূল মামলার (মিথ্যা মামলার) যে কোনো আসামি মামলার সূচনা করতে পারবে।

(গ) আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষায়িত আইনে মিথ্যা মামলা দায়েরের বিরুদ্ধে কে মামলা করতে পারবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। কিন্তু মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য শাস্তির বিধান আছে। অর্থাৎ স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কেউ পুলিশের নিকট বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

(ঘ) বেশ কিছু আইনে মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান আছে কিন্তু মামলাটি সম্পূর্ণ বা আংশিক মিথ্যা কি না সে বিষয়ে বিচারিক আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। আবার এসব আইনে এরূপ ব্যাখ্যাও নাই যে কোনো মামলা আদালতে প্রমাণিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অভিযোগকৃত ঘটনা ঘটেনি।

সুপারিশ

বর্ণিত পরিস্থিতিতে মিথ্যা মামলা দায়ের বিষয়ে নতুনভাবে একটি সাধারণ আইন তৈরি করা অথবা বিদ্যমান ১৫-১৬ টি আইন আলাদাভাবে সংশোধন করা জটিল ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে :

(ক) মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ বিষয়ে একটি বাস্তবানুগ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিবিড় ও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারার অনুরূপ একটি বিধান উক্ত কার্যবিধির ২৩ অধ্যায়ে (দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার) সন্নিবেশিত করতে হবে।

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারায় উল্লিখিত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) মিথ্যা মামলা বিষয়ে এই মর্মে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিধান যোগ করতে হবে যে কোন মামলা প্রমাণিত না হওয়া অর্থ এই নয় যে মামলাটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা।

(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশের প্রতি এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে যে, মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকলে (বিশেষতঃ এজাহারে অস্বাভাবিক সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম থাকলে), অপরাধ সংঘটনে কোনো আসামীর সুনির্দিষ্ট কোনো ভূমিকার উল্লেখ এজাহারে না থাকলে সেই আসামীকে গ্রেফতার করা হবে না।

(ছ) আইন মন্ত্রণালয় পাবলিক প্রসিকিউটরদের প্রতি এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে যে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করা যায় এরূপ মামলায় কোনো আসামী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলে পাবলিক প্রসিকিউটর বা ক্ষেত্রমত, কোর্ট ইন্সপেক্টর বা কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর, আদালতে ওই আসামীর জামিনের বিরোধীতা করবে না।

(জ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে এই মর্মে হাইকোর্ট ডিভিশন রুলসের Chapter-IIIB এর অধীনে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন জারি করার অনুরোধ করা যেতে পারে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোনো অভিযোগ আনয়ন করা হলে এবং উক্ত অভিযোগে উল্লিখিত আসামীদের অধিকাংশের অভিযোগকৃত ঘটনার সাথে সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতা না থাকলে পুলিশ বা অন্যকোনো ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথভাবে অভিযোগটির তদন্ত সম্পন্ন না করে বা ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুসন্ধান সম্পন্ন না করে, কোনো অপরাধ সরাসরি আমলে গ্রহণ করা যাবে না।

(ঝ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রতিটি বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সকল আইনজীবীকে এ মর্মে সতর্ক করে পরিপত্র জারি করবে যে, কোন আইনজীবী বিচারিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে (যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট কোন কার্যধারা গ্রহণ করলে বা জামিনের আবেদন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করলে আদালতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়া বা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি) তার বিরুদ্ধে পেশাগত আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে কার্যধারা সূচনা করা হবে।

(ঞ) ইতোমধ্যে যে সব মামলা পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দায়ের হয়েছে এবং তদন্তাধীন আছে সেগুলোর তদন্ত যাতে দ্রুত সম্পন্ন করে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হয় বা চার্জশীটে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার (নট সেন্ট আপ) আবেদন করা হয়, সে জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান। এক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ও সরকারি কৌশুলিদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা দিতে পারে।

(ট) উল্লিখিত (ঞ) দফার কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতি বিভাগে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে যাতে করে কোনো প্রকৃত অপরাধী পুলিশের সাথে যোগ-সাজশের মাধ্যমে মামলা থেকে অব্যাহতি না পায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
বিচারহীনতার সংস্কৃতি

১. ভূমিকা

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত দায়িত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন প্রায় ৪৩ লক্ষ মামলা গ্রহণযোগ্য মান বজায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ভবিষ্যতে একটি নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ প্রণয়ন। এসব মামলার সংখ্যা, ধরন ও নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের কারণ। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, প্রচলিত বিচার কার্যক্রম বহির্ভূত নানাবিধ অপরাধ এবং আইন লংঘনের সংখ্যা বিচারাধীন মামলার চাইতে অনেক গুণ বেশি।

ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায্যতার শাস্তি ও প্রতিকার বিধান যদি হয় ন্যায় বিচারের মূলমন্ত্র, তাহলে বিচার বিভাগ সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই ঐসব ঘটনাকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

২. বিচারহীনতার বর্তমান চিত্র

বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্বাচনে বহুমাত্রিক অনাচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মতো ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত। কিন্তু এর বাইরেও প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা প্রকাশিত অসংখ্য ঘটনা যেগুলো বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় আসে না। মাঝে মধ্যে এসব ঘটনা সীমিত আকারে আলোচনায় আসে, উচ্চারিত হয় বিচারহীনতার কথা। তবে সেখানে প্রায়শঃই অনুপস্থিত থাকে গুরুতর মনোনিবেশ, পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা, সাহসি উচ্চারণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ফলে এসব ঘটনা থেকে গেছে বিচার কার্যক্রমের বাইরে, সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি।

তবে বিচারহীনতা আগে ছিল না, এমন কথা বলা যাবে না। বহু বছর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত "দুই বিঘা জমি" কবিতাটি ভূমিদস্যুতা বিষয়ে বিচারহীনতারই কাব্যিক প্রকাশ। তারপর শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোতে ঘটেছে নানাবিধ বিবর্তন। কিন্তু বাস্তুভিটা হারানোর কারণে দুই বিঘা জমির 'উপেন' এর মত আহাজারি বা বিচার না পাওয়ার আর্তি আমরা শুনতে পাই এখনও অসংখ্য মানুষের কণ্ঠে। তারা কখনোই আদালতের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

ব্যক্তি পর্যায়ের অপরাধ ছাড়াও প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে সামগ্রিকভাবে জন-মানুষের জীবন বিধ্বংসী নানা ধরনের পরিবেশ দূষণকারী অপরাধ। মানুষের স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নকারী ট্রাফিক আইনের লংঘন। এটা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক বহুল পরিচিত অথচ অবহেলিত বাস্তবতা। সেদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারদের নজরও তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই নির্দ্বিধায় বলা চলে এভাবে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজে পেয়েছে এক ধরনের সহনীয়তা।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিচারহীনতার কয়েকটি সর্বজনবিদিত উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) ক্ষমতাসীনদের লালিত, পালিত ও সমর্থিত নানা ধরনের সন্ত্রাসী বাহিনীর অবৈধ কর্মকাণ্ড;
খ) ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় প্রতিদিন সংঘটিত চাঁদাবাজি;
গ) প্রায় সব সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত অফিসে সেবা গ্রহণে ছোট-বড় ঘুষের ঘটনা ও তথাকথিত 'স্পিড মানি' প্রথা;
ঘ) আদালত অঙ্গনে ঘুষসহ নানাবিধ অনিয়ম;
ঙ) বিদেশে নানা ধরনের কর্মী প্রেরণে প্রতারণা;
চ) প্রায় সকল সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত অফিসে জনবল নিয়োগে সীমাহীন দুর্নীতি;

ছ) প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভূমিদস্যুতা বা জোর করে দখল;
জ) সড়ক দুর্ঘটনায় হাজার হাজার আহত-নিহত মানুষের আর্তনাদ;
ঝ) প্রতিনিয়ত ট্রাফিক আইনের লংঘন;
ঞ) আইন থাকা সত্ত্বেও বহুতল ভবন নির্মাণে নিয়োজিত অগণিত শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব;
ট) রাস্তাঘাটে প্রতিদিন নারীদের শ্লীলতাহানি ও আনুষঙ্গিক অপরাধ;
ঠ) পরিবারে সংঘটিত কিন্তু অপ্রকাশিত ছোট-বড় নানা ধরনের নির্যাতন;
ড) পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের লংঘন;
ঢ) আইন থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বাবা-মার অবহেলিত ও করুণ জীবন যাপন;
ণ) চিকিৎসা সেবা ও আইনী/ বিচারিক সেবা প্রাপ্তিতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয় ও সময়ক্ষেপণ;
ত) শিক্ষাদানের নামে প্রতারণার মাধ্যমে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত আইন শিক্ষায়, প্রতি বছর অসংখ্য ডিগ্রিধারী বেকার সৃষ্টি, ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলোর বাইরেও সমাজে ঘটে চলেছে নানা ধরনের বেআইনী ঘটনা, যার প্রায় সবই বিচারযোগ্য। কিন্তু সেগুলো রয়ে যায় বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে, বিচারহীনতার সংস্কৃতির অংশ হিসাবে।

৩. বিচারহীনতার এই সংস্কৃতি থেকে বের হওয়ার উপায়

একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিচারহীনতার সব ধরনের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। দীর্ঘদিনের অবহেলা বা উপেক্ষার কারণে যেসব বিষয় অপরাধ হিসেবে সাধারণত গণ্যই করা হয় না অথচ যার মাধ্যমে একজন মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এসব বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। আগে যে বিষয়টিকে মানুষ অপরাধ বলে মনে করত না, জনসচেতনতা সৃষ্টির কারণে আস্তে আস্তে সেটাকে সে আইনের লংঘন বলে ভাবতে শুরু করবে। যখন কোন কাজ অন্যায়ভাবে করা হচ্ছে বলে মানুষ ভাবতে শুরু করে সাধারণত তখন সে ওই কাজটি দ্বিতীয়বার করতে দ্বিধাবোধ করে এবং পরবর্তীকালে বাধ্য না হলে সেই অন্যায় কাজটি করে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কমিশন মনে করে যে উপেক্ষিত এই অপরাধগুলো সম্পর্কে-

প্রথমত, জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;
দ্বিতীয়ত, আইন ভঙ্গকারীকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আচরণ শোধরানোর জন্য সময় দিতে হবে; এবং
তৃতীয়ত, আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে এসমস্ত অপরাধ দূরীভূত করতে হবে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ না করা, কাউকে ঘুষ না দেওয়া, নারীদের সম্মান করা, পরিবেশ দূষণ রোধ করা, পরিবারে বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা, মাদকদ্রব্য পরিহার করা ইত্যাদি বিষয় নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যেরই অংশ এবং এগুলো ভঙ্গ করা হলে যে আইনের লঙ্ঘন হয়, এ বিষয়টি ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেখাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এসমস্ত বিষয়কেন্দ্রিক গল্প বা উপদেশমূলক প্রবন্ধ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে করে এসব বিষয়ে শিশুদের মনে সচেতনতার সৃষ্টি হবে এবং তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে ও অপরাধপ্রবণতা কমে যাবে।

৪. আইনি কাঠামোয় এসব অপরাধের প্রতিকার

উপরে বর্ণিত উপেক্ষিত অপরাধগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির প্রতিকার প্রদান করে দেশে বিভিন্ন আইন প্রচলিত রয়েছে। যেমন, চাঁদাবাজি প্রতিরোধে রয়েছে দণ্ডবিধির ৩৮৪ ও ৩৮৫ ধারা, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য রয়েছে দণ্ডবিধির **১৭১**বি ধারা, দ্য প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট **১৯৪৭** এবং দণ্ডবিধির **১৬১** ধারা হতে **১৬৫** ধারা, শ্লীলতাহানির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের **১০** ধারায়, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত আইনগুলো ছাড়াও প্রচলিত অন্যান্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বর্ণিত অপরাধগুলোর প্রতিকার বিধান করা সম্ভব।

কমিশন মনে করে যে, আইনের কঠোর প্রয়োগের জন্য বিচারবিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করে নির্যাতিত অসহায় মানুষকে প্রতিকার প্রদান করতে হবে।

৫. 'জাস্টিস অব দ্য পিস' হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫ ধারায় দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাদের নিজ নিজ স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে 'জাস্টিস অফ দ্য পিস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

'জাস্টিস অফ দ্য পিস' হিসেবে তাঁরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ক্ষমতাবান। অন্যদিকে প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ অপরাধ আমলে নেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারার অধীনে অপরাধ আমলে গ্রহণ করতে পারেন। আদালতে দায়েরকৃত অভিযোগ এবং পুলিশ রিপোর্ট ছাড়াও ১৯০ ধারার (১) উপ ধারার (গ) দফার বিধান অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনা সম্পর্কে নিজের জ্ঞান অথবা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে অপরাধ আমলে গ্রহণ করতে পারেন। বাস্তবে (গ) দফার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটগণ কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন না। কিন্তু উল্লিখিত উপেক্ষিত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ দায়েরের জন্য হাজির নাও হয় এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই সমস্ত অপরাধ ঘটতে দেখলে সাথে সাথে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারার অধীনে অপরাধ আমলে নিতে পারেন।

তবে যেহেতু এক্ষেত্রে কোন লিখিত অভিযোগ নেই বা থাকে না, সেহেতু এই সমস্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ করার জন্য একটি আলাদা প্রেসক্রাইবড ফরম থাকা যুক্তিসঙ্গত বলে কমিশন মনে করে। অপরাধ আমলে গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ফরম পূরণ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ে প্রস্তাবিত ফরমের একটি নমুনা সন্নিবেশিত হলো যা ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনক্রমে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
তবে কমিশন মনে করে যে, বিচারের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য এসমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধ আমলে নেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সেগুলোর বিচার না করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯২ ধারার বিধান অনুসারে এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারের জন্য প্রেরণ করবেন।

৬. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধিকরণ

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬০ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতগুলো নির্ধারিত ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করার কথা বর্ণিত রয়েছে। এরূপ বিচারের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে কাউকে দুই বছরের অধিক কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না। উল্লিখিত ধারায় দণ্ডবিধির ৩৭৯, ৩৮০ এবং ৪১১ ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচারের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রতিটি ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি দুই বছরের বেশি। অর্থাৎ কোনো কোনো অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি দুই বছরের অধিক হওয়া সত্ত্বেও ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬০ ধারায় সেগুলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত অপরাধগুলোর বিচার ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য উক্ত অপরাধগুলোকে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬০ ধারার অধীন অন্তর্ভুক্ত করা হলে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার করার ক্ষমতা ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে উপেক্ষিত অপরাধগুলোর বিচার নিশ্চিত করার পথ যেমন সুগম হবে, তেমনি বিচার লাভ করতে বিচারপ্রার্থী মানুষের খরচ ও কষ্ট লাঘব হবে।

প্রস্তাবিত ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

..................................ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

........................(জেলার নাম)

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারার বিধান অনুসারে অপরাধ আমলে গ্রহণ করার ফরম

অপরাধ সংঘটনের স্থান:	
অপরাধ সংঘটনের তারিখ ও সময়:	
সংঘটিত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:	
যে আইন ও আইনের যে ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিবরণ:	
যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়া হলো তাদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও আইনের যে ধারায় অপরাধ আমলে নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন)	
অপরাধ আমলে গ্রহণের তারিখ	
অপরাধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা:	

আমি (নাম)..পদবী (কোন শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করুন) ....,
জেলা/মহানগর... ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আসামীদের বিরুদ্ধে উপরি-উল্লিখিত ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করলাম।

সীল মোহর, স্বাক্ষর ও তারিখ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

১. ভূমিকা

বিচার বিভাগ সংবিধানে স্বীকৃত রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভগুলোর একটি, এবং সংবিধান হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত একটি দলিল। তাছাড়া, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অনেক বিরোধ, যেমন, মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ, আইনের সাংবিধানিকতার প্রশ্ন, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ, ইত্যাদিও বিচার বিভাগের কার্যক্রমের বিষয়বস্তু। সুতরাং, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের ফলাফল থেকে একটি দেশের বিচার বিভাগ কখনোই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আবার, বিচার বিভাগের ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করার ক্ষেত্রে যে মৌলিক শর্তগুলো নিশ্চিত করতে হয়, তার মধ্যে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে বিচারকদের নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। সুতরাং, বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার কোনো বিকল্প নেই। এসব মৌলিক নীতির প্রয়োগিক অর্থ হলো, মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বা বিচার বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাব বা বিবেচনা থেকে মুক্ত থাকা। সংবিধানের ২২, ৩৫, ৯৪ ও ১১৬ক অনুচ্ছেদগুলোতে এই নীতির প্রতিফলন রয়েছে।

২. বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রভাব

যদিও সংবিধানের উপরিউক্ত বিধানগুলোতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ঘোষণা রয়েছে, কিন্তু কার্যত সংবিধানের বিদ্যমান কাঠামোতে বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য যথাযথ বিধান অনুপস্থিত। এর ফলে, বিগত কয়েক দশকে বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিচার বিভাগকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের কারণে বিচারক ও আইনজীবীসহ সমগ্র সমাজকে এই প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) যোগ্যতর ও কর্মে প্রবীণ বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় ওইসব পদে নিয়োগ; একইভাবে, অধস্তন আদালতের বিচারকদের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগ;

(খ) রাজনীতি ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মামলার রায়ে ক্ষমতাসীন দলের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের প্রয়াস, যার মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হলো সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়;

(গ) কোন কোন রায়ে অপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিকটুভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য, মতামত ও বিতর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা;

(ঘ) আইনজীবীদের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে মামলা পরিচালনায় তাদের সুবিধা প্রদানের প্রবণতা এবং মামলার ফলাফলে তার প্রতিফলন;

(ঙ) আইনজীবী সমিতিগুলোর নির্বাচনে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, যার নির্দশন হলো নির্বাচনের প্যানেল রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে অনুমোদনের প্রচলন;

(চ) আদালত প্রাঙ্গনে বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক স্লোগানসহ মিছিল, সভা, বিক্ষোভ কর্মসূচি, ঘেরাও, বয়কট, বিচারকদের হুমকি প্রদান, ইত্যাদি।

৩. আদালত চত্বরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রায়

আদালত প্রাঙ্গনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া একটি স্বতপ্রণোদিত রায়ে[৮২] আদালতের প্রবেশদ্বার বা চত্বরের মধ্যে যে কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক জমায়েত, মিছিল, অবস্থান, বয়কট বা ঘেরাও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে, বাস্তবে দেখা গেছে, সরকারি বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনুসারী কেউই আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করেনি। বরং, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আদালত চত্বরে রাজনৈতিক সমাবেশ, মিছিল এবং বিক্ষোভের মাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগও পেয়েছেন।

সুপারিশ

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিচারাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(ক) রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচারক নিয়োগের প্রচলন পরিহার করার উদ্দেশ্যে একটি স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থার প্রচলন করা অপরিহার্য[৮৩];

(খ) বিচার বিভাগ, এবং বৃহত্তর অর্থে বিচারাঙ্গনকে, রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রয়োজন; বিশেষ করে, রাজনৈতিক দলগুলোকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা:

> (অ) আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখবে না বা উক্ত নির্বাচনগুলোতে অন্য কোনভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ করবে না; এবং
>
> (আ) রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে আইনজীবীদের কোন সংগঠনকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না;

(গ) হাইকোর্ট বিভাগের ২০০৫ সালের রায় অনুযায়ী আদালতের প্রবেশদ্বার বা চত্বরের মধ্যে যে কোনো জমায়েত, মিছিল, বিক্ষোভ, বয়কট বা ঘেরাও কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ জারি করবে এবং তার পরিপালন তদারকি করবে;

(ঘ) বিচারকদের অবশ্যই সবধরনের রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত থাকতে হবে; রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে কঠোরভাবে এই ব্যাপারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলন করা প্রয়োজন;

(ঙ) আদালতের স্বাভাবিক বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত করে এমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আইনজীবীদের বিরত থাকা আবশ্যক; আদালত প্রাঙ্গণে এই ধরনের কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ডকে পেশাগত অসদাচরণের অন্তর্ভুক্ত করে বার কাউন্সিলের মাধ্যমে এই ব্যাপারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং তার জন্য Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order 1972 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা আবশ্যক; এবং

(চ) আদালত প্রাঙ্গনে (অর্থাৎ, আদালত ভবন ও সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে) মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান, ঘেরাও কর্মসূচি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

[৮২] ২০০৭ (১৫)বিএলটি (এইচসিডি) ৬৬।

[৮৩] তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

ত্রিংশ অধ্যায়
সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন

১.১ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ: সামাজিক প্রেক্ষিত

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বলতে আমরা নীতি সম্পর্কিত বোধ বা অনুভূতিকে বুঝি। মানুষ তার পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি খুব সচেতনভাবে মেনে চলে। এই নিয়মনীতি ও আচরণবিধি মানুষের জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, মানসিকতা ও নীতির চর্চা করাকেই নৈতিকতা হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে মানুষের আচরণকে পরিচালনা করে যেসব নীতি বা মানদণ্ড তাই মূল্যবোধ। সহজভাবে বলা যায় ভালো, মন্দ, ঠিক, বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের মানুষের যে ধ্যান- ধারণা তার নামই মূল্যবোধ। মূল্যবোধ কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালো-মন্দ বিচার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর অনেকগুলো সামাজিক দিক আছে। মূল্যবোধের সামাজিক দিকগুলো একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এ কারণে বলা যায় মূল্যবোধ হল মানুষ তার নিজের এবং সমাজের জন্য এক বিশেষ 'কোড অব কনডাক্ট', যার দ্বারা একজন মানুষ অথবা সমাজ উত্তরণের দিকে অগ্রসর হতে পারে। যেহেতু মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় সেহেতু মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সমাজের উপর অনেক বিরূপ প্রভাব পড়ে, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

১.২ ক্রমবর্ধমান মামলার চাপ: সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের অনিবার্য ফল

এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত দুটি ছকে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান প্রণিধানযোগ্য:

ছক - ক: মামলা ও বিচারকের পরিসংখ্যান: সুপ্রীম কোর্ট

সাল	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা (আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ)	বিচারকের সংখ্যা (আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ)
১৯৭৫	৩৩,৬৫৭	১৭ জন
১৯৮৫	২৭,১১২	২৮ জন
১৯৯৫	৭৮,৫০১	৩৯ জন
২০০৮	৩,০০,৭৯৩	৭৪ জন
২০২৩	৫,৭০,৩৬৪	১০০ জন

ছক - খ: মামলা ও বিচারকের পরিসংখ্যান: জেলা পর্যায়ের আদালত

সাল	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	বিচারকের সংখ্যা
২০০৮	১৪,৮৯,১২১	৭৫২ জন
২০১১	১৮,৪৫,৮৮৬	১,৫০০ জন
২০২৩	৩৭,২৯,২৩৫	২,০০৩ জন

ছক - ক এ উল্লিখিত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩৩,৬৫৭টি। ২০ বছর পর ১৯৯৫ সালে উভয় বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮,৫০১টি। ২০০৮ সালে মামলার সংখ্যা ছিল ৩,০০,৭৯৩টি এবং সর্বশেষ ২০২৩ সালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৫,৭০,৩৬৪ অর্থাৎ ২০ বছরে সুপ্রীম কোর্টে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়েছে ১,৫৯৫% (প্রায় ১৬গুণ)। অন্যদিকে ১৯৭৫ সালে সুপ্রীম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা ছিল ১৭ জন, যেটি ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১০০ জনে। সে হিসেবে ৪৮ বছরের ব্যবধানে সুপ্রীম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮৮% (প্রায় ৫ গুণ)।

ছক - খ এ উল্লিখিত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৮ সালে বাংলাদেশের অধস্তন সকল আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১৪,৮৯,১২১টি। ১৫ বছর পর ২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩৭,২৯,২৩৫টি। অর্থাৎ ১৫ বছরে অধস্তন আদালতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০% (দেড়গুণ)। অন্যদিকে ২০০৮ সালে অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা ছিল ৭৫২ জন, ২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি দাড়িয়েছে ২,০০৩ জন। সে হিসেবে ১৫ বছর পর অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬৫% (দেড়গুণের কিছু বেশি)।

উপরের ছক দুটিতে উল্লিখিত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালত উভয় ক্ষেত্রেই বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পাশাপাশি বিচারকের সংখ্যাও অনেকাংশে বেড়েছে। বিচারকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে মামলা নিষ্পত্তিতে এর প্রভাব সেভাবে পড়েনি। বরং বিচারাধীন মামলার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে পরিস্কার যে, চর্তুদিক থেকে স্রোতের মতো আদালতের দিকে মামলা আসতে থাকলে কেবল বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলাজট নিরসন করা সম্ভব নয়। কাজেই এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিরোধ বা মামলা সৃষ্টির উৎস বা ক্ষেত্রগুলো নির্মুল করার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।

মূলত নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাব বর্তমান সমাজের ভিতরে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, পেশাজীবী এবং রাজনীতিবিদ সহ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মাঝে এই অবক্ষয় স্পষ্ট। ফলে নতুন প্রজন্মের সামনে এক ভয়ানক সংকট দেখা দিয়েছে, যা সমাজে উদ্বেগ তৈরি করেছে। World Value Survey[৮৪] মূল্যবোধের ওপর বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এটি একটি বিশ্বব্যাপী গবেষণা প্রকল্প, যা মানুষের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস কিভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব কি তা নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশ করে। তাদের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, মূল্যবোধ কখনও এক জায়গায় স্থির থাকে না। সমাজ পরিবর্তন, বিবর্তনের সঙ্গে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। তাদের প্রতিবেদন অনুসারে, যখনই কোনো দেশের ঔদ্যোগিক বিকাশ এবং তার উত্তর ঔদ্যোগিক জ্ঞান সমাজের দিকে যতই এগোচ্ছে ততই ওই দেশের পরম্পরাগত মূল্যবোধ যেমন-পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে বন্ধন, পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক, ধর্মীয় গুরুত্ব ইত্যাদির প্রতি টান কমছে। পরম্পরাগত পারিবারিক সম্পর্ক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর ফলে মানুষের মধ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। এ কারণে মানুষ অন্যের সাথে নানাভাবে বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। যার পরিণতি হিসেবে সমাজে অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হচ্ছে।

১.৩ মামলার সংখ্যা বৃদ্ধিতে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব

প্রথমত, নৈতিক অবক্ষয় ও উন্নত মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে মানুষের মধ্যে আইনগত দায়িত্ব পালন না করা বা অবহেলা করা বা আইন লংঘনসহ অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মানুষ ক্রমশ অপরাধমুখী হয়ে পড়েছে। একজন নীতি-নৈতিকতাবিহীন মানুষ কারণে অকারণে অন্যের সাথে সংঘাতের সৃষ্টি করে, অন্যের স্বার্থে আঘাত হানে এবং অন্যের অধিকার হরণ করার কাজে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। এর ফলে সমাজে অপরাধের মাত্রা বেড়ে যায় এবং যার অনিবার্য ফল হিসেবে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ব্যাপক হারে মানুষের মাঝে সহনশীলতা লোপ পাচ্ছে। মানুষ অন্যের বিষয়ে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। অধৈর্য ও অসহিষ্ণুতার কারণে অতি তুচ্ছ বিষয়েও মানুষ অন্যের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। আর এসব বিবাদ মামলায় রূপ নেয়।

[৮৪] https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

তৃতীয়ত, সমাজে নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের চর্চা ক্রমে লোপ পাওয়ায় মানুষের মধ্যে নানা রকম নেতিবাচক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচকতা এমনভাবে বিকশিত হচ্ছে যে, সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে হতাশা, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ, লোভ, চাপ ইত্যাদি তাদের জীবনাচারে পরিণত হয়েছে। মানুষের ভিতর যখন হতাশা ও নেতিবাচকতা বেড়ে যায় তখন মানুষ অতি তুচ্ছ বিষয়েও সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং এতে অপরাধ সংঘটন করে। শেষ পর্যন্ত মামলায় রূপ নেয়।

চতুর্থত, সমাজে নীতি নৈতিকতা বিমুখতা ও নেতিবাচকতা বৃদ্ধির কারণে সমাজের মানুষের একটি অংশের মধ্যে অপরাধমূলক মনোবৃত্তি বেড়ে গেছে। এরূপ মনোবৃত্তির ফলে মানুষ অপরাধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারো কারে মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে যে, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও চাতুর্য দিয়ে তারা আইন আদালতের উর্দ্ধে উঠতে পারবে। ফলে তারা আপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে অনেক মামলার জন্ম হয়।

পঞ্চমত, সমাজে নীতি-নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অস্থিরতা বেড়ে গেছে। অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ বেড়ে গেছে। পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছে। মানুষ অপরাধমুখী হয়ে পড়েছে। এর ফলশ্রুতিতে চুরি, ছিনতাই, খুন রাহাজানি, ডাকাতি প্রভৃতি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিশোর ও যুবকদের মধ্যে মাদক, জুয়া, ক্যাসিনো, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, হিরোইন, পর্নোগ্রাফী, ইভটিজিং, কিশোর গ্যাং ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আর এসব নেতিবাচক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে যা শেষ পর্যন্ত মামলার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করছে।

১.৪ নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের সাথে আইন ব্যবস্থার সম্পর্ক

আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। আইন ও নৈতিকতা উভয়েরই লক্ষ্য হলো মানুষকে সুন্দর ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। আইন ও নৈতিকতা পরস্পর বিপরীতভাবে ক্রিয়াশীলও হতে পারে। অর্থাৎ এ দুটির মধ্যে একটি বাড়লে অপরটি কমতে থাকবে। মানুষের ভিতর নৈতিকতা বৃদ্ধি পেলে বেআইনী ক্রিয়াকলাপ কমতে থাকবে এটিই স্বাভাবিক। আরো বড় পরিসরে এটির ব্যাখ্যা হলো নৈতিক দিকে থেকে কারো অবস্থান দুর্বল বা ভঙ্গুর হলে তিনি সবসময় আইনকে অজুহাত হিসেবে দেখতে চাইবেন এবং আইনের ফাঁক-ফোকর খুঁজবেন। উল্লেখ্য যে, আইনী প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু একজন প্রকৃত নীতিবান মানুষের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ বড় কথা নয়। বরং সত্যতা ও ন্যায্যতাই প্রধান যুক্তি। তাই একজন নীতিবান ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আইন মেনে চলেন। এভাবে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা মানুষকে আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে, সহযোগিতা করে।

১.৫ মামলার উচ্চ হার কমানোর ক্ষেত্রে মানসিক গঠনের প্রভাব

মানুষের জীবনে দুশ্চিন্তা, হতাশা, বিষাদ ইত্যাদি এখন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে নেতিবাচক চিন্তাভাবনাকে চিহ্নিত করেন। নেতিবাচক চিন্তাধারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, চিন্তা করার প্রক্রিয়া, কর্মজীবন, এমনকি সৃজনশীলতাকেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মূলত সে কারণেই হতাশা, বিষাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বাসা বাঁধতে শুরু করে আমাদের জীবনে। মানুষ যে কাজ করে তা আসে মূলত তার অনুভূতি থেকে। আর অনুভূতি উৎসারিত হয় মানুষের চিন্তা থেকে। সেজন্য মানুষের কাজ বা অন্যের প্রতি আচরণ মূলত তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। কেউ ভালো চিন্তা করলে তিনি ভালো বোধ করেন, তার মনে আনন্দদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি সবার সাথে ভালো আচরণ করেন। তার জীবনাচার শুদ্ধ হয়, সুন্দর হয়। তার কাজগুলো হয় ইতিবাচক ও গঠনমূলক। অন্যদিকে যেসব মানুষ দুর্নীতি করে, অপরাধ করে, মানুষকে ঠকায় কিংবা অন্য কোনো নেতিবাচক কাজ করে সেগুলো তার নেতিবাচক চিন্তা থেকে উৎসারিত হয়। এজন্য বলা হয় মানুষের আচরণ এবং কাজ তার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

১.৬ বিচার বিভাগ সংস্কারকে ফলপ্রসু করতে দৈনন্দিন কাজকর্মে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের চর্চা

বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সেক্টরে যত সংস্কারই করা হোক না কেন, সমাজে নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা না গেলে প্রত্যাশিত মাত্রায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মানুষের ভিতরে নীতি-নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের চর্চা তৈরি করা না গেলে কোনো সংস্কারই কার্যকর ও টেকসই হবে না। লক্ষণীয় যে, দেশের সংবিধান নাগরিকের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করলেও বিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলো বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণভুক্ত নয় বা সেটা সম্ভব বা কাম্যও নয়। কাজেই মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টির মূল উৎস বা ক্ষেত্রগুলো নির্মুল করতে হলে রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ ও সেক্টরগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বত্র নীতি-নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন একটি বাস্তব-সম্মত কর্মপরিকল্পনা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিজ নিজ কার্যপরিধি অনুসারে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করবে।

১.৭ নৈতিকতা ও উন্নত আচরণ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের উত্তম দৃষ্টান্ত

জাপান, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশ নৈতিকতা ও উন্নত আচরণ চর্চার জন্য তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মূল কেন্দ্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। শিশুদের নীতি-নৈতিকতা শিক্ষাদানের জন্য তারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে। এক্ষেত্রে জাপান ও ফিনল্যান্ড অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে নৈতিক শিক্ষা। জাপানে ১০ বছর বয়স (চতুর্থ গ্রেড) পর্যন্ত কোনো ধরনের পুঁথিগত বিষয়ে পরীক্ষা না নিয়ে শিশুদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের দিকেই বিশেষভাবে নজরদারি করা হয়। স্কুলজীবনের প্রথম তিন বছর মেধা যাচাইয়ের জন্য নয়; বরং ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম ও ন্যায়পরায়ণতা শেখানো হয়। তাই জাপানিরা নম্রতা, ভদ্রতা, নৈতিকতা ও সদাচারের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। জাপানে শিশুদের স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি আদব-কায়দা, ভদ্রতা, সৌজন্য ইত্যাদি শেখানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়ে থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, সকলের সাথে সদাচরণ করা, মানুষকে সাহায্য করা, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা ইত্যাদি শিক্ষা জাপানি শিশুদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। স্কুলে ভর্তির পর থেকে প্রথম চার বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে তাদের দোষ-গুণের মানদণ্ডে বিচার করা হয় না। কে মেধাবী, ভাল বা মন্দ সেটা বিচার না করে কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কয়েক দশক ধরেই ফিনল্যান্ড বিশ্বের প্রথম সারির সুখী দেশ, যার মূলে রয়েছে সুশিক্ষা। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষকের দক্ষতা এবং সামগ্রিকভাবে জাতির কল্যাণ সাধন। ফিনিশরা শিক্ষাকে কেবল জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বা দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা না করে, বরং মানুষের আত্মিক ও সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তাদের শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে সামগ্রিক জাতিগত উন্নতি প্রাধান্য পায়। কোভিডের সময়ে যখন বিশ্বব্যাপী সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ে, সেই সময়ে ফিনল্যান্ড তাদের শিক্ষানীতির একটি মূল্যায়ন করে, যা থেকে উঠে আসে ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিক, যথা: (১) শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বাদ দেওয়া, (২) শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের যাপিত জীবনের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করা এবং (৩) সর্বোপরি শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা। এই মূল্যায়ন তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সফলতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১.৮ পরিবার ও শিক্ষা কার্যক্রমে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চা

১.৮.১ পরিবারে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণ

পরিবার হলো একটি শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। নৈতিকতার চর্চা ও উন্নত মূল্যবোধ শিক্ষাদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হলো পরিবার। মূলত মায়ের কোলেই শিশুর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। সন্তানের নৈতিক মূল্যবোধ, চেতনা ও বিশ্বাস জন্ম নেয় পরিবার থেকেই। শৈশবে পারিবারিক শিক্ষাই নির্ধারণ করে ভবিষ্যতে সমাজের অন্যান্যদের সাথে তার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, লেনদেন, সম্পর্কের ধরন কেমন হবে। কিন্তু যখন একটি শিশু দেখে তার পিতা-মাতা অনিয়ম বা অনৈতিক কিছু করছেন কিংবা নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন, তখন অবুঝ শিশুর মনে এটি দাগ কাটে। শিশু তখন তার পিতা-মাতার অন্যায়, অনৈতিক বিষয়কে সাবলীলভাবে গ্রহণ করে নেয়। এভাবে পিতা-মাতার জীবনাচার, আদর্শ ইত্যাদি তার জীবনের অংশ হয়ে উঠে। কারণ শিশুরা প্রতিনিয়ত তাদের

আশেপাশের মানুষদের কাছ থেকে শিখে, এবং পিতা-মাতার যাপিত জীবনই তার মূল আদর্শ হয়ে ওঠে। শিশুরা যাতে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অনৈতিক পথে ধাবিত না হয় তার জন্য পরিবারকে একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

১.৮.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণের শিক্ষাদান

একজন মানবসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিখতে শুরু করে। শিশুর নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের বীজ প্রোথিত হয় পরিবারে; তা বিকশিত হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর তার চর্চা হয় সমাজে। এ কারণে পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিশুকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় অভ্যস্ত করতে হবে। এ বিষয়ে তিব্বতীয় নেতা দালাইলামা বলেন, "When educating the minds of our youths, we must not forget to educate their hearts." তাই নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পরিবার, সমাজ, শিক্ষালয়সহ সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধ শিক্ষার প্রথম ও অন্যতম প্রধান উৎস শিশুর বাবা-মা, অভিভাবক ও শিক্ষক। শিক্ষাজীবন মূলত নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধ অনুশীলন ও চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমাদের দেশে শিক্ষার স্তরবিন্যাস হলো প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকালই শিশুদের মানবিক চরিত্র গঠনে সর্বোচ্চ সহায়ক। কেননা, শিশুদের মধ্যে নৈতিকতার যথাযথ বিকাশ হলে তা পরিণত বয়সে যথেষ্ট কার্যকর হবে। শিক্ষকদেরও তাদের নৈতিক মান উন্নত করতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমেই নয়, তাদের আচরণ, বক্তব্য এবং নৈতিক মান উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। একটি সৎ ও নৈতিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ হতে পারেন এবং তাদের জীবনে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

১.৮.৩ ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নৈতিক ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণ শিক্ষাদান

ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য এবং অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণের জন্য। ধর্মীয় অনুশাসন ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনে পরিশুদ্ধতা এনে দেয়। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসনগুলো মানুষের আত্মিক ও মনোজাগতিক উৎকর্ষ সাধন করে। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার বাইরে গিয়ে এক পবিত্র চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এটি মানুষকে সৎ, সুন্দর, শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধ প্রত্যেকটি ধর্মের মূল শিক্ষা। নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধই মানুষকে অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করে। যার নীতি-নৈতিকতা নেই, মানবিক মূল্যবোধ নেই; সে ধার্মিক হতে পারে না। কারণ ধর্মের শিক্ষাই হলো সত্যতা, সততা, পবিত্রতা। ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও শিষ্টাচার মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, সদাচরণ, দেশপ্রেম, বড়দের সম্মান করা, আর্তের সেবা করা, সহনশীলতা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্ম অনন্য ভূমিকা পালন করে। এসব ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যক্তির মানসিকতার উন্মোষ ঘটিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করে। এভাবে সমাজে সুশাসনের পথ প্রশস্ত হয় এবং নানা রকম সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান ঘটে। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মক্তব ও মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মান আরো বৃদ্ধি করার প্রতি নজর দিতে হবে।

১.৮.৪ শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধ ভিত্তিক আচরণ সংক্রান্ত পাঠ অন্তর্ভুক্তি

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগসহ সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া নৈতিকতার চর্চার কোনো সাফল্য আসবে না। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নৈতিকতা শিক্ষার যোগসূত্র একজন শিক্ষার্থীর চিন্তার গভীরতাকে আরো সুদৃঢ় করে তোলে। সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়কে একীভূত করে সে বিষয়গুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ, সহজীকরণ, গ্রহণযোগ্যতা যাচাই সম্পর্কে যে ধারণা লাভ সম্ভব, তা কেবল পাঠ্যক্রম ও নৈতিকতা শিক্ষার মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সম্ভব। এভাবে নৈতিকতাসম্পন্ন একজন মানুষ আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

১.৯ সুপারিশ

১. দেশর সকল প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের লালন, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও চর্চাকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং দৈনন্দিন কাজ কর্মে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিধ্যালয়গুলোর আইন বিভাগসহ উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৩. শুধু দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি নয়, সুস্থবোধ সম্পন্ন এবং উচ্চ নৈতিকতা সমৃদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে আইন-আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণামূলক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উক্ত পাঠ্যসূচিতে দেশের আইন-আদালত, বিচার ব্যবস্থা, আইন মান্যকরণে উদ্বুদ্ধকরণ, আইন মেনে চলার সুফল, আইন মেনে না চলার কুফল, আইন লংঘনের শাস্তি ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত থাকবে।

৫. শিশু কিশোরদের মধ্যে নৈতিক ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ ভিত্তিক বাস্তব আচরণ কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রত্যেক শিশু যাতে নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিজ নিজ ধর্মের চর্চার প্রতি আগ্রহী হয় তার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৬. আইনজীবী, বিচারক এবং সরকারি কর্মচারিদের মানসিকতায় নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং তাদের আচরণে ও কার্যকলাপে সেগুলোর চর্চা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭. নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণের বিস্তৃতির মাধ্যমে সমাজে এমন একটি সংস্কৃতি নির্মাণ করতে হবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইন অনুসরণের সহায়ক এবং আইন লংঘন বা অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধক হবে। ফলে মামলা-মোকদ্দমা হবে ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।

একত্রিংশ অধ্যায়

জনমত জরিপের ফলাফল

সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন ওয়েবসাইটে (www.jrc.gov.bd) প্রকাশিত পাঁচটি পৃথক প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংস্কার বিষয়ে সাধারণ নাগরিক, বিচারক, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, অন্যান্য আইনজীবী ও আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের মতামত সংগ্রহ করে। উক্ত মতামতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত ফলাফল এখানে উপস্থাপন করা হলো। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতার শতকরা হার এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

(ক) বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন

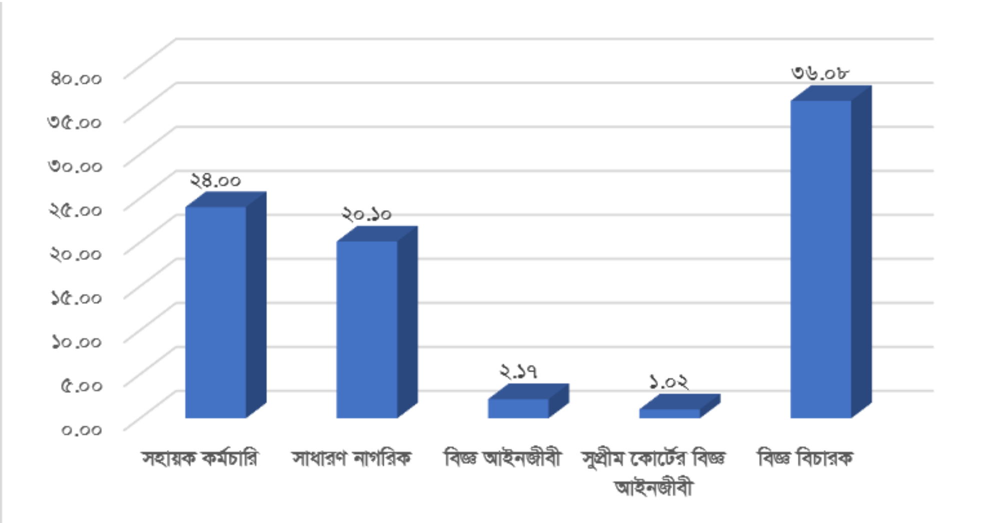

(খ) বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন

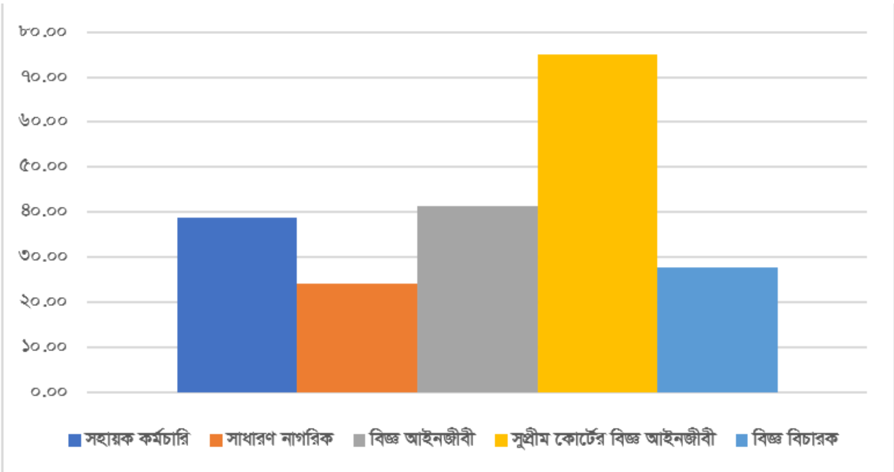

(গ) বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

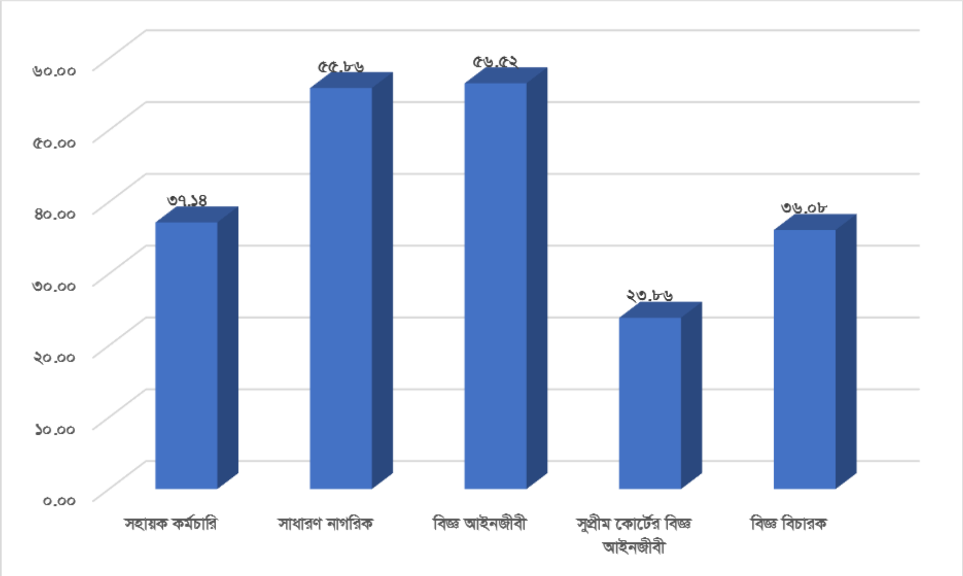

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)
(ক) বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে

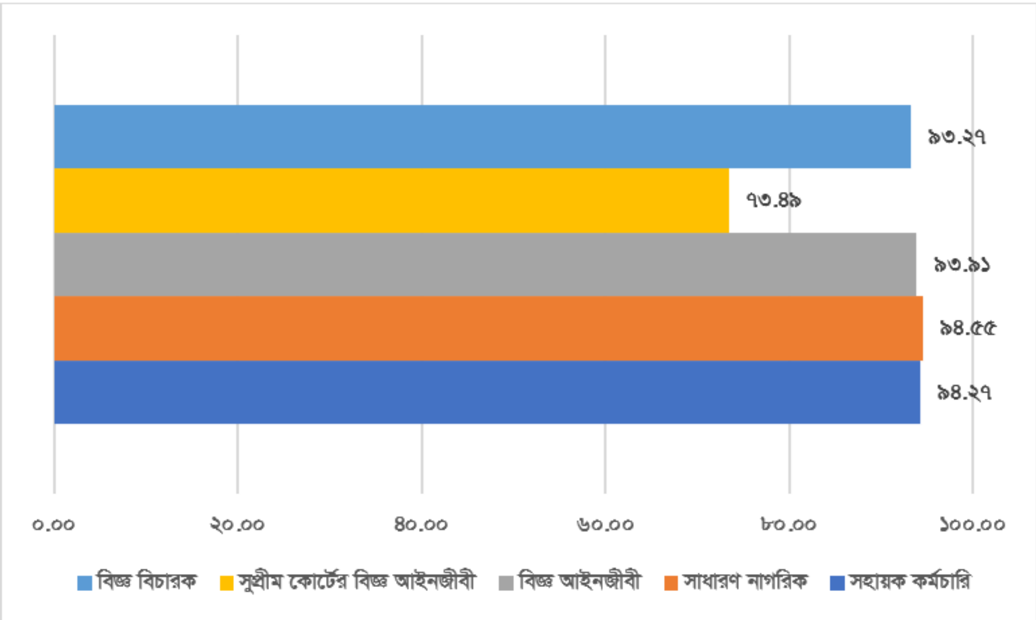

(খ) বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে

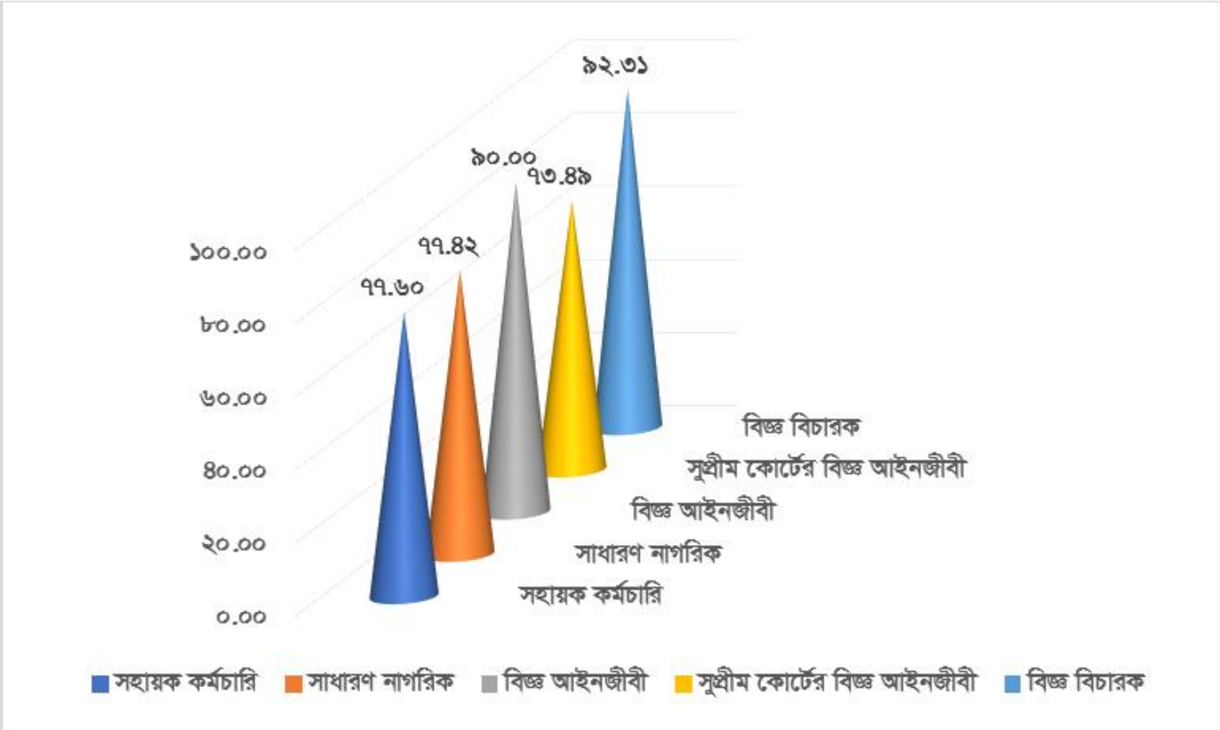

(গ) বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে

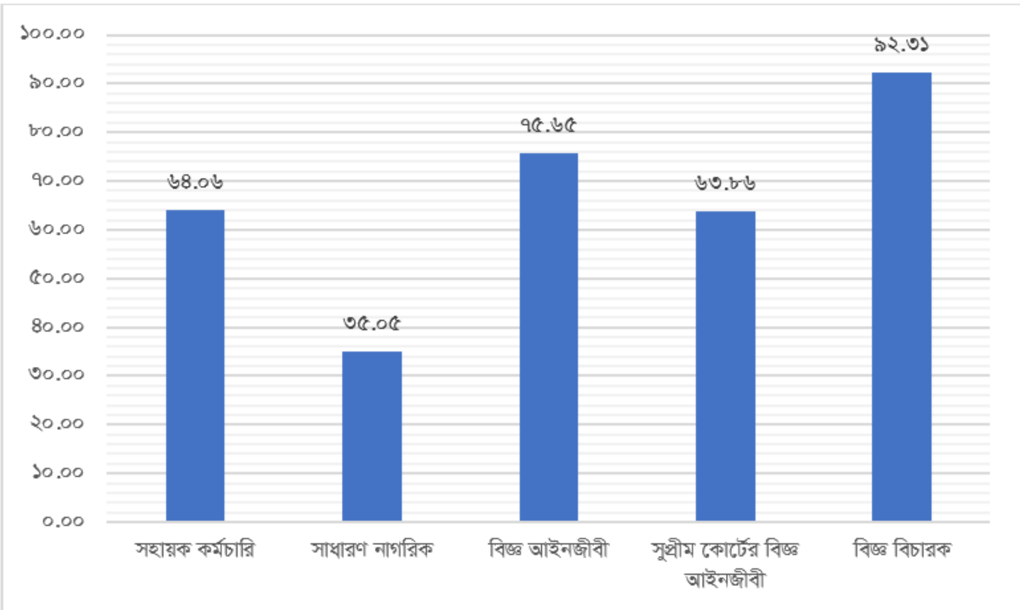

(ঘ) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে

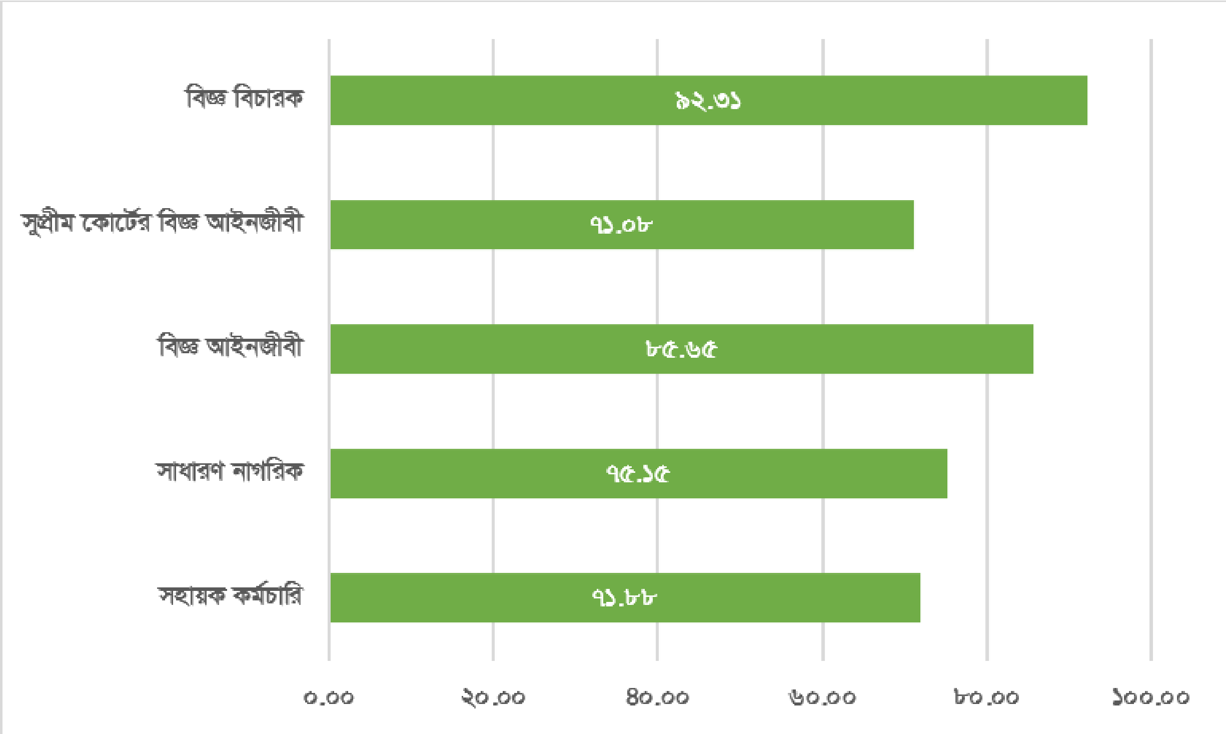

(ঙ) সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে

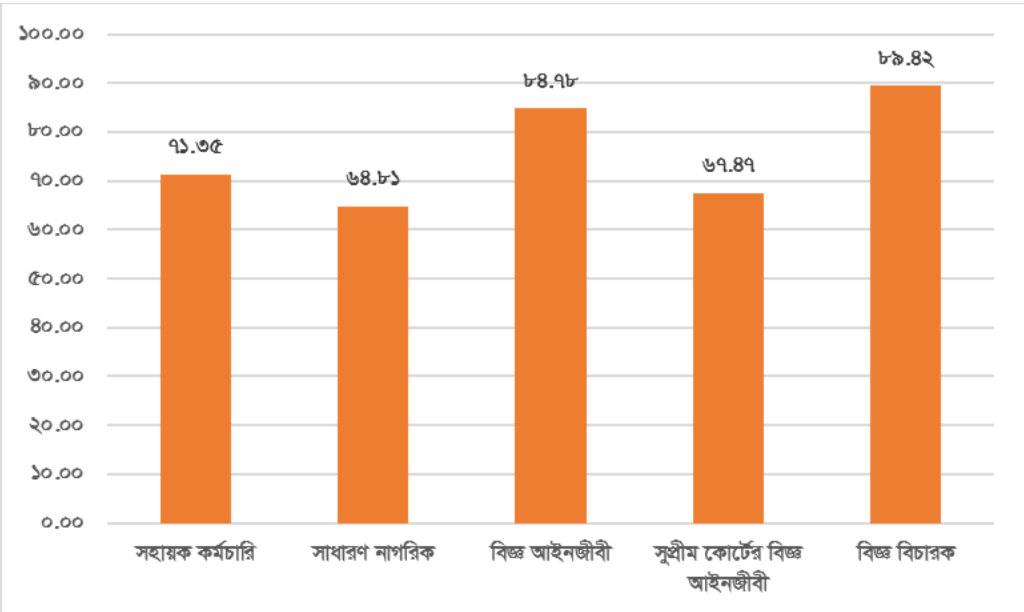

(চ) বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে

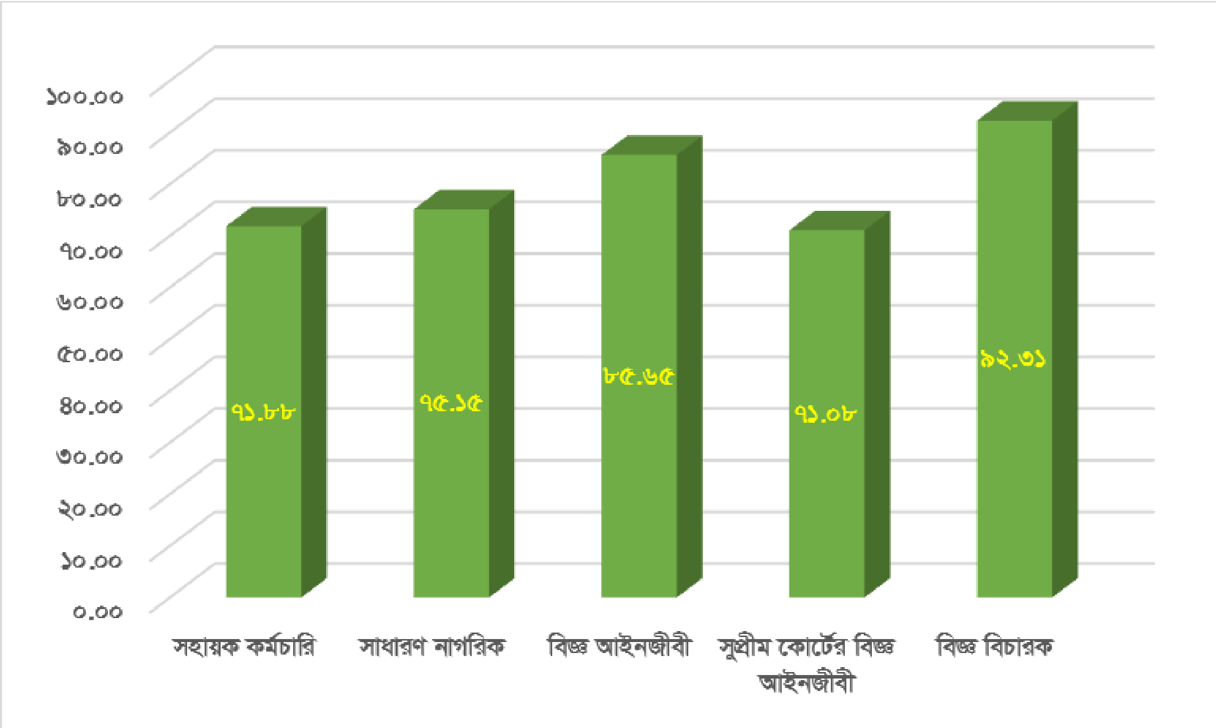

(ছ) স্থায়ী ও স্বতন্ত্র অ্যাটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

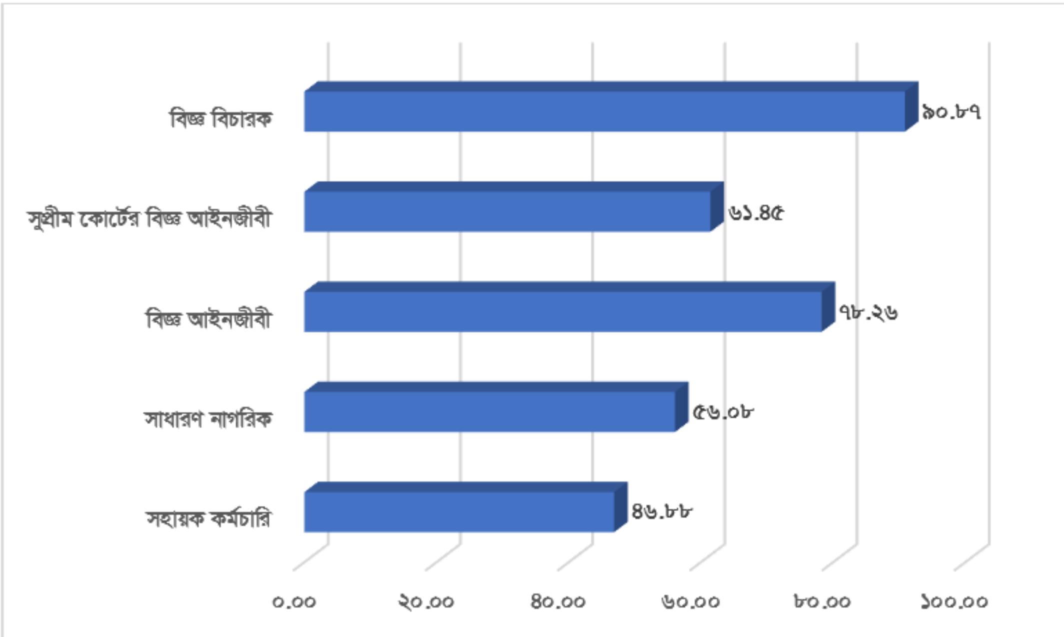

৩. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় আপনি কোন ভাষায় চান?

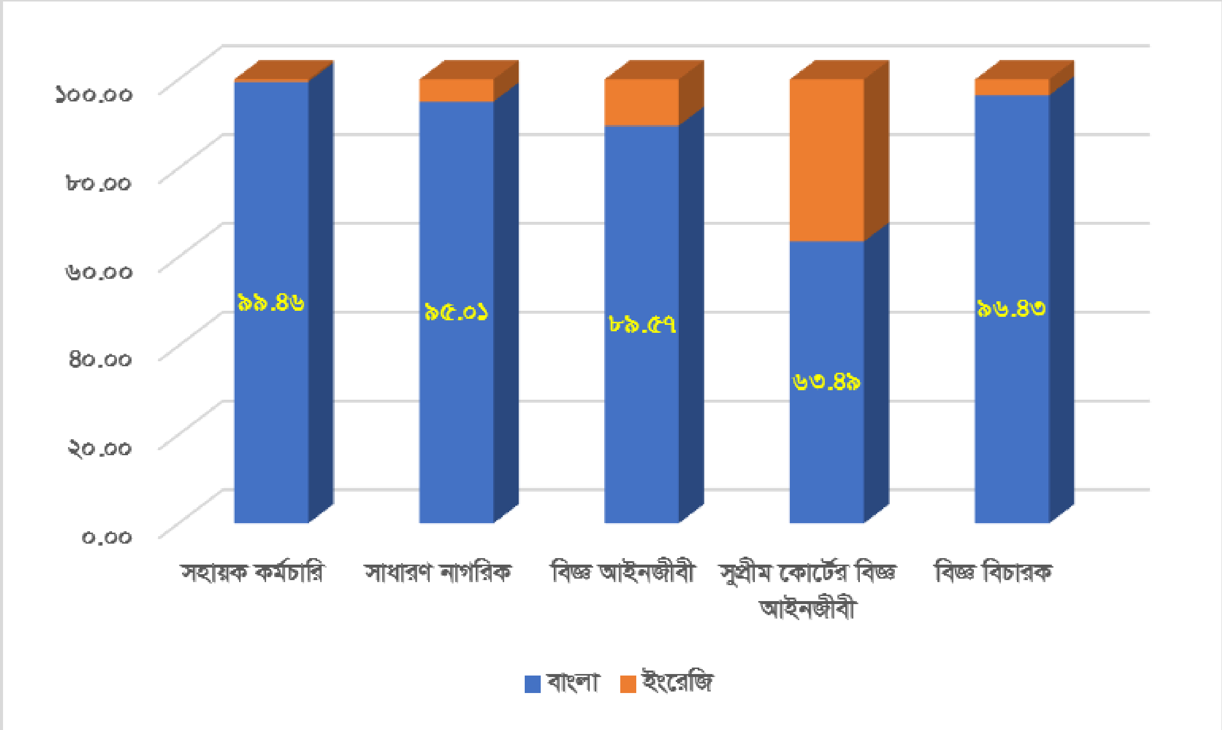

৪. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?
(ক) প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত

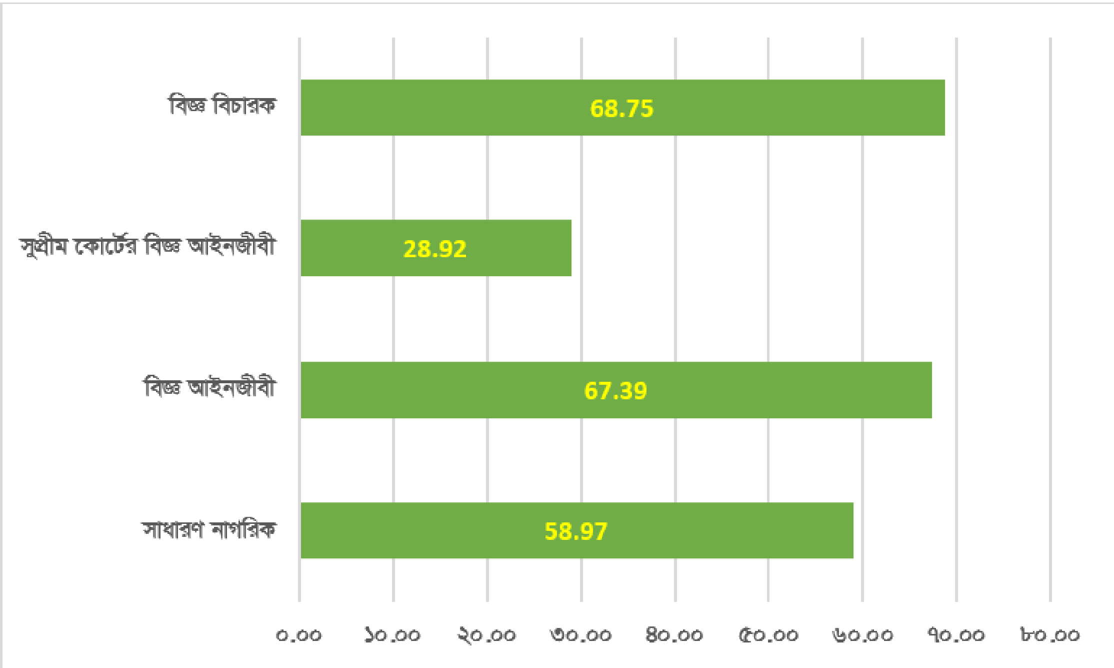

(খ) মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত

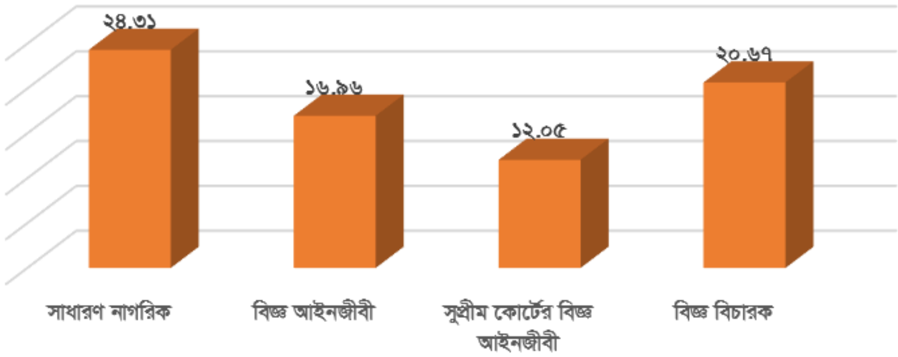

(গ) হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

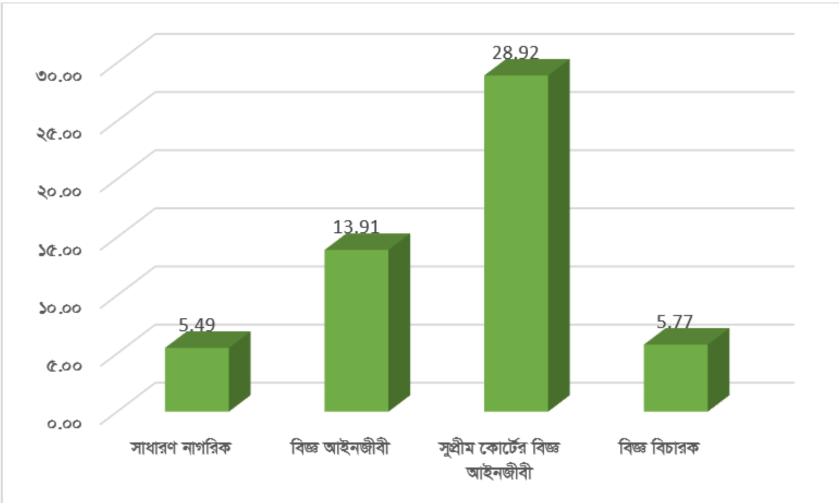

৫. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

(ক) বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক

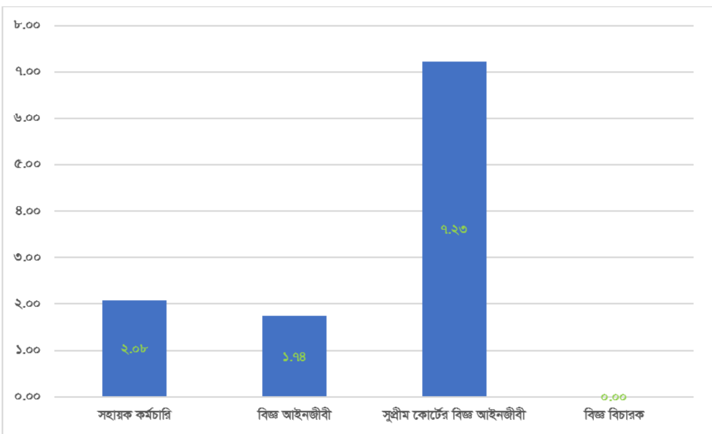

(খ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত

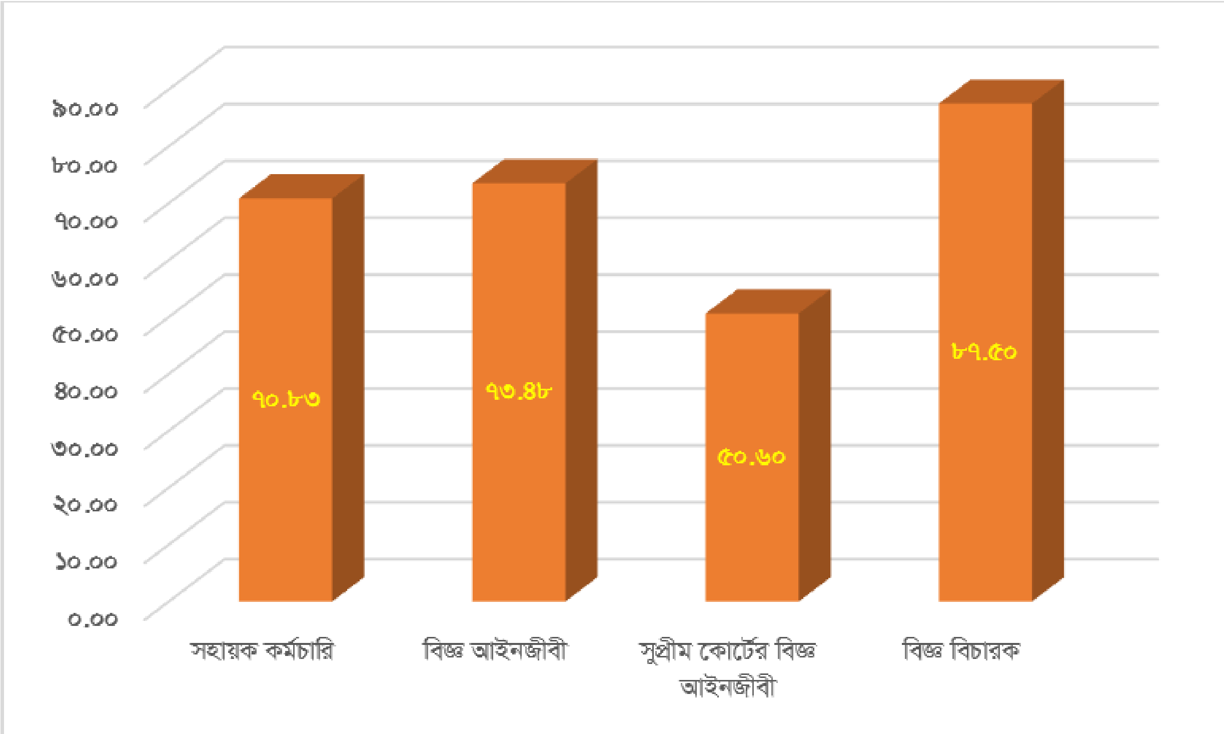

৬. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণ কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)
(ক) আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল

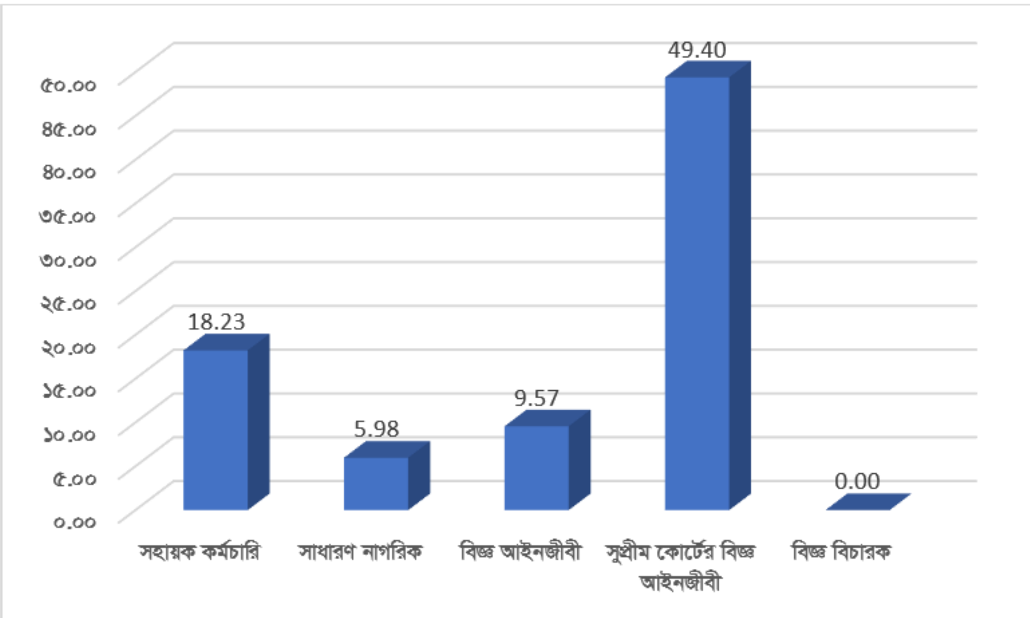

(খ) আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ

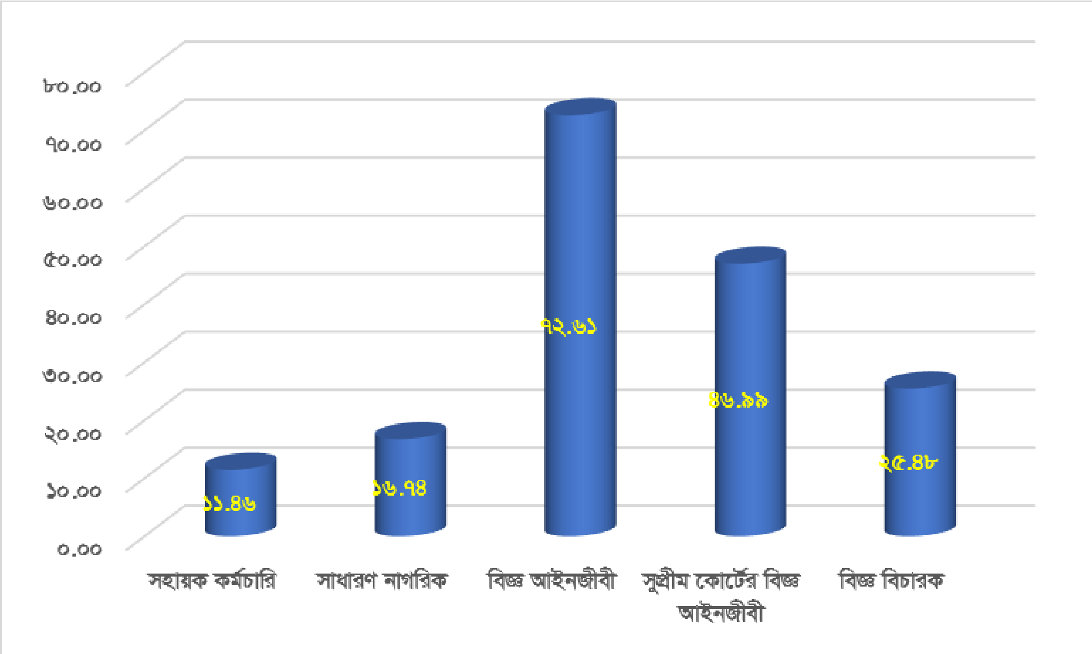

(গ) বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই

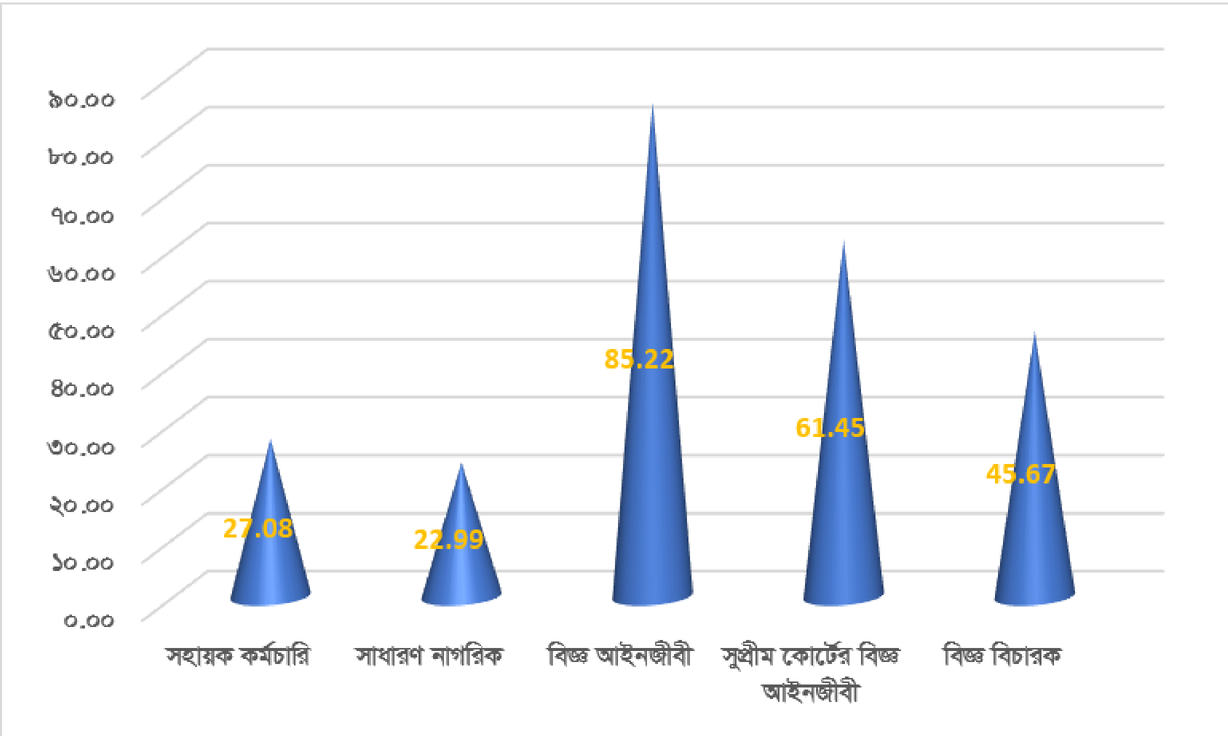

(ঘ) আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে

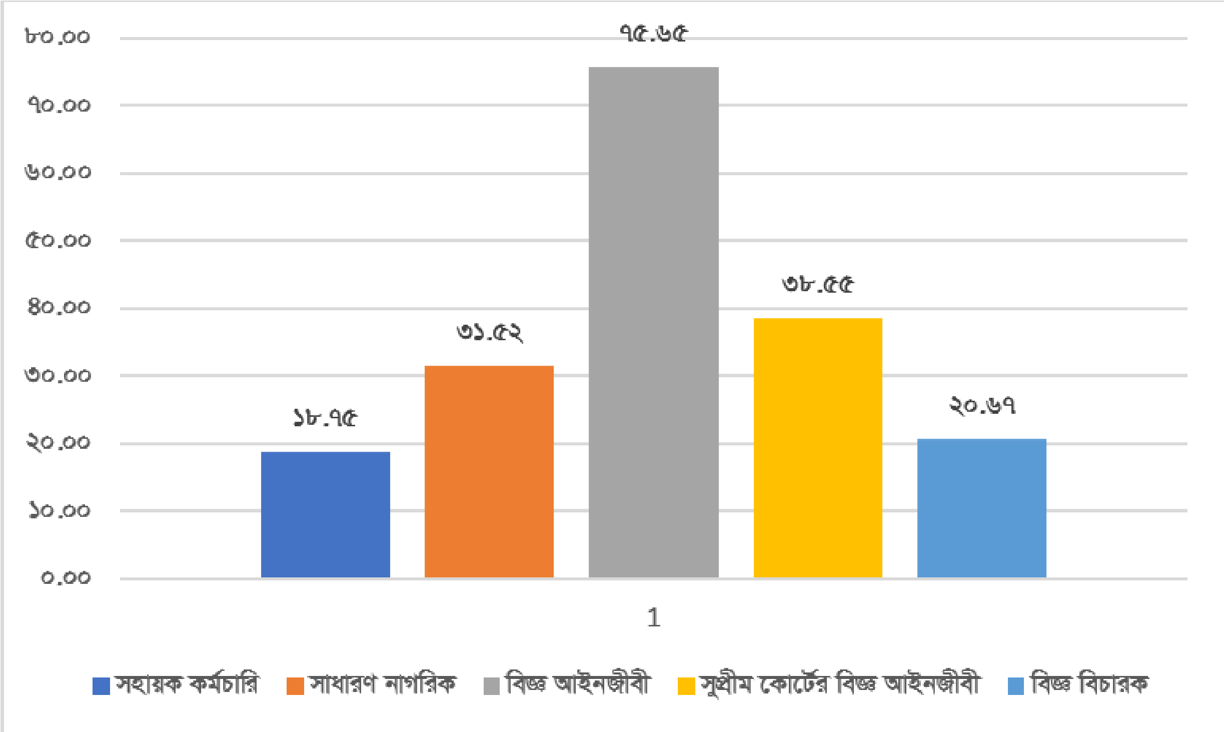

(ঙ) আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

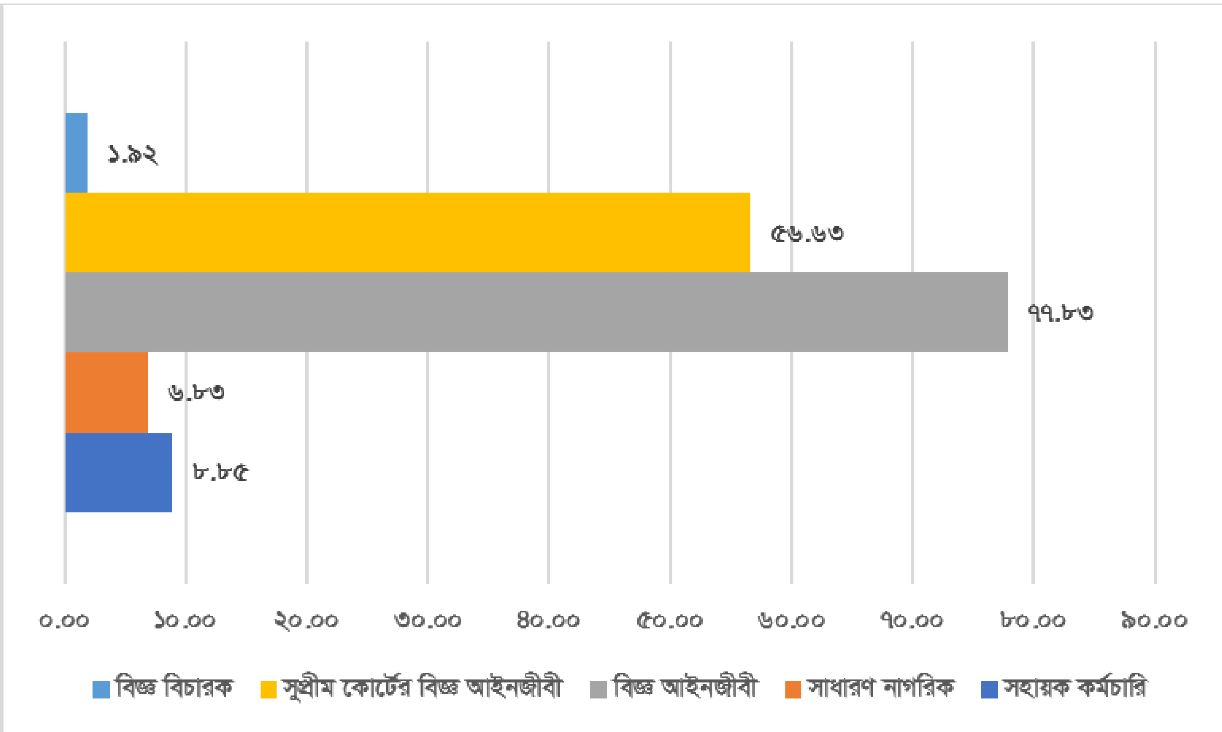

মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

(ক) মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে

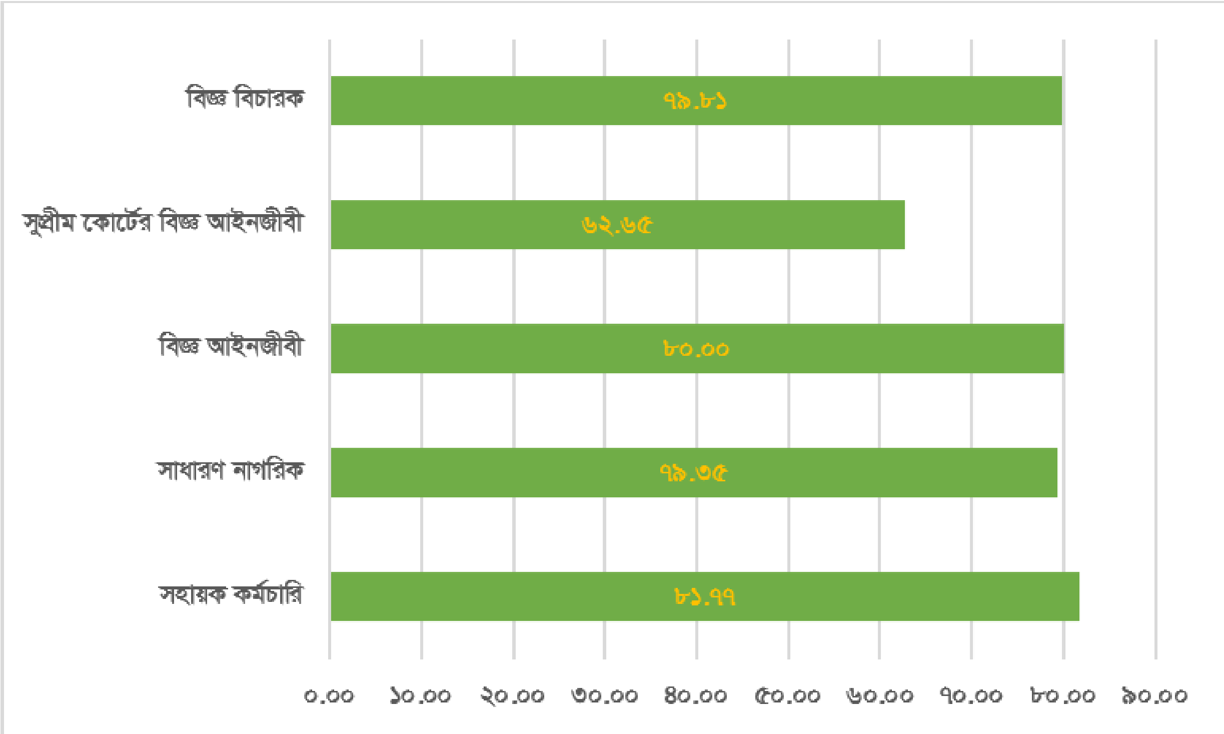

(খ) এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে

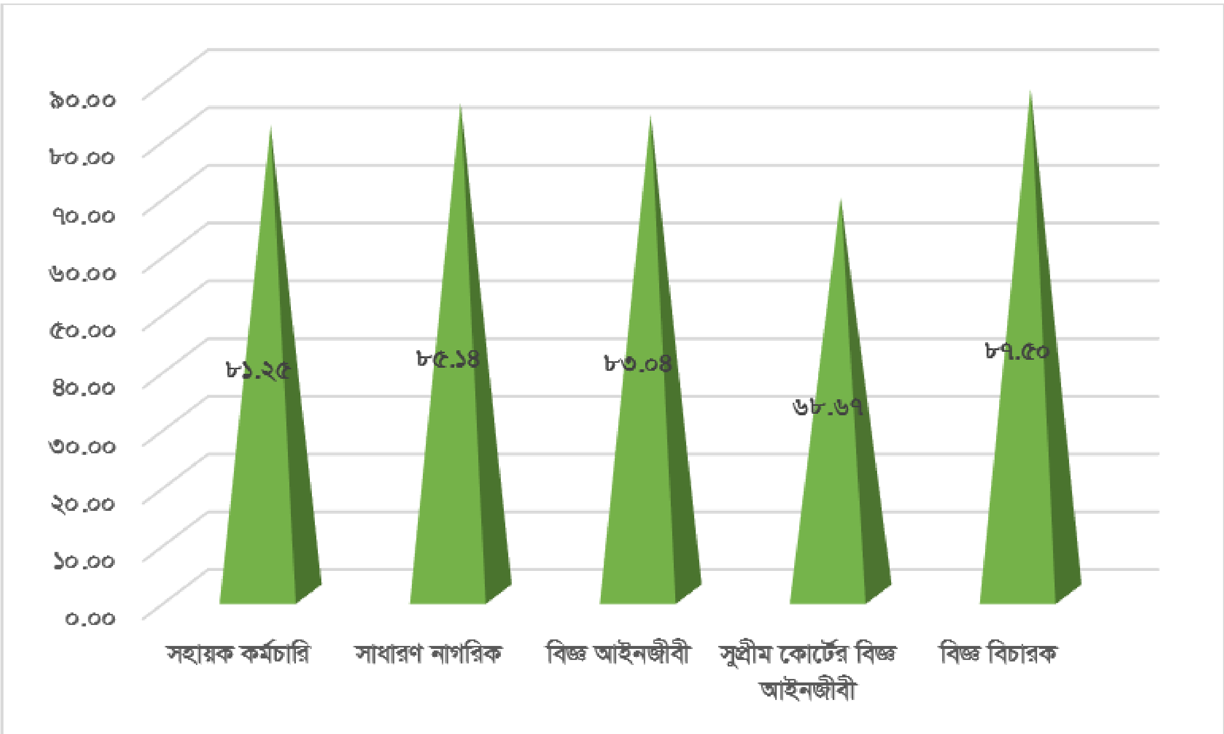

(গ) এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

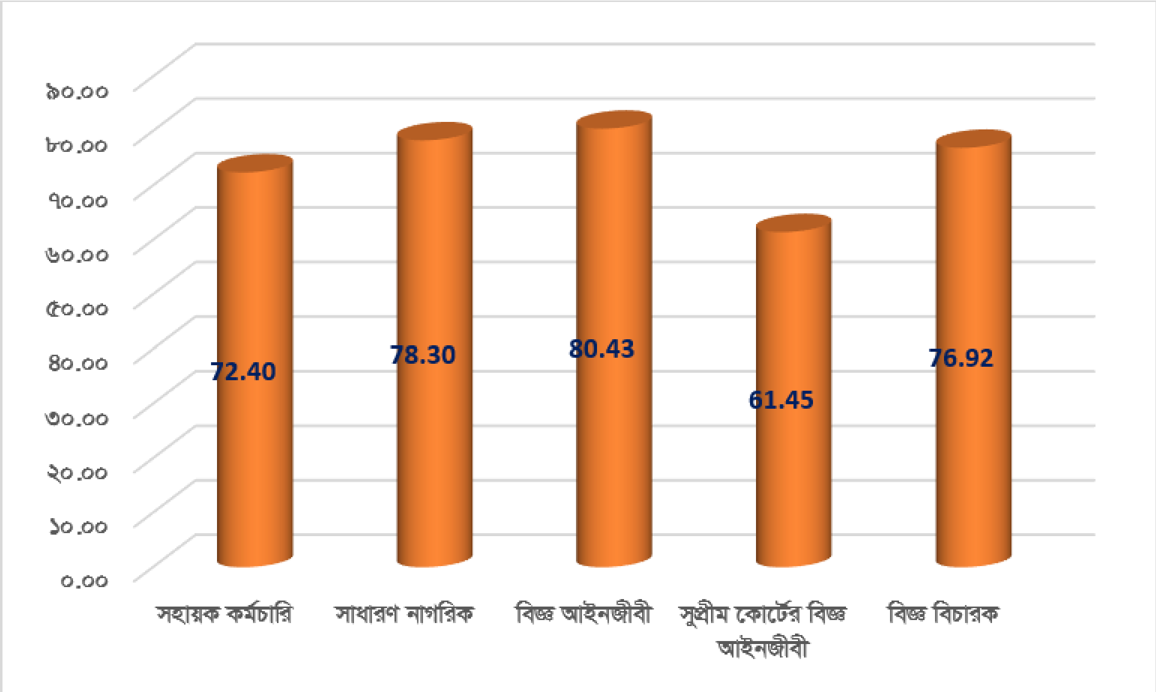

(ঘ) ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে

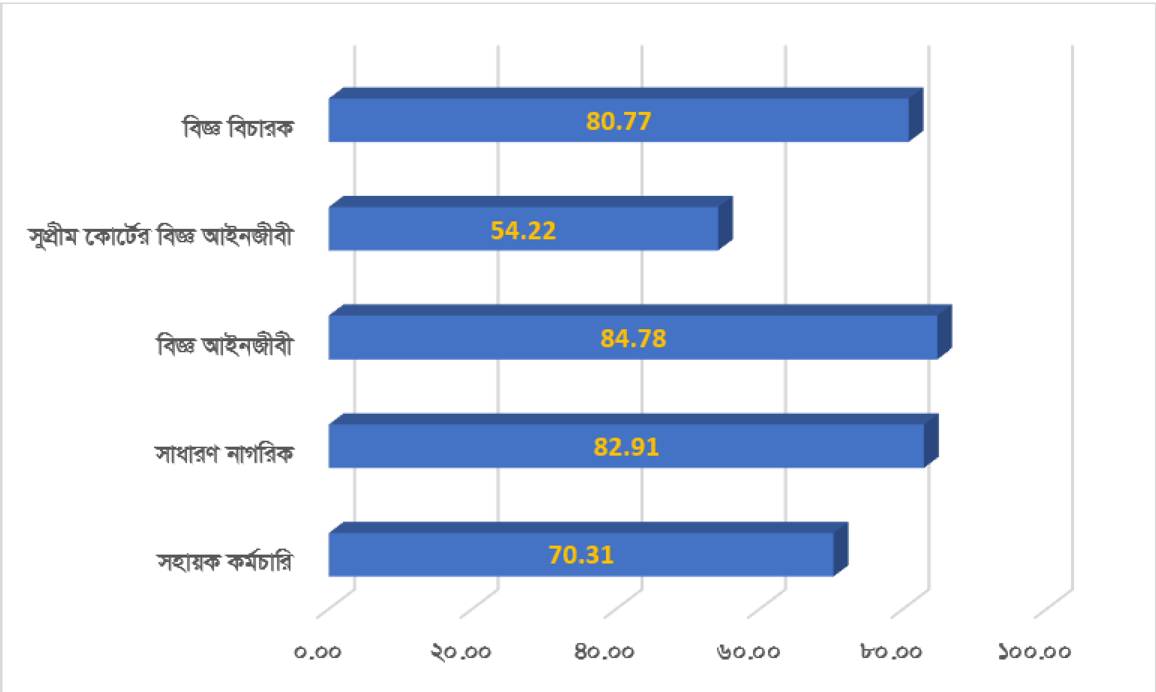

পরিশিষ্ট ১

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা

সভা নম্বর	তারিখ	সময়
প্রথম সভা	০৬/১০/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
দ্বিতীয় সভা	০৮/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তৃতীয় সভা	১৪/১০/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
চতুর্থ সভা	১৫/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
পঞ্চম সভা	২১/১০/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
ষষ্ঠ সভা	২৩/১০/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সপ্তম সভা	২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
অষ্টম সভা	২৭/১০/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
নবম সভা	০৩/১১/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
দশম সভা	০৬/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
এগারোতমো সভা	১০/১১/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
বারোতম সভা	১১/১১/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তেরোতম সভা	১৭/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
চৌদ্দতম সভা	১৯/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
পনেরোতম সভা	২৪/১১/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
ষোলোতম সভা	২৬/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সতেরোতম সভা	২৭/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
আঠারোতম সভা	০১/১২/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
উনিশতম সভা	০৩/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
বিশতম সভা	০৮/১২/২০২৪ রবিবার	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
একুশতম সভা	১২/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
বাইশতম সভা	২৩/১২/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তেইশতম সভা	৩০/১২/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
চব্বিশতম সভা	০২/০১/২০২৫ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
পঁচিশতম সভা	০৭/০১/২০২৫ মঙ্গলবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
ছাব্বিশতম সভা	১২/০১/২০২৫ রবিবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
সাতাশতম সভা	২০/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
আটাশতম সভা	২৭/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা
ঊনত্রিশতম সভা	২৯/০১/২০২৫ বুধবার	বিকাল ৪:০০ ঘটিকা

পরিশিষ্ট ২

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সাথে অংশীজনের মতবিনিময় সভা

ক্রমিক নং	অংশীজনের নাম	তারিখ	সময়
১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি	২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২.	আইন ও বিচার সংস্কার ফোরাম	২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ১.০০ ঘটিকা
৩.	Open Society Foundation	২৯/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৪.	ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি	০৩/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৫.	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি	০৬/১১/২০২৪ বুধবার	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
৬.	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	১০/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৭.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন	১১/১১/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৮.	বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এসোসিয়েশন	১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
৯.	The Carter Center	১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
১০.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা	১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
১১.	Office of Global Criminal Justice, U.S. Department of State (GCJ)	১৩/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১২.০০ ঘটিকা
১২.	United Nations Development Programme (UNDP)	১৮/১১/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
১৩.	U.S. Department of State's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)	২০/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১২.০০ ঘটিকা
১৪.	Japan International Cooperation Agency (JICA)	২৪/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
১৫.	সংবিধান সংস্কার কমিশন	২৬/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
১৬.	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ও ঢাকা জেলার জিপি/পিপি	২৭/১১/২০২৪ বুধবার	দুপুর ৩.৩০ ঘটিকা
১৭.	ফৌজিয়া করিম এন্ড এসোসিয়েটস	২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
১৮.	ব্যারিস্টার রবিউল ইসলাম এন্ড এসোসিয়েটস	২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
১৯.	বিচারপতি জনাব গোলাম মোর্তজা মজুমদার, চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ৩.৩০ ঘটিকা
২০.	জাতীয় পর্যায়ে অংশীজন মতবিনিময় সভা, ঢাকা	০১/১২/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২১.	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশীজন মতবিনিময় সভা, রাজশাহী	০৫/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২২.	জাতীয় আইনজীবী সমিতি	০৮/১২/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
২৩.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন (দ্বিতীয় পর্যায়)	০৮/১২/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা

ক্রমিক নং	অংশীজনের নাম	তারিখ	সময়
২৪.	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশীজন মতবিনিময় সভা, সিলেট	০৯/১২/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
২৫.	United Nations Mission from the Transitional Justice Interagency Taskforce	১১/১২/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
২৬.	বাংলাদেশ ল' অ্যালায়েন্স	১১/১২/২০২৪ বুধবার	দুপুর ২.৩০০ ঘটিকা
২৭.	রিটায়ার্ড জাজেস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন	১১/১২/২০২৪ বুধবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
২৮.	নির্দলীয় ঐক্যবদ্ধ বার আন্দোলন	১১/১২/২০২৪ বুধবার	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা
২৯.	আইন সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১১/১২/২০২৪ বুধবার	সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা
৩০.	Dhaka University Law Students Forum for Reforms	১১/১২/২০২৪ বুধবার	সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকা
৩১.	গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	৩০/১২/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৩২.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	৩০/১২/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৪.৩০ ঘটিকা
৩৩.	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন	২০/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
৩৪.	National Center for State Courts (NCSC)	২০/০১/২০২৫ সোমবার	
৩৫.	Human Rights Watch	২৭/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
৩৬.	United Nations Development Programme (UNDP) (দ্বিতীয় পর্যায়)	২৯/০১/২০২৫ বুধবার	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
৩৭.	Mr. Michael Miller, EU Ambassador to Bangladesh	২৯/০১/২০২৫ বুধবার	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা

পরিশিষ্ট ৩

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪

(খসড়া)

অধ্যাদেশ নং ...., ২০২৪

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের (৪) দফায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ "বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন" মর্মে ঘোষণা করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত ঘোষণা ও পরামর্শ প্রক্রিয়াকে অর্থবহ, কার্যকর এবং স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে একটি যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।– (১) এই অধ্যাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) "আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;

(খ) "কমিশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশন;

(গ) "প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; এবং সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার পালনরত আপীল বিভাগের বিচারকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঘ) "বিচার-কর্মবিভাগ" অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংজ্ঞায়িত বিচার-কর্মবিভাগ;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) "সভাপতি" অর্থ কমিশনের সভাপতি;

(ছ) “সুপ্রীম কোর্ট” অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

(জ) "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক" বা “বিচারক” অর্থ আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক এবং হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক;

(ঝ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা।- (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে, এই অধ্যাদেশ অনুসারে, উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক সুপারিশ করিবার জন্য “সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন” নামে একটি কমিশন এতদ্‌দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হইল।

(২) কমিশন নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:--

(ক) প্রধান বিচারপতি, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন, পদাধিকারবলে;

(খ) আপীল বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রথম ০২ (দুই) জন বিচারক, পদাধিকারবলেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির কারণে কমিশনের সভায় অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত বিভাগের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রথম ০৩ (তিন) জন বিচারক সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(গ) হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রথম ০২ (দুই) জন বিচারক, পদাধিকারবলে;

(ঘ) উপধারা (৩) অনুসারে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক;

(ঙ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল, পদাধিকারবলে;

(চ) বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশন এর সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ছ) উপধারা (৩) অনুসারে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী;

ব্যাখ্যা।- এই উপধারায় “পদাধিকারবলে” শব্দটির আওতায় সংশ্লিষ্ট পদে সাময়িকভাবে কার্যভার পালনরত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) ও (ছ) -তে উল্লিখিত কোনো সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে, সভাপতি উপধারা (২) এর দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিচারক-সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) উপধারা (২) এর দফা (ঘ) ও (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে মনোনয়ন পত্র প্রেরণের তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর এবং উক্তরূপ কোনো সদস্যকে পরবর্তী অনধিক ০২ (দুই) বৎসরের জন্য পুনরায় মনোনীত করা যাইবে।

(৫) কমিশনের এক বা একাধিক পদে শুন্যতার কারণে কমিশনের গঠন বা তৎকর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যক্রমের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪। কমিশনের সচিব।- সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কমিশনের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি ও তাঁহার দপ্তর কমিশনের কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫। কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।- (১) কমিশন, এই অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাইপূর্বক তাঁহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের সুপারিশ করিবার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে-

(অ) সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদের (ক) দফায় উল্লিখিত সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত কাজের মানসহ দক্ষতা, সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(আ) সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদের (খ) দফায় উল্লিখিত বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, উক্ত কর্মবিভাগে জ্যেষ্ঠতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদিঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশে উপদফা (অ) এবং (আ) তে উল্লিখিত দুইটি শ্রেণির যুক্তিসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হইবে।

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অতিরিক্ত বিচারককে সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থায়ীভাবে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে তাঁহার নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; এবং

(গ) হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ীভাবে কর্মরত কোনো বিচারককে আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠতা, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন উক্ত উপধারায় উল্লিখিত এবং উহার বিবেচ্য প্রতিটি বিষয়ের মান যথাযথভাবে নিরূপনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের পদের জন্য অভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে এবং তদনুসারে সুপারিশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কমিশন উহার এক বা একাধিক সদস্য লইয়া কমিটি গঠন করিতে এবং উক্ত কমিটিকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭ অনুসারে কোনো সদস্য কোনো সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বারিত হইলে, তাঁহাকে উক্ত সভার বিবেচ্য কোনো বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৫) সভাপতি, আবশ্যক মনে করিলে, কমিশনের সভায় বা উপধারা (৪) এ উল্লিখিত কমিটির কোনো সভায় কমিশনের সদস্য নহেন এমন কোনো ব্যক্তিকে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে উক্ত ব্যক্তির ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৬) কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কোনো সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত বা বেসরকারি সংস্থাকে বা উক্ত সংস্থায় দায়িত্বরত কোনো ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৭) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কমিশন প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৬। **কমিশনের সভা**।- (১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ বা উভয় বিভাগ এর বিচারক পদে সম্ভাব্য শুন্যতা অথবা বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অথবা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অথবা এই সকল বিষয় সম্মিলিতভাবে বিবেচনাক্রমে, প্রধান বিচারপতি-

(ক) উক্তরূপ পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন;

(খ) দফা (ক) এর অধীনে নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রপতি ও কমিশনকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উক্তরূপে নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে কমিশনের সভা আহবান ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অতিরিক্ত বিচারককে উক্ত বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে দফা (খ) অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণের প্রয়োজন হইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অতিরিক্ত বিচারকের পদের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ০২ (দুই) মাস পূর্বেই কমিশনের সভা আহবান করিতে হইবে।

(৩) কমিশনের সকল সভায় প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রবীণতম বিচারক সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশনের সভা অনুষ্ঠান এবং কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে: এবং আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ধারা ১০ অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য সভার ক্ষেত্রে অন্যূন ০৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতি পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কমিশন সাধারণতঃ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করিবে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিটি সভায় গোপন ব্যালটভিত্তিক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৭। কমিশনের কতিপয় সভায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ।—ধারা ৩ বা ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, ধারা ৩(২) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক-সদস্যগণ এবং ধারা ৩(২) এর দফা (ঙ), (চ) এবং (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন; এবং

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে, ধারা ৩(২) এর দফা (ঙ), (চ) এবং (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

৮। হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।- হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) কমিশনের সভা আহবান;

(খ) অত্র অধ্যাদেশের তপশীলে বিধৃত ফরমে অথবা কমিশন কর্তৃক সংশোধিত ফরমে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত দাখিলের আহবান;

(গ) সংবিধান, ধারা ৫(২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়াদি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধানাবলির আলোকে কমিশনে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাই;

(ঘ) যাচাই-বাছাই করিয়া কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) দফা (ঘ) -তে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নাম কমিশনের ওয়েবসাইটে বা কমিশনের বিবেচনায় যথোপযুক্ত অন্যবিধ প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ এবং তালিকাভুক্ত প্রার্থীর বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রমাণসহ তথ্য বা আপত্তি দাখিলের আহবান;

(চ) দফা (ঙ) এর অধীনে তথ্য বা আপত্তি দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক তথ্য বা আপত্তি দাখিল হইয়া থাকিলে তদ্‌বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান; এবং

(ছ) উপরে বর্ণিত কার্যধারা সমাপ্তির পর ধারা ৬(২) এর দফা (ক) এর অধীনে নির্ধারিত নিয়োগযোগ্য বিচারকের সংখ্যার অতিরিক্ত ০২ (দুই) জন প্রার্থীর নামসহ চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন এবং তাহা সুপারিশ আকারে ধারা ৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন।

৯। হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।- হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথাঃ-

(ক) কমিশনের সভা আহবান;

(খ) উক্ত বিচারকের যোগ্যতা নিরূপনের উদ্দেশ্যে ধারা ৫(২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা; এবং

(গ) দফা (খ) তে উল্লিখিত তথ্যাদি বিবেচনান্তে সুপারিশ প্রণয়ন এবং তাহা ধারা ৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন।

১০। আপীল বিভাগের বিচারক নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।–আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথাঃ-

(ক) কমিশনের সভা আহবান;

(খ) আপীল বিভাগে নিয়োগযোগ্য বিচারকের শূন্যপদের সংখ্যার আলোকে হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠ বিচারকদের যোগ্যতা নিরূপনের উদ্দেশ্যে ধারা ৫(২) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা;

(গ) দফা (খ) তে বর্ণিত তথ্যাদি বিবেচনান্তে সুপারিশ প্রণয়ন এবং তাহা ধারা ৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন।

১১। প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান।- ধারা ৮, ৯ ও ১০ এর অধীনে কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত সুপারিশ প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তাঁহার পরামর্শরূপে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারক নিয়োগ, পুনরীক্ষণের অনুরোধ, ইত্যাদি।- (১) ধারা **১১** এর অধীনে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি উক্ত পরামর্শের সহিত দ্বিমত পোষণ করিলে তিনি সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি পুনরীক্ষণ (Re-examination) এর জন্য প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে পুনরীক্ষণ এর অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে প্রধান বিচারপতি বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(৪) উপধারা (৩) অনুসারে উপস্থাপিত কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে কমিশন-

(ক) বিষয়টি পুনরীক্ষণক্রমে সংশোধিত আকারে উহার সুপারিশ প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবে; অথবা

(খ) যথাযথ তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক ইতোপূর্বে প্রেরিত সুপারিশ কোনো সংশোধন ব্যতিরেকে পুনরায় প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন করিবে;

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে সংশোধিত অথবা সংশোধন ব্যতিরেকে প্রাপ্ত সুপারিশ প্রধান বিচারপতি তাঁহার পরামর্শ আকারে রাষ্ট্রপতির নিকট পুনরায় প্রেরণ করিবেন।

(৬) রাষ্ট্রপতি উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত পরামর্শ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তদনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

১৩। বাজেট।- (১) কমিশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কমিশনের সচিব সভাপতির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সরকারের নিকট বাজেট-প্রস্তাব পেশ করিবেন।

১৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের রক্ষণ।– এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশ বা পরিপত্র অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কমিশন বা কমিশনের কোনো সদস্য বা কমিশনের কাজে সহায়তাকারী কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু বা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৫। বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সভাপতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও পরিপত্র জারি করিতে পারিবেন।

তপশিল

ফরম

(সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৮(খ) দ্রষ্টব্য)

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন

হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ লাভের আবেদনপত্র

নির্দেশনাঃ

(ক) ক্রমিক নং (১) হইতে (১১) তে উল্লিখিত বিষয়গুলো সকল প্রার্থীর জন্য; ক্রমিক নং (১২) এর (ক) হইতে (ঝ) তে উল্লিখিত বিষয়গুলো এ্যাডভোকেট প্রার্থীদের জন্য; ক্রমিক নং (১৩) এর (ক) হইতে (ঘ) তে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিচার-কর্মবিভাগে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য।

(খ) আবেদনপত্রে উল্লিখিত বিষয়ে কোনো তথ্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ও সংযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

ক্রমিক নং	বিষয়		তথ্য
১.	আবেদনকারীর নাম	:	
২.	নাগরিকত্ব (বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব লাভ করিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে)	:	
৩.	জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	:	
৪.	শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি/সমমান ও উচ্চতর (যাহাতে কোনো স্বীকৃতি, বৃত্তি, ফেলোশিপ বা অন্য কোনো অর্জনের বিষয়ও উল্লেখ থাকিবে)	:	
৫.	পেশাগত প্রশিক্ষণ, যদি থাকে	:	
৬.	পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ, যদি থাকে	:	
৭.	কোনো ক্লাব বা অনুরূপ কোনো সংগঠনের কোনো পদে অধিস্ঠিত থাকিলে উহার তথ্য	:	
৮.	কোনো মামলা (যাহাতে তদন্ত চলমান এমন মামলাসহ) বা আদালত অবমাননার মামলায় পক্ষ হইয়া থাকিলে, তদবিষয়ক তথ্য	:	
৯.	ইতোপূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ বা খণ্ডকালীন চাকুরি করিয়া থাকিলে তদবিষয়ে তথ্য	:	
১০.	কোনো গুরুতর ব্যধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ (যেমন ক্যান্সার বা		

	হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, যকৃত, অগ্নাশয়, স্নায়বিক ও দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত কোনো অসুস্থতা)	:	
১১.	গত তিন বছরের আয়কর রিটার্নের অনুলিপি	:	
১২.	**আবেদনকারী এ্যাডভোকেট হইলেঃ**		
	(ক) এ্যাডভোকেট হিসাবে, হাইকোর্ট বিভাগে এবং আপীল বিভাগে (যদি প্রযোজ্য হয়) তালিকাভুক্তির তারিখ	:	
	(খ) কোনো সময়ে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস- এ বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল ও বিবরণ	:	
	(গ) এ্যাডভোকেট হিসাবে আইনের নির্দিষ্ট কোনো শাখায় আবেদনকারীর বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকিলে উহার বিবরণ	:	
	(ঘ) এ্যাডভোকেট হিসাবে সুপ্রীম কোর্টে আইনগত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনসহ পরিচালনা করিয়াছেন এমন ২০ (বিশ) টি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)	:	
	(ঙ) আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সুপ্রীম কোর্টের মামলায় দাখিলকৃত ১০ (দশ)টি আইনগত দলিল যেমনঃ রিট পিটিশন, ফৌজদারি আপীল ও ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি রিভিশন এবং আদি ও অন্যান্য এখতিয়ারের প্রযোজ্য মামলার মূল আবেদনপত্র বা আরজি)	:	
	(চ) কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকিলে উহার বিবরণ	:	

	(ছ) আবেদনকারী কোনো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বা নির্বাচিত কোনো পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ	:	
	(জ) আবেদনকারী বংলাদেশ বার কাউন্সিলের বা আইনজীবী সমিতির কোনো পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ	:	
	(ঝ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে পেশাগত অসদাচারণ বিষয়ক কোনো কার্যধারায় অভিযুক্ত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ (ফলাফলসহ)	:	
১৩.	**<u>আবেদনকারী বিচার-কর্মবিভাগে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইলে</u>**		
	(ক) বিচার-কর্মবিভাগে যোগদানের তারিখ	:	
	(খ) গত দশ বৎসরে আবেদনকারী যে সকল পদে কর্মরত ছিলেন উহার বিবরণ	:	
	(গ) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা সূচিত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ (অভিযোগের ধরন এবং ফলাফলসহ)	:	
	(ঘ) আবেদনকারী কর্তৃক দোতরফা সূত্রে নিষ্পত্তিকৃত পাঁচটি ফৌজদারি এবং পাঁচটি দেওয়ানি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)	:	

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য এবং উহাতে কোনো বিভ্রান্তিমূলক বা মিথ্যা তথ্যের সংমিশ্রণ নাই।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট ৪

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা, ২০২৫

(খসড়া)

যেহেতু সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, প্রবেশ পদের নিয়োগ, বরখাস্তকরণ, সাময়িক বরখাস্ত করণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস গঠন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুর, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান এবং অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০০৭ প্রণয়ন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু উক্ত বিধিমালা দুইটি অনুসারে এবং এতদবিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিধানাবলি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; এবং

সেহেতু সংবিধানের ১১৫ ও ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন; যথা :-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।–

(১) এই বিধিমালা 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিধির প্রযোজ্যতা।– বিচারিক পদে কর্মরত এবং প্রেষনে নিয়োজিত বা লিয়েন প্রাপ্ত এবং শিক্ষানবিশসহ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল সদস্যের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা।– এই বিধিমালায়, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে-

(ক) 'সার্ভিস' বলিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসকে বুঝাইবে;

(খ) 'সার্ভিসের সদস্য' বলিতে এমন ব্যক্তিদের বুঝাইবে যাহারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য;

(গ) 'বিচারক' বলিতে বিচারকাজে নিয়োজিত সার্ভিসের কোন সদস্যকে বুঝাইবে;

(ঘ) 'পরিবারের সদস্য' বলিতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগনকে বুঝাইবে-

(অ) সার্ভিসের সদস্যের সঙ্গে বসবাসরত থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁহার স্ত্রী/স্বামী, সন্তান ও সঙ্গে বসবাসরত সৎ সন্তান; এবং

(আ) সার্ভিসের সদস্যের সঙ্গে বসবাসরত এবংতাঁহার উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল তাঁহার নিজের অথবা স্ত্রী/স্বামীর আত্মীয়-স্বজন।

তবে আইনগতভাবে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত স্ত্রী/স্বামী অথবা কোনভাবে সার্ভিসের উক্ত সদস্যের উপরনির্ভরশীল নহে বা যাদের অভিভাবকত্ব সার্ভিসের উক্ত সদস্য কোন প্রচলিত আইন বলে হারাইয়াছেন, এইরূপ সন্তান বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের পরিবারের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

৪। বিচারকর্মে অনুসরণীয় বিধানাবলি।–

(১) সার্ভিসের সদস্যগণ সতর্কতার সহিত আদালতের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং সময়ানুবর্তিতা ও বিচারিক শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে এজলাসে বসিবেন এবং প্রচলিত

আইন মোতাবেক আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা করিবেন। বিচারকার্য পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি রুঢ় না হইয়া নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকিবেন এবং শোভন, ভারসাম্যপূর্ন ও নির্মোহ আচরণ করিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি যেন অশোভন আচরণ না করেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন।

(২) সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিচারালয় একটি পবিত্র স্থান। আদালতে ধৈর্যের সহিত ভাবগম্ভীর পরিবেশ রক্ষা করিয়া প্রতিটি মামলার শুনানিকার্য পরিচালনা করা প্রত্যেক বিচারকের একান্ত কর্তব্য। আদালতে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা পরিহার করিতে হইবে। প্রত্যেক বিচারককে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন আদালত প্রাঙ্গনে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী বা আদালতের মর্যাদাহানিকর কোন কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়।

(৩) সার্ভিসের সদস্যগণ তাঁহাদের আদালতসমূহের ব্যবস্থাপনা এইরূপ রাখিবেন যেন বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। আদালতের কোন কর্মচারি ও সহকারি তাঁহাদের কাজে অমনোযোগী হইলে বা অন্যায় আচরণ করিলে সে ব্যাপারে সার্ভিসের সদস্যগণ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । কর্মচারিগণের কোন প্রকার ত্রুটি বা অবহেলার কারণে কেউ যাহাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেই দিকেও সার্ভিস সদস্যগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৪) বিচারকালে অযথা কালক্ষেপণ রোধের উদ্দেশ্যে, বক্তব্য পরিষ্কারভাবে অনুধাবনের জন্য এবং আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন হইলে বিচারক যথোপযুক্ত সময়ে হস্তক্ষেপ করিবেন বা উপদেশ দিবেন।

(৫) বিচারকার্যে একজন বিচারক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং যথাযথভাবে লিখিত রায় প্রদান করিবেন। বিচার প্রার্থীদের অযথা হয়রানি লাঘবের জন্য তিনি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। ব্যক্তি আচরণ।–

(১) সার্ভিসের একজন সদস্যকে কেবলমাত্র দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই নহে বরং ব্যক্তিগত জীবনেও সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শবান হইতে হইবে। ব্যক্তিগত কারণে বা স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করা সার্ভিসের একজন সদস্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। সর্বাবস্থায় একজন বিচারককে নিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। সার্ভিসের সদস্যগণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শালীনতা বজায় রাখিবেন।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্যকে প্রভাবিত বা সুপারিশ করিতে পারেন, এমন কোন ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া বিচারকগণের জন্য অনুচিত। "Justice should not only be done but must also be shown to have been done."-একজন বিচারককে এই Maxim টি সর্বদা স্মরণ রাখতে হইবে এবং তা নিশ্চিতকরণের জন্য একজন বিচারক কোন মামলায় তাঁহার মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হইতে পারেন এইরূপ কোন সম্ভাবনা বা সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ দিবেন না।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোন এ্যাডভোকেট বা এ্যাডভোকেটের ছেলে-মেয়ে বা নিকটাত্মীয়ের বিয়ের অথবা অন্যকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইলে তাঁহার পক্ষে এককভাবে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা সমীচিন হইবে না। তবে উক্ত জজশিপের অন্যান্য বিচারকবৃন্দ আমন্ত্রিত হইলে সকলে একযোগে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার ব্যক্তিগত কোন অনুষ্ঠানে, স্থানীয় বা জাতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিবেন না এবং এমন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ গ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করিবেন।

(৫) একজন বিচারক অন্যান্য বিচারকদের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিবেন। তিনি অন্য সকল বিচারকের সহিত শোভন আচরণ করিবেন এবং কাহারো সাথে কোন মতবিরোধ হইলে সংযম ও সৌজন্য বজায় রাখিবেন। সার্ভিসের সদস্যগণ সকল প্রকার দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিবেন।

(৬) কোন বিচারক তাঁহার বাসভবনে আইন পেশায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পেশা সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম করিতে দিবেন না।

৬। উপহার বা উপঢৌকন।–

(১) সার্ভিসের সদস্যগণ কখনও কোন অবস্থাতেই মামলার কোন পক্ষ, আইনজীবী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন না বা পরিবারবর্গের কাহাকেও এইরূপ উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করিতে দিবেন না।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য এমন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার সামগ্রী নিজে গ্রহণ করিতে বা তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন না, যাহাতে তিনি তাঁহার বিচারিক বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন দায়িত্ব পালনে উক্ত উপহার বা উপঢৌকন দাতার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হন।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার কর্মস্থলে যোগদান উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার সময় কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন প্রকারের উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে, কর্মস্থল হইতে বদলিজনিত বা অবসরজনিত কারণে সংবর্ধনার সময় সার্ভিসের সদস্যগণ অনূর্ধ্ব ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে কোন প্রকার উপঢৌকন প্রেরণ বা প্রদান করিবেন না।

৭। জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের সম্মানে গণজমায়েত।–

সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার সম্মানে কোন গণজমায়েত অথবা কেবল তাঁহাকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা অথবা তাঁহার সম্মানে কোন আপ্যায়ন অনুষ্ঠান আয়োজনে উৎসাহ প্রদান করিতে পারিবেন না এবং তিনি নিজে উক্ত প্রকারের জমায়েতে অংশগ্রহণ বা যোগদান করিবেন না। তবে, কোন আইনজীবী সমিতির সভায় যোগদান করিতে পারিবেন।

৮। ধার গ্রহণ ইত্যাদি।–

সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকার বা অফিস সংক্রান্ত কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন ধার গ্রহণ করিতে বা তাঁহার নিকট নিজেকে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনভাবে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৯। মূল্যবান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়।–

একজন সার্ভিসের সদস্য ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকার অধিক মূল্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা যেকোন মূল্যের মটরগাড়ী (মটর সাইকেল ব্যতীত) ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের নিকট নিজের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০। ইমারত নির্মাণ, ইত্যাদি।–

সার্ভিসের কোন সদস্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করিয়া বাণিজ্যিক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে কোন ইমারত নির্মাণ করিতে পারিবেন না।

১১। সম্পত্তির ঘোষণা।–

(১) সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যকে সার্ভিসে প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন শেয়ার সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি ও ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বা ইহার অধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বা নগদ অর্থ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের নিকট ঘোষণা দিতে হইবে।

(২) সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি তিন বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপবিধি-(১) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণায় বা সর্বশেষ বিগত তিন বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করিতে হইবে।

১২। কোম্পানি স্থাপন বা ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত ব্যবসা অথবা চাকরি, ফটকা কারবার এবং বিনিয়োগ।–

(১) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক বা অন্য কোন কোম্পানী স্থাপন, নিবন্ধিকরণ বা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা ওই সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁহার নাম ব্যবহার করিতে দিবেন না।

(২) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আদালতের সময়ের বাইরে ল' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহে দুইদিন সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোনো কোচিং সেন্টার পরিচালনা করিতে বা উহার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে বা উহাতে শিক্ষকতা করিতে বা উক্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্যে অংশ গ্রহণ করিবেন না বা তাঁহার নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(৩) সার্ভিসের একজন সদস্য অবৈতনিকভাবে সামাজিক এবং সময়ে সময়ে শিল্প ও সাহিত্যধর্মী কর্মে এবং এক বা গুটিকয়েক শিল্প ও সাহিত্যধর্মী প্রকাশনায় তাঁহার উপর অর্পিত বিচারিক বা প্রশাসনিক দায়িত্বের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টিতে এইরূপ কর্ম অনভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সুপ্রীম কোর্ট যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উক্ত কর্ম হইতে বিরত থাকিতে অথবা উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার পরিবারের কোনসদস্যকে তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন ব্যবসায়ে জড়িত হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) একজন বিচারক কোন ব্যবসায় বা ফটকামূলক লেনদেনে কোনভাবেই নিজেকে জড়িত করিবেন না বা জড়িত করিতে দিবেন না। তবে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর প্রাইমারী শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) সার্ভিসের কোন সদস্য ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক হইতে অথবা পরিচালনা করিতে অথবা সম্পাদনায় বা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৩। দেউলিয়াত্ব ও অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা।–

(১) সার্ভিসের সদস্যকে অবশ্যই অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততাকে পরিহার করিতে হইবে।

(২) যদি কোন কর্মকর্তা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন অথবা তাঁহার বেতনের ক্রোকযোগ্য অংশের পুরোটাই যদি এক নাগাড়ে দুই বৎসরকাল পর্যন্ত ক্রোকাবদ্ধ থাকে অথবা যেই পরিমাণ টাকার জন্য ক্রোক করা হইয়াছে, স্বাভাবিক অবস্থায় যদি তাহা দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি এই বিধি ভংগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে-যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, এই দেউলিয়াত্ব বা ঋণগ্রস্ততা এমন একটি ঘটনার ফলশ্রুতি যাহা তিনি স্বাভাবিক তৎপরতার দ্বারা পূর্বে বুঝিতে সক্ষম হন নাই অথবা যাহার উপর তাঁহার কোন নিয়ন্ত্রন ছিল না এবং যাহা তাঁহার কোন অবিবেচনা প্রসূত আচরন বা অপব্যয়ের অভ্যাস জনিত কারণে সৃষ্ট হয় নাই।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নিজেকে দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেন বা দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হন, তাহা হইলে তিনি এই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ সুপ্রীম কোর্টকে অবহিত করিবেন।

১৪। সরকারি দলিলাদি ও তথ্যাদি ফাঁস।–

সার্ভিসের কোন সদস্য কোন সরকারি দলিল পত্রাদির বিষয়বস্তু অথবা তথ্য-যাহা তাঁহার দায়িত্ব পালনকালে দাপ্তরিক বা অন্য কোন উৎস হইতে তাঁহার দখলে আসিয়াছে অথবা বিচারিক দায়িত্ব পালনকালে তাঁহার দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা-

(ক) বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(খ) প্রশাসনিক প্রয়োজনে জনসমক্ষে প্রকাশ না করিয়া এতদসংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১৫। বেতার সম্প্রচার, সংবাদ মাধ্যম, ইন্টারনেট ও যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য/মন্তব্য ইত্যাদি প্রচার বা প্রকাশে বিধিনিষেধ।–

(১) সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব-অনুমোদন ব্যতিরেকে কিংবা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বেতার কিংবা টেলিভিশন সম্প্রচারের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে এবং কোন সংবাদ পত্র বা সাময়িকীতে নিজ নামে অথবা বেনামে অথবা অন্যের নামে কোন নিবন্ধ বা পত্র লিখিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না, যদি এই সম্প্রচার, নিবন্ধ বা পত্র সম্পূর্ণরূপে আইন, আইন ও বিচার, শিল্প বা সাহিত্যধর্মী অথবা বিজ্ঞান কিংবা ক্রীড়া সম্পর্কিত হয়।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য ইন্টারনেট বা অন্যকোন প্রযুক্তির মাধ্যমে কোন সামাজিক যোগাযোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট বা অন্য কোন ওয়েবসাইট, ব্লগ ইত্যাদিতে বা কোন প্রকার এ্যাপস বা এ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা অন্য কোন প্রকার প্রচার মাধ্যমে সার্ভিসের অন্য কোন সদস্য বা বিচার

বিভাগ বা নিজের সম্পর্কে বা অন্য কোন ব্যক্তিসম্পর্কে কোন প্রকার অশালিন বা কুরুচীপূর্ণ বা অসত্য বা অশোভন মন্তব্য বা তথ্য বা ছবি বা ভিডিও ইত্যাদি প্রকাশ বা প্রচার করিবেন না।

১৬। সরকারের সমালোচনা এবং বিদেশি রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য বা মতামত প্রকাশ।–

(১) সার্ভিসের কোন সদস্য নিজ নামে লিখিত কোন প্রকাশনায় অথবা জনসমক্ষে অথবা বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে নিজ বক্তব্যে এমন কোন মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, যাহা-

(অ) বিচার বিভাগ বা সরকারের সহিত জনগণের কিংবা কোন শ্রেণী বিশেষের সম্পর্ককে বিব্রত করে, অথবা

(আ) বাংলাদেশের সহিত বিদেশি রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য নিজ নামে কোন ডক্যুমেন্টে, বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে বা জনসমক্ষে যে বক্তব্য পেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিধি নিষেধের আওতায় পড়িতে পারে বলিয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইলে, উক্ত বক্তব্যের খসড়া সুপ্রীম কোর্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উক্ত বক্তব্য প্রকাশ কিংবা বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচার বা জনসমক্ষে প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৭। রাজনীতি, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি।–

(১) সার্ভিস সদস্যগণের কথাবার্তা বা আচার আচরণ যেন কোন রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে না যায়। তাঁহারা কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান করিবেন না বা রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির সংগে সম্পর্কিত কোন প্রতিষ্ঠানের সভায়, প্রচারণায় বা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিবেন না।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন অংগ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোন সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী যদি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হন বা কোন প্রকারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে সে সম্পর্কে লিখিতভাবে সুপ্রীম কোর্টকে অবহিত করিবেন।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে বা পরিচালনা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিবেন না, তবে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত অলাভজনক সংস্থা যেমন অফিসার্স ক্লাব এর ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৮। সাম্প্রদায়িকতা পরিহার।–

সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার বক্তব্য বা আচরণে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে উৎসাহ বা উস্কানী প্রদান করিবেন না।

১৯। স্বজনপ্রীতি, তোষামোদি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি পরিহার করণ।–

সার্ভিসের কোন সদস্য স্বজনপ্রীতি, তোষামোদি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন না।

২০। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিহার।–

সার্ভিসের কোন সদস্য বিচারকার্য পরিচালনাকালে যদি দেখিতে পান যে কোন মামলার বিষয়বস্তু বা উহার কোন পক্ষের সহিত তাঁহার নিজের বা তাঁহার পরিবারের কোন সদস্য বা তাঁহার নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে তাহা

হইলে, উক্ত মামলাটি তিনি নিজে না করিয়া উপযুক্ত উর্ধ্বতন আদালত বা ক্ষেত্রমতে সুপ্রীম কোর্টের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

২১। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যপদ।–

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের প্রতিনিধিত্বশীল কোন সমিতি নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ না করিলে সার্ভিসের কোন সদস্য উক্ত সমিতির সদস্য, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা হইতে পারিবেন নাঃ

(ক) সমিতির সদস্যপদ এবং কার্য নির্বাহী পদসমূহ সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) এই সমিতি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত জড়িত হইতে পারিবেনা বা কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেনা।

(গ) এই সমিতি বাংলাদেশ অথবা অন্যত্র আইন সভা বা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষের কোন নির্বাচনে-

(অ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ভার বহন বা প্রদান করিতে পারিবে না,

(আ) কোনভাবেই কোন প্রার্থীকে সমর্থন করিতে পারিবে না,

(ই) ভোটার তালিকাভুক্তির ব্যাপারে অথবা প্রার্থী মনোনয়নে কোন সাহায্য করিতে বা উক্ত ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না।

২২। রাজনৈতিক বা অন্যকোন প্রকার প্রভাব খাটানো।–

সার্ভিসের কোন সদস্য কোন বিষয়ে তাঁহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা অন্য কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অনুরোধ জানাইতে পারিবেন না।

২৩। সুপ্রীম কোর্ট এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত, আদেশ, পত্র-পরিপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আপত্তি।–

সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্ট বা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে জনসমক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না। তবে বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

২৪। বিধি লংঘন।–

এই বিধিমালার যে কোন বিধান লংঘন "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা ২০১৭" এর আওতায় অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সার্ভিসের কোন সদস্য এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৫। প্রয়োগ ও হেফাজত।–

(১) এই বিধিমালা বলবৎ হওয়ার পর হইতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের ক্ষেত্রে Government Servants (Conduct) Rules, 1979 প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর কোন বিধি লংঘনের কারণে কোন সিদ্ধান্ত বা শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে তাহা কার্যকর থাকিবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর ব্যত্যয় ঘটানোর কারণে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোন আইনানুগ

কার্যক্রম নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উক্ত মামলা বা কার্যক্রম এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

(৪) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর কোনো বিধানের লংঘন করিয়া থাকিলে এবং উক্ত লংঘন এই বিধিমালা জারি হইবার পরে উদঘাটিত হইলে এতদবিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত Rules, 1979 প্রযোজ্য হইবে।

পরিশিষ্ট ৫

আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫

(খসড়া)

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান এবং মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্তে একটি আইনি কাঠামো তৈরি করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
(১) এই অধ্যাদেশ আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা
বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-
(ক) "আইনগত সহায়তা" অর্থ
(অ) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে-
(১) কোনো আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় সহায়তা প্রদান;
(২) মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোনো সহায়তা প্রদান;
এবং
(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে প্যানেল আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান;
(আ) যে কোনো আবেদনকারী ব্যক্তিকে আইনগত তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান;
(ই) যে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মামলা মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করা কিংবা

মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির শর্তাবলি নির্ধারণ;
(ঈ) মামলাপূর্ব যে কোনো বিরোধ মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি;

(খ) "আদালত" অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোনো আদালত;
(গ) "আবেদন" বা "দরখাস্ত" অর্থ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন বা দরখাস্ত;
(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(ঙ) "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের সুপ্রীম কোর্ট কমিটি;
(চ) "জেলা কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের জেলা কমিটি;
(ছ) "শ্রম আদালত কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের শ্রম আদালত কমিটি;
(জ) "চৌকি আদালত কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের চৌকি আদালত কমিটি;
(ঝ) "উপজেলা কমিটি" অর্থ এই আইনের আওতায় প্রবিধান দ্বারা গঠিত উপজেলা কমিটি;
(ঞ) "ইউনিয়ন কমিটি" অর্থ এই আইনের আওতায় প্রবিধান দ্বারা গঠিত ইউনিয়ন কমিটি;
(ট) "নীতিমালা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত নীতিমালা;
(ঠ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(ড) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
(ঢ) "বিচারপ্রার্থী" অর্থ কোনো আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত দেওয়ানি, পারিবারিক বা ফৌজদারি মামলার সম্ভাব্য বা প্রকৃত বাদী, বিবাদী, ফরিয়াদী বা আসামী;
(ণ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত জাতীয় পরিচালনা বোর্ড;
(ত) "লিগ্যাল এইড অফিসার" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগকৃত লিগ্যাল এইড অফিসার;
(থ) "কমিটি" অর্থ ক্ষেত্র মত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি, চৌকি আদালত কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি;
(দ) "সদস্য" অর্থ বোর্ড বা ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি, চৌকি আদালত কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির কোনো সদস্য;
(ধ) "মধ্যস্থতাকারী" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসার এবং ধারা ২৪ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী;
(ন) "অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি" অর্থ মেডিয়েটরদের অ্যাক্রেডিটেশন বা স্বীকৃতি প্রদানের নিমিত্তে ধারা ৩৮ এর অধীনে গঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি;
(প) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত লিগ্যাল এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর;
(ফ) "মহাপরিচালক" অর্থ লিগ্যাল এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;
(ব) "মধ্যস্থতা" অর্থ এরূপ একটি আইনি প্রক্রিয়া, যেখানে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বিবাদমান দুটি পক্ষকে দ্বন্দ্ব নিরসনে পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছাতে সহায়তা করেন, তবে মধ্যস্থতাকারী কোনো পক্ষকে কোনো সিদ্ধান্ত আরোপ করিবেন না। মধ্যস্থতা মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-litigation mediation) এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মধ্যস্থতা (Post-litigation mediation) কেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;
(ভ) মধ্যস্থতা চুক্তি (Mediation Agreement) হলো মধ্যস্থতা কার্যক্রমের মাধ্যমে পক্ষগণ কর্তৃক ঐক্যমতে পৌঁছানোর শর্ত সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র। বর্তমানে উদ্ভূত হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এরূপ যে কোনো বিরোধ মধ্যস্থতা চুক্তির বিষয়বস্তু হতে পারে;

৩. এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অতিরিক্ততা

এই আইনের বিধানাবলি অন্যান্য আইনের কোনো বিধানের ব্যত্যয় না হইয়া উহার অতিরিক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

৪. লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, লিগ্যাল এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) অধিদপ্তর একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোনো বিভাগ বা জেলায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬. পরিচালনা ও প্রশাসন

(১) অধিদপ্তরের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং অধিদপ্তর যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) অধিদপ্তর উহার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

৭. জাতীয় পরিচালনা বোর্ড

(১) জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নী-জেনারেল;

(ঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ঝ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
(ঞ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক;
(ট) মহা-কারা পরিদর্শক;
(ঠ) ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;
(ড) সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি;
(ঢ) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;
(ণ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থা হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(ত) মীমাংসা, মধ্যস্থতা বা সালিশী কার্যক্রম পরিচালনা করে এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থা হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(থ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত নারী সংস্থা হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(দ) মহাপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা ১(ণ), (ত) এবং (থ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮. বোর্ডের কার্যাবলি

(১) বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদির নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা;
(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা নীতিমালা প্রণয়ন করা;
(গ) অধিদপ্তরের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
(ঘ) অধিদপ্তরের নীতিগত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা;
(ঙ) অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্ম পরিকল্পনার অনুমোদন প্রদান করা;
(চ) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোনো উৎস হইতে অনুদান গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান করা;
(ছ) এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি কোনো নির্দেশ বা কমসূচি বাস্তবায়ন করা;
(জ) বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন ও তৎঅধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসরণ করিবে;

৯. বোর্ডের সভা

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোনো সদস্য বা এইরূপ কোনো নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০. অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরূপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(খ) অধিদপ্তর প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আইনহগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;

(গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থী জনগণের জন্য আইনগত পরামর্শ সেবা নিশ্চিত করা;

(ঘ) মীমাংসা এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

(ঙ) মীমাংসা এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা;

(চ) পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ছ) মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণকে লাইসেন্স বা স্বীকৃতি (Accreditation) প্রদান করা;

(জ) আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান কর্মসূচির বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ঝ) আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ঞ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ট) মধ্যস্থতাকারীগণের কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ, পরীবিক্ষণ ও তদারকি করা;

(ঠ) আইনগত সহায়তা এবং মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;

(ড) জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

(ঢ) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি এবং চৌকি আদালত কমিটির কার্যাবলি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলি সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

(ণ) আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যথা:-

(অ) আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(আ) আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

(ই) আইনগত মৌলিক ধারণালব্ধ জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
(ঈ) ন্যায়বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;
(উ) সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনসহ আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বুকলেট, পুস্তিকা, ইত্যাদি প্রকাশ করা;
(ত) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

১১. মহাপরিচালক

(১) অধিদপ্তরের জন্য একজন মহাপরিচালক থাকিবে।
(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
(৩) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী ও সার্বক্ষণিক কর্মচারি হইবেন এবং তিনি-
(ক) অধিদপ্তরের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বে থাকিবেন;
(খ) অধিদপ্তরের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;
(গ) বোর্ডের নীতি, আদেশ ও নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিবেন;
(ঘ) সার্বিক কাজের জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন; এবং
(ঙ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাহার কার্যালয়ের কার্যক্রম বা দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২. কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ

অধিদপ্তর উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি

১৩. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি

(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-
(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
(খ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক;
(গ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি কর্তৃক মনোনীত সমিতির একজন সদস্য;

(ঘ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত মানবাধিকার ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী দুইজন আইনজীবী, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
(ঙ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানাবাধিকার ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি;
(চ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নী-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন অন্যূন অতিরিক্ত অ্যাটর্নী- জেনারেল;
(ছ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(জ) সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্বও পালন করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ), (ঙ), (চ) এবং (ছ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

১৪. সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
(খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;
(গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
(ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
(ঙ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;
(চ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ছ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;
(জ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি কর্তৃক পরিচালিত আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমের সামগ্রিক প্রশাসনিক দায়িত্ব কমিটির চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।
(৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৫. জেলা কমিটি

(১) প্রত্যেক জেলায় অধিদপ্তরের একটি জেলা কমিটি থাকিবে এবং উহা উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-
(ক) জেলা ও দায়রা জজ, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
(খ) চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঘ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি সিভিল সার্জন;
(চ) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার;
(ছ) জেলার জেল সুপারিনটেনডেন্ট;
(জ) জেলা সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;
(ঝ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;
(ঞ) জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;
(ট) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;
(ঠ) জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত কমিটির একজন প্রতিনিধি;
(ড) সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলার পৌরসভার একজন মেয়র, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;
(ঢ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি;
(ণ) জেলার সরকারি উকিল;
(ত) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর;
(থ) মহানগর দায়রা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর;
(দ) জেলার বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক, যদি থাকে, তাহাদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক;
(ধ) পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলা পরিষদের দুইজন সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
(ন) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত জেলার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যদি থাকে, এর একজন প্রতিনিধি;
(প) জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক;
(ফ) লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(২) যেইসব জেলায় মেট্রোপলিটন শহর রহিয়াছে সেইসব জেলার জেলা কমিটিতে মহানগর দায়রা জজ, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারও সদস্য থাকিবেন।

(৩) যদি কোনো জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকে, তাহা হইলে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা কমিটির সদস্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় একাধিক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকিলে উক্ত ট্রাইব্যুনালসমূহে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ এবং নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, সদস্য হইবেন।

(৪) যে সকল জেলায় সিটি কর্পোরেশন রহিয়াছে সেই সকল জেলায় জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত দুইজন কাউন্সিলর, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ), (ড), (ধ) ও (ন) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ বা গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:
আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত রূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৬. জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যতদূর সম্ভব আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;

(গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(চ) জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(জ) বোর্ড বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ঝ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

(২) জেলা কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৭. শ্রম আদালত কমিটি

(১) যে সকল জেলায় শ্রম আদালত রহিয়াছে সে সকল জেলার শ্রম আদালতের জন্য একটি শ্রম আদালত কমিটি থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় একাধিক শ্রম আদালত থাকিলে উক্ত শ্রম আদালতসমূহের জন্য একটি শ্রম আদালত কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শ্রম আদালত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান, যিনি পদাধিকারবলে ইহার চেয়ারম্যান হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় একাধিক শ্রম আদালত থাকিলে উক্ত আদালতসমূহে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) একাধিক শ্রম আদালতের ক্ষেত্রে দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য বিচারকগণ;
(গ) শ্রম আইনের ধারা ৩১৭ এর অধীন নিযুক্ত একজন যুগ্ম-শ্রম পরিচালক;
(ঘ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত মহাপরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা যিনি সহকারি মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন;
(ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রার;
(চ) শ্রম আদালত আইনজীবী সমিতির সভাপতি;
(ছ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শ্রম আইনের ধারা ২১৪ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন তালিকাভুক্ত দুইজন শ্রমিক প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
(জ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার শ্রমিকের কল্যাণ কিংবা শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া থাকে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;
(ঝ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শ্রম আইনের ধারা ২১৪ উপ-ধারা (৭) এর অধীন তালিকাভুক্ত মালিক পক্ষের একজন প্রতিনিধি;
(ঞ) শ্রম আদালত আইনজীবী সমিতি কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সিনিয়র আইনজীবী, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
(ট) শ্রম আদালত আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সদস্য সমন্বয়ে শ্রম আদালত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একই পদবীর একাধিক ব্যক্তি থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি সদস্য হইবেন।
(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:
আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৮. শ্রম আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি
(১) শ্রম আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
(খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;
(গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
(ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
(গ) শ্রম আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ঘ) আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতার সম্পর্কে শ্রমিকগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ, প্রয়োজনে, বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য শ্রম আদালত কমিটি প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করিতে পারিবে।

১৯. চৌকি আদালত কমিটি

(১) প্রত্যেক চৌকি আদালতে অধিদপ্তরের একটি চৌকি আদালত কমিটি থাকিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলা বা উপজেলায় একাধিক চৌকি আদালত থাকিলে উক্ত চৌকি আদালতসমূহের জন্য একটি চৌকি আদালত কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন চৌকি আদালত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চৌকি আদালতে দায়িত্বরত বিচারক, যিনি ইহার চেয়ারম্যান হইবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক চৌকি আদালতের ক্ষেত্রে উক্ত আদালতসমূহে কমরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) একাধিক চৌকি আদালতের ক্ষেত্রে দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য বিচারকগণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট চৌকির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(ঙ) চৌকি আদালত আইনজীবী সমিতির সভাপতি;

(চ) সংশ্লিষ্ট চৌকির উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা);

(ছ) উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা;

(জ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ট) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত অথবা সহকারি সরকারি উকিল (Government Pleader) এবং একজন অতিরিক্ত অথবা সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর;

(ঠ) জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান;

(ড) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক;

(ঢ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উপজেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

(ণ) চৌকি আদালত আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সদস্য সমন্বয়ে চৌকি আদালত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একই পদবীর একাধিক ব্যক্তি থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি সদস্য হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:
আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

২০. চৌকি আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) চৌকি আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
(খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;
(গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
(ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
(ঙ) চৌকি আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;
(ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চৌকি আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ঙ) জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ, প্রয়োজনে, বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(চ) বোর্ড বা জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বিশেষ কমিটি প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করিতে পারিবে।

২১. উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি

(১) অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি একজন চেয়ারম্যান ও প্রবিধানা দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত অধিদপ্তরের উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি, সভার কার্য পদ্ধতি এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা, অপসারণ, পদত্যাগ ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২২. কমিটির সভাসমূহ

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিটিসমূহের সভা সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদের শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী ও মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ইত্যাদি

২৩. লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অফিসের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত করিতে পারিবে;

তবে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা জেলা কমিটির জন্য একাধিক লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হইলে সরকার, তাহাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কার্যপরিধি আলাদাভাবে নির্ধারণ করিয়া দিবে।

২৪. মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ, প্যানেলভূক্তি ইত্যাদি

(১) প্রচলিত বিভিন্ন আইনের অধীনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর, ধারা ৩৭ এর বিধান সাপেক্ষে মধ্যস্থতাকারীগণকে অ্যাক্রেডিটেশন বা সার্টিফিকেট প্রদান করিবে;

(২) অধিদপ্তর, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে মধ্যস্থতাকারী প্যানেল তৈরি করিবে। প্যানেল তৈরির সময় অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যস্থতা কার্যক্রমের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় মধ্যস্থতাকারী প্যানেলে মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

(৩) অধিদপ্তর, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অ্যাক্রেডিটেশন বা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীগণকে মধ্যস্থতা কার্যক্রমের নীতি-পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে। অ্যাক্রেডিটেশন বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোনো মধ্যস্থতাকারী ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ব্যতীত এই আইনের আওতায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করিতে পারিবে না।

২৫. আইনজীবী প্যানেল তৈরি

(১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি এই আইনের আওতায় মামলা পরিচালনার জন্য একটি করে পৃথক আইনজীবী প্যানেল তৈরি করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় সুপ্রীম কোর্ট কমিটির প্যানেলের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টে, জেলা কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতে, শ্রম আদালত কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতে এবং চৌকি আদালত কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চৌকি আদালতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এরূপ আইনজীবীগণের মধ্য হইতে প্যানেল তৈরি করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর আওতায় প্রণীত প্রত্যেক তালিকায় অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আইনজীবী, যদি উপযুক্ত পাওয়া যায়, রাখা হইবে।

(৪) কোনো বিচারপ্রার্থীর আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যদি কোনো ক্ষেত্রে, আইনগত সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো আইনজীবীকে এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীর পছন্দ, যতদূর সম্ভব, বিবেচনা করা হইবে।

২৬. কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ

(১) অধিদপ্তর এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মীমাংসা বা মধ্যস্থতার প্রয়োজনে কিংবা লিগ্যাল এইড অফিসারকে ভূমি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন সার্ভেয়ার বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিয়োগকৃত সার্ভেয়ার বা অন্য কোনো ব্যক্তি ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরি কোনো প্রতিবেদন কিংবা অন্য কোনো সহায়তা প্রদান করিলে প্রতিকার প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহার খরচ প্রদেয় হইবে এবং এরূপ খরচের পরিমাণ অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
লিগ্যাল এইড অফিসারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

২৭. লিগ্যাল এইড অফিসারের ক্ষমতা

(১) এই আইনের আওতায় লিগ্যাল এইড অফিসার মীমাংসা বা মধ্যস্থতার প্রয়োজনে উক্ত কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা পক্ষগণের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত এরূপ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিকে মধ্যস্থতা সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮. লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যাবলি

(১) লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে মামলা দায়ের কিংবা মামলা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা;

(খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীর আবেদন বা চাহিদা অনুযায়ী তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা বা আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রেরিত কোনো মামলা বা মামলার বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করা;

(ঘ) আইনগত সহায়তা প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ততা সাপেক্ষে বিরোধীয় যে বিষয়ে আপোশ-মীমাংসা কিংবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে আইনগত কোনো বাধা নেই সেরূপ বিরোধ মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;

(ঙ) ক্ষেত্রমত বোর্ড, অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মধ্যস্থতাকারী, মধ্যস্থতাকারীর কার্যপদ্ধতি এবং মধ্যস্থতা চুক্তি বলবৎকরণ

২৯. মধ্যস্থতাকারী

এই আইনের ধারা ২৪ এর অধীন অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী এবং ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসার মধ্যস্থতার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৩০. মধ্যস্থতাকারীর ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি

(১) ধারা ২৪ এর অধীনে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীগণ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মধ্যস্থতার জন্য প্রেরিত যেকোনো মামলা বা মামলার বিরোধীয় বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে পারিবেন;

(২) মধ্যস্থতার জন্য প্রেরিত যেকোনো মামলার ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যেরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন, মধ্যস্থতাকারীগণ সেরূপ পদ্ধতিতে মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তবে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মধ্যস্থতার জন্য কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া না দিলে সেইক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী এই আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন;

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে অধিদপ্তর, বিধি দ্বারা মধ্যস্থতাকারীর কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩১. মধ্যস্থতাকারীর স্থানীয় অধিক্ষেত্র

(১) যেক্ষেত্রে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মধ্যস্থতার জন্য কোনো মামলা বা বিরোধ মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ করিবে সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী উক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমার মধ্য থেকে উহা মধ্যস্থতা করিবেন;

তবে, পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে অন্য যে কোনো স্থানে মীমাংসা বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে;

(২) যেক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পূর্বে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এই আইনের ধারা ২৮ এর অধীনে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয় সেক্ষেত্রে তার এখতিয়ার সমগ্র জেলা ব্যাপী নির্ধারিত হইবে।

৩২. মধ্যস্থতার সময়সীমা

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মধ্যস্থতাকারী এই অধ্যাদেশের আইনের আওতায় মধ্যস্থতার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে। তবে পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে মধ্যস্থতার সময়সীমা আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন বৃদ্ধি করা যাইবে।

৩৩. মধ্যস্থতাযোগ্য মামলা ও বিরোধ

(১) এই আইনের ১ম তফসিলে বর্ণিত যেকোনো বিরোধ বা এতদ্‌সংক্রান্ত মামলা এই অধ্যাদেশের আওতায় মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে;

(২) এই আইনের ২য় তফসিলে বর্ণিত বিরোধ বা এতদ্‌সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা এই অধ্যাদেশের অধীনে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল উক্ত তফসিলভূক্ত কোনো অপরাধ বা এতদসংক্রান্ত মামলা মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ না করিলে মধ্যস্থতাকারী উহার মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করিতে পারিবে না।

(৩) সরকার প্রয়োজন মনে করলে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ম ও ২য় তফসিল সংশোধন করতে পারিবে।

৩৪. মধ্যস্থতাকারীর ফি ইত্যাদি

(১) পক্ষগণ ভিন্নভাবে সম্মত না হইলে বা প্রবিধানে ভিন্নতর কিছু নির্ধারিত না থাকিলে মধ্যস্থতাকারী ফি বা মধ্যস্থতার ব্যয় পক্ষগণ সমানভাবে বহন করিবে।

(২) এই আইনের উদেশ্যেপূরণকল্পে অধিদপ্তর, বিধি দ্বারা মধ্যস্থতাকারীর ফি এর পরিমাণ এবং ফি পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

৩৫. মধ্যস্থতা চুক্তি সম্পাদন

(১) এই আইনের আওতায় মেডিয়েটর মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোন মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তি করিলে উক্ত নিষ্পত্তির শর্তসমূহ চুক্তি আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(২) মধ্যস্থতা চুক্তি অবশ্যই লিখিত এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইবে;

(৩) মধ্যস্থতা চুক্তি অবশ্যই পক্ষগণসহ মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে;

(৪) মধ্যস্থতা চুক্তি মূল চুক্তিপত্রের অতিরিক্ত কোনো শর্ত বা অংশ অথবা পৃথক চুক্তি আকারে প্রণয়ন করা যাইবে;

৩৬. মধ্যস্থতা চুক্তি বলবৎকরণ

(১) মধ্যস্থতার মাধ্যমে তৈরিকৃত, পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রতিটি চুক্তি চূড়ান্ত এবং পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হইবে। যে কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে এরূপ চুক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে বলবৎযোগ্য হইবে।

(২) মধ্যস্থতার ফলে উদ্ভূত সকল চুক্তি The Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধান অনুসারে এরূপভাবে বলবৎযোগ্য হইবে যেন এটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা রায়।

(৩) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেরূপ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার মাধ্যমে উদ্ভূত সমঝোতা চুক্তিটি কোনো পক্ষ কর্তৃক প্রতারণা (Fraud), দুর্নীতি (Corruption), মিথ্যা বা ভূয়া

পরিচয়দানের (Impersonation) মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যেকোনো পক্ষ উক্ত চুক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
মধ্যস্থতাকারীর অ্যাক্রেডিটেশন ইত্যাদি

৩৭. মধ্যস্থতাকারীকে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর, পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি ও তালিকাভূক্তির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

৩৮. অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন

(১) মধ্যস্থতাকারী হতে ইচ্ছুক আবেদনকারীগণের আবেদন যাচাই বাছাই, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান বা তালিকাভুক্তির জন্য 'অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকিবে, যা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ

(ক) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতি হইবেন;

(খ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

(গ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(ঘ) সেক্রেটারি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

(ঙ) মহা-পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

কমিটির সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি, অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া, সার্টিফিকেট প্রাপ্তির শর্তাবলি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৯. প্যানেলভুক্ত মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীর মেয়াদ

অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণের লাইসেন্সের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ৩ (তিন) বছর হইবে। উক্ত মেয়াদান্তে তাহাদের লাইসেন্স বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনরায় নবায়ন করা যাইবে।

৪০. অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ

অধিদপ্তর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত যেকোনো মধ্যস্থতাকারীর লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা

৪১. বাজেট

অধিদপ্তর প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে অধিদপ্তরের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

৪২. অধিদপ্তরের তহবিল

(১) লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর তহবিল নামে অধিদপ্তরের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোনো বিদেশি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) অধিদপ্তরের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এবং

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক অন্য যে কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ অধিদপ্তরের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে, প্রয়োজন অনুসারে, ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি, চৌকি আদালত কমিটিকে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারের নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং কমকর্তা-কর্মচারিগণের বেতন-ভাতা, পারিশ্রমিক, সম্মানি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে

৪৩. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটির তহবিল

(১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি বা কমিটিসমূহের নামে পৃথক একটি করে তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলসমূহে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটির তহবিলের অর্থ রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের নিকটবর্তী কোনো শাখায় জমা রাখা হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সদস্য সচিব ও চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অপর একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে। জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি বা কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিল হইতে মঞ্জুরিকৃত আবেদন বা দরখাস্ত অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

৪৪. হিসাব ও অডিট

(১) বোর্ড, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং শ্রম আদালত ও চৌকি আদালত কমিটি উহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাববহি প্রচলিত আইন অনুসরণক্রমে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর অধিদপ্তরের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিবেন;

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অধিদপ্তরের সকল রেকর্ড দলিল-দস্তাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং যে কোনো সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৪৫. আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন

(১) এই আইনের অধীন আইনগত সহায়তার জন্য সকল আবেদন ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে উহা মঞ্জুরির জন্য সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী উক্তরূপ সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৬. দলিলপত্র, কাগজাদি, ইত্যাদির কপি সরবরাহ

আইনগত সহায়তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী বরাবরে আদালত, কোর্ট ফি ছাড়া, বিনামূল্যে মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, দলিলপত্র, ইত্যাদির কপি সরবরাহ করিবে।

৪৭. প্রতিবেদন

(১) সরকার অধিদপ্তরের নিকট হইতে যে কোনো সময় উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং অধিদপ্তর উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফরমে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি এবং চৌকি আদালত কমিটি উহার সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান সম্বলিত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৮. লিগ্যাল এইড অফিসার কে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

লিগ্যাল এইড অফিসার এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা কোনো ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে

পারিবে এবং তদানুসারে সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

৪৯. সরকারি কর্মচারি

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা কর্মচারিগণ এই আইন বা তৎঅধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী কার্য করিবার সময়, তাহার পক্ষে বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫০. সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ

এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে (in good faith) কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহা-পরিচালক বা অধিদপ্তরের অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫১. অসুবিধা দূরীকরণ

এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান ও উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫২. বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, মহাপরিচালক, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও পরিপত্র জারি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া অধিদপ্তর তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের যে কোনো অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন করিবে।

৫৩. ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

৫৪. রহিতকরণ ও হেফাজত

(১) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই;

(গ) প্রণীত আদেশ, নির্দেশাবলি বা প্রজ্ঞাপন এই আইনের অধীন নূতনভাবে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ পূর্বের ন্যায় এমনভাবে চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

(৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বিলুপ্ত হইবে, এবং বিলুপ্ত সংস্থার-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বিশেষ অধিকার এবং ভূমি, ইমারত, নগদ স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাববহি, নিবন্ধনবহি, নথিপত্রসহ সকল দলিলপত্র অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে; এবং

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে অধিদপ্তরের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম তফসিল

১. দেওয়ানি প্রকৃতির যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;

২. চুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;

৩. বাণিজ্যিক লেনদেন হতে সৃষ্ট যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;

৪. পারিবারিক আদালত আইন ২০২৩ এর অধীন পারিবারিক মোকদ্দমা;

৫. বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ এর অধীন মোকদ্দমা;

৬. The Partition Act, 1893 এর অধীন বন্টন মোকদ্দমা;

৭. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ধারা ৯৬ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত;

৮. Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর ধারা ২৪ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত;

৯. মুসলিম শরীয়া আইনের অধীন অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমা;

১০. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ১২, ১৩, ২১, ২১ক, ২২ ও ২৩ এর অধীন মোকদ্দমা;

১১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২১০ অনুযায়ী উত্থিত শিল্প বিরোধ;

১২. পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে পিতা-মাতার ভরণপোষণ সংক্রান্ত দাবি;

১৩. ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন ২০১০ এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী শিল্প বিরোধ এবং ধারা ৪৩ অনুযায়ী ধর্মঘট বা লক আউট;
১৪. অর্থঋণ আদালত ২০০৩ এর ধারা ২২ ও ২৩ অনুসারে অর্থঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি;
১৫. দেউলিয়া বিষয়ক আইন ১৯৯৭ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী দেনাদার ও দেনার দায় মেটানো সংক্রান্ত বিষয়।

দ্বিতীয় তফসিল

১. The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ৩৪৫ এর অধীন আপোশযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ;
২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীন পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধ;
৩. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ;
৪. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন ধারা ৩২, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ এর অপরাধ;
৫. বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭ এবং ৪০ এর অধীন অপরাধ;
৬. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৭, ৮৯ ও ৯২ এর অধীন অপরাধ;
৭. ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭, ৯, ১০ ও ১৩ এর অধীন অপরাধ।

পরিশিষ্ট ৬

কমিশনের তিন জন সদস্যের ভিন্নমত

তারিখঃ ২৯/০১/২০২৫

মাননীয় কমিশন প্রধান
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।

বিষয়ঃ কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন বিগত ১২/১২/২০২৪ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা বরাবর প্রেরিত প্রাথমিক প্রতিবেদনে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রকাশ করেছে এবং কমিশন চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সামগ্রিক বিষয়ের উপর বিস্তারিত রূপরেখা দেয়ার কাজ করছে। কমিশনের কাঠামো অনুসারে অ্যাটর্নিদের জন্য পৃথক একটি সার্ভিস গঠিত হবে এবং জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের ন্যায় তাদের পৃথক বেতন কাঠামো হবে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগ প্রদান করা হবে। তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্যগণের জন্য সুযোগ থাকবে। এ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে যা ইতোমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। অপরদিকে প্রাথমিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার-কর্মবিভাগে নিয়োজিত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আনুপাতিক হার উল্লেখ করা হয়নি।

উপরোক্ত বিষয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী (১) বিচারপতি ফরিদ আহমদ শিবলী (২) মাসদার হোসেন এবং (৩) সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, সদস্য- বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, গত ২৩/০১/২০২৫ তারিখে আমাদের লিখিত মতামত মাননীয় কমিশন প্রধান বরাবর প্রদান করি যা, কমিশনের সচিব গত ২৬/০১/২০২৫ তারিখে গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত মতামতের ধারাবাহিকতায় আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ একই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের মতামত পুনরায় ব্যক্ত করছিঃ

১. **অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান সংশোধন**

১.১ আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তবে, প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগকৃত সদস্যদের যোগ্যতা, কাজের মান ও দক্ষতাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও

মূল্যায়ন না করে উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মুহূর্তে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধান সংশোধনের যে কোনো ধরণের প্রস্তাব প্রেরণ করা সমীচীন হবে না। কারণ অ্যাটর্নি সার্ভিস অস্তিত্বমান হওয়ার পূর্বেই উক্ত সার্ভিসের সদস্যগণকে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে একটি অপরিপক্ক প্রস্তাব।

১.২ সরকারি কর্ম কমিশনের পরিবর্তে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্য নিয়োগ এবং এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি করতঃ 'লিগ্যাল এন্ড বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন' নামকরণ কোনো অবস্থাতেই বাস্তবসম্মত নয়। সর্বোপরি এরূপ উদ্যোগ মাসদার হোসেন মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপন্থী।

১.৩ বিচার-কর্মবিভাগে নিয়োজিত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্যগণ সরকার পক্ষের আইনজীবী হিসেবে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবেন। উভয়ের পদমর্যাদা, বেতন কাঠামা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কখনোই একই রূপ বা একই ধরণের হতে পারে না। সমান্তরাল কাঠামোবিশিষ্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় তা কার্যকর ও টেকসই হবে না।

১.৪ আমরা মনে করি প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসকে এ মুহূর্তে সাংবিধানিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করার ন্যূনতম যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। জনমত জরিপ বা অংশীজনের মতবিনিময় সভায় এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। নিঃসন্দেহে এরূপ অন্তর্ভূক্তি আইন ও বিচারাঙ্গণে নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের সংবিধানে অ্যাটর্নি সার্ভিসকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। একটি সার্ভিস সৃষ্টি হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি নিরীক্ষণ, নিয়োগকৃত সদস্যদের যোগ্যতা, কাজের মান ও দক্ষতা মূল্যায়ন না করে এটি অস্তিত্বমান হওয়ার পূর্বেই সংবিধানের মত দেশের সর্বোচ্চ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা আদৌ সমীচীন হবে না।

১.৫ সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের মতামত হলো, ২০০৮ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮** নামে যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি হয়েছিল, সেটির কাঠামো ও নিয়োগ বিধান অনুসরণ করে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নতুন আইন প্রণয়ন করা হলে তা অধিকতর সময়োপযোগী ও কার্যকর হবে।

২. হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ

২.১ হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণ সবসময় উপেক্ষিত হয়ে আসছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে ৯ ধাপ মিলে মোট ৯২ জন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬২ জন আইনজীবী এবং ৩০ জন বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য। অর্থ্যাৎ বিগত ১৫ বছরে নিয়োগকৃত বিচারকের মধ্যে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণের মধ্য হতে নিয়োগ হয়েছে মাত্র ৩৩%। এটি স্পষ্টতই একটি বৈষম্য। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট মতামত হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেট এবং বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণের অনুপাত ৫০:৫০ নির্ধারণ করতে হবে।

২.২ হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য কম হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আপীল বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে অধস্তন আদালতের কেউই থাকেন না। আপীল বিভাগকে কোনো অবস্থাতেই বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যশূন্য করা সমীচীন হবে না। এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে কর্মরত বিচার-কর্মবিভাগের ন্যূনতম একজন সদস্যকে আপীল বিভাগে নিয়োগের বিধান অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ কমিশনের বিভিন্ন সভায় আমরা উত্থাপন করেছি এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি। বর্তমানে আমরা লিখিতভাবে এই বিষয়ে পুনরায় মতামত ব্যক্ত করছি।

<u>৩. সুপারিশ</u>

১. ২০০৮ সালে অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **<u>সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮</u>** নামে যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি হয়েছিল, সেটির কাঠামো ও নিয়োগ বিধান অনুসরণ করে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২. প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগকৃত সদস্যদের যোগ্যতা, কাজের মান ও দক্ষতাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন না করে উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মুহূর্তে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন তথা বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের কোনো ধরণের প্রস্তাব প্রেরণ করা সমীচীন হবে না।

৩. সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৪. হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেট এবং বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণের অনুপাত ৫০:৫০ নির্ধারণ করতে হবে।

৫. হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে কর্মরত বিচার-কর্মবিভাগের ন্যূনতম একজন সদস্যকে সর্বদা আপীল বিভাগে নিয়োগের বিধান প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত করতে হবে।

৬. পৃথক অ্যাটর্নি সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা যেন জেলা পর্যায়ে বিচারকদের সমান বা বেশি না হয় বা উক্ত সার্ভিসের মাধ্যমে বিচারকদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন না হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের উপরোল্লিখিত মতামত ও সুপারিশসমূহ কমিশনের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করার অনুরোধ করছি।

(বিচারপতি ফরিদ আহমদ শিবলী)	(মাসদার হোসেন)	(সৈয়দ আমিনুল ইসলাম)
সদস্য	সদস্য	সদস্য
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।

পরিশিষ্ট ৭
প্রশ্নমালা: সাধারণ নাগরিক

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় আপনি কোন ভাষায় চান?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. আদালতের রায় আপনি কতটুকু বুঝতে পারেন?

- ☐ আদালতের রায় সহজে বুঝা যায়
- ☐ আদালতের রায় দুর্বোধ্য

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. আদালতের কর্মচারিদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সৎ এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণ কতটুকু অনুকূল?

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. আদালত কক্ষ কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালত কক্ষ মামলার পক্ষ, সাক্ষী, আইনজীবী, বিচারক সবার জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত কক্ষে অনেক ভীড়
- ☐ মামলার পক্ষ কিংবা সাক্ষীদের জন্য আদালত কক্ষ অনুকূল নয়
- ☐ আদালত কক্ষে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই
- ☐ আদালত কক্ষে নিরাপত্তার অভাব আছে

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আদালতের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে আপনার মতামত কী? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ রায় খুব সহজে বাস্তবায়িত হয়

☐ রায় বাস্তবায়িত হয় না

☐ রায় বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লাগে

☐ রায় বাস্তবায়নে হয়রানির শিকার হতে হয়

☐ রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

১৭. মামলার আইনজীবী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ আইনজীবী সঠিক ভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন

☐ আইনজীবী মামলা পরিচালনায় অবহেলা করেন

☐ আইনজীবী অযথা সময় নষ্ট করেন

☐ আইনজীবী বেশি টাকা চান

☐ আইনজীবী সঠিকভাবে মামলা সম্পর্কে অবহিত করেন না

অন্য কোন মন্তব্য:

১৮. মামলার সাক্ষী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ মামলার সাক্ষী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট

☐ কেউ সহজে সাক্ষী হতে চায় না

☐ আইনজীবী সময় মতো সাক্ষী হাজির করতে পারেন না

☐ অনেক সময় সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া যায় না

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. মামলা ও আদালতের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কতটুকু?

☐ আমার মোটামুটি ধারণা আছে

☐ আমার ভাল ধারণা আছে

☐ আমি একদমই বুঝি না

অন্য কোন মন্তব্য:

২০. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সংস্কারে আপনার কোন প্রস্তাব থাকলে লিখুন:

পরিশিষ্ট ৮
প্রশ্নমালা: বিজ্ঞ বিচারক

প্রশ্নমালা: প্রথম অংশ

অনুগ্রহ করে নিচের বিবৃতিগুলোর সাথে আপনি কতটুকু একমত বা একমত নন তা নির্দেশ করুন। নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসারে এমনভাবে বৃত্ত ভরাট করুন যাতে আপনার মতামত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণঃ একেবারেই একমত না হলে ①, সম্পূর্ণ একমত হলে ⑩ এবং নিরপেক্ষ হলে ⑤এর বৃত্ত ভরাট করুন।

একেবারেই একমত নই **সম্পূর্ণ একমত**

১. বর্তমানে বিচারকরা যেকোন প্রভাবমুক্ত থেকে শুধুমাত্র আইন ও বিবেক অনুসারে বিচার করতে পারেন:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২. বিচারযোগ্য যেকোন আইনি বিষয় (যেমন: টর্ট) নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৩. বিচার প্রক্রিয়ায় নির্বাহী বিভাগের অযাচিত হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৪. বিচারকদের প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা পর্যাপ্ত:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৫. বিচারকদের প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা কার্যকর:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৬. বিচারিক কার্যক্রমে আধুনিক বিষয়াদি যেমন, ফরেনসকি সায়েন্স, ডিজিটাল এভিডেন্স, মামলা ব্যস্থাপনা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৭. বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আদালতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৮. এজলাসের ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জাম আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৯. আদালতে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১০. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সংখ্যা পর্যাপ্ত:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১১. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১২. বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৩. বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৪. বিচারকদের বদলির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ স্বাধীন:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৫. বিচারকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ স্বাধীন:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৬. বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৭. বিচারিক বিষয়ে অধঃস্তন আদালত উচ্চ আদালতের রায় ও আদেশ সঠিকভাবে অনুসরণ করে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৮. মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশনা সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৯. বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন-বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন/নির্বাহী বিভাগ বিচারকদের মতামত গ্রহণ করে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২০. বিচার বিভাগের জন্য বর্তমান বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২১. বিচারকদের বর্তমান বেতন কাঠামো সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২২. বিচারকদের আবাসন ব্যবস্থাদি সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৩. বিচারকদের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৪. আদালতের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৫. আদালত ও বিচারকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৬. আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ও নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৫. আদালতের সার্বিক অবস্থা নারী বিচারকদের জন্য অনুকূল:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৭. আদালত পরিচালিত মেডিয়েশন কার্যক্রম সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৮. পারিবারিক আদালতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সন্তোষজন:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২৯. বিচারক-আইনজীবীর মধ্যকার অপ্রীতিকর ঘটনা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৩০. আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৩১. অধঃস্তন আদালতের উপর জেলা জজ এবং হাইকোর্টের নজরদারি সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

প্রশ্নমালা: দ্বিতীয় অংশ

নিচের প্রশ্নমালার উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিয়ে এবং আপনার মন্তব্য দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
- ☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
- ☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সৎ এবং সথেষ্ট সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের নিয়োগ কিভাবে হওয়া উচিত?

- ☐ জেলা জজ নিয়োগ দেবেন
- ☐ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে
- ☐ আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণ কতটুকু অনুকূল?

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ আইনজীবী
- ☐ বিচারক
- ☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ

- ☐ মামলার পক্ষ
- ☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৭. দেওয়ানী মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণপূর্বক দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে কিরূপ পদক্ষেপ প্রয়োজন?

- ☐ দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন
- ☐ অধিক সংখ্যক আদালত সৃষ্টি
- ☐ পুরনো দেওয়ানী আইনসমূহের সংস্কার
- ☐ আইনজীবীর মানসিকতার পরিবর্তন
- ☐ বিচারকের মানসিকতার পরিবর্তন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৮. ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে কিরূপ পদক্ষেপ প্রয়োজন?

- ☐ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থার সৃষ্টি
- ☐ অধিক সংখ্যক আদালত সৃষ্টি
- ☐ ফৌজদারী আইনের সংস্কার
- ☐ সরকারি স্বাক্ষী হাজিরের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাড়াতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. আদালতের অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কিরূপ?

- ☐ পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই
- ☐ বরাদ্দ মোটামুটি আছে, তবে সময় মতো পাওয়া যায় না
- ☐ প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ অতি নগণ্য
- ☐ বরাদ্দ চাইলেও পাওয়া যায় না

অন্য কোন মন্তব্য:

২০. বর্তমানে বিচারকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন

- ☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোটামুটি পর্যাপ্ত
- ☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত
- ☐ অপর্যাপ্ত নিরাপত্তার কারণে বিচারকগণ হুমকির শিকার হন
- ☐ বিচারক ও আদালতের নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

২১. আপনার অন্য কোন মতামত:

পরিশিষ্ট ৯
প্রশ্নমালা: বিজ্ঞ আইনজীবী

প্রশ্নমালা: প্রথম অংশ

অনুগ্রহ করে নিচের বিবৃতিগুলোর সাথে আপনি কতটুকু একমত বা একমত নন তা নির্দেশ করুন। নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসারে এমনভাবে বৃত্ত ভরাট করুন যাতে আপনার মতামত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণঃ একেবারেই একমত না হলে ①, সম্পূর্ণ একমত হলে ⑩ এবং নিরপেক্ষ হলে ⑤এর বৃত্ত ভরাট করুন।

একেবারেই একমত নই **সম্পূর্ণ একমত**

১. বর্তমানে বাংলাদেশে অধঃস্তন আদালতের আইনজীবী নিবন্ধনের শর্তাবলি সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২. বর্তমানে বাংলাদেশে অধঃস্তন আদালতের আইনজীবী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৩. বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের আইনজীবী নিবন্ধনের শর্তাবলি সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৪. বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের আইনজীবী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৫. বর্তমানে বাংলাদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণ বিষয়ে তদন্ত/ব্যবস্থাগ্রহণ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৬. বিচারক-আইনজীবীর মধ্যকার অপ্রীতিকর ঘটনা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৭. আদালত ও জনবান্ধব আইনজীবী তৈরিতে বর্তমান আইন শিক্ষা কাঠামো কার্যকর:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৮. আইনজীবী নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং আচরণগত শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভূমিকা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

৯. বার এসোসিয়েশনগুলো আইনজীবীদের পেশাগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১০. বিচারিক কার্যক্রমে আধুনিক বিষয়াদি যেমন, ফরেনসকি সায়েন্স, ডিজিটাল এভিডেন্স, মামলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১১. আদালতের পরিবেশ এবং আইনপেশা নারীবান্ধব:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১২. বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আদালতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৩. এজলাসের ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জাম আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৪. আদালতে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৫. আদালতের সাক্ষ-প্রমাণ, নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি নিরাপদঃ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৬. আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৭. আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৮. আদালতে বিচারক সংখ্যা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

১৯. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সংখ্যা পর্যাপ্ত:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

২০. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

প্রশ্নমালাঃ দ্বিতীয় অংশ

নিচের প্রশ্নমালার উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে এবং আপনার মন্তব্য দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুনঃ

১. **বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:**

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)**

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
- ☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
- ☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. আদালতের কর্মচারিদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সৎ এবং সথেষ্ট সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. ঢাকার বাইরেও হাই কোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাই কোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাই কোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাই কোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণ কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ আইনজীবী
- ☐ বিচারক
- ☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ
- ☐ মামলার পক্ষ
- ☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আপনার মতে মামলার বিলম্ব/দীর্ঘসূত্রিতার কারণ কী?

১৭. সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৮ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের বদলির বিধান থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কি?

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. আদালতের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে লিখুন:

২০. আপনার অন্য কোন মতামত:

পরিশিষ্ট ১০
প্রশ্নমালা: সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী

প্রশ্নমালা: প্রথম অংশ

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী নিবন্ধের শর্তাবলি সন্তোষজনক কি?

সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী নিবন্ধের প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কি?

২. হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক সংখ্যা কি সন্তোষজনক?

৩. আপিল বিভাগে বিচারক সংখ্যা কি সন্তোষজনক?

৪. হাইকোর্ট বিভাগে বেঞ্চগঠন প্রক্রিয়া কি একটি নীতিমালার অধীনে হওয়া উচিত?

৫. আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা প্রকাশের বর্তমান প্রক্রিয়া কি সন্তোষজনক?

৬. আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা প্রকাশের বর্তমান প্রক্রিয়ার উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে লিখুন:

৭. হাইকোর্টে বর্তমানে প্রচলিত মেনশন সিস্টেম কি সন্তোষজনক?

৮. ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে মেনশন স্লিপ দাখিলের প্রয়োজন আছে কি?

৯. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের (ইন্টেরিম অর্ডার) মেয়াদবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাইজেশন প্রয়োজন আছে কি?

১০. মোশন বেঞ্চে মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানির প্রয়োজন আছে কি?

১০. লিখিত আদেশ/রায় প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা উচিত কি?

১১. আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আরো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কি?

১২. বিচারকদের বিষয়ে সঙ্গত অভিযোগ জানানোর কোন স্থায়ী ও সহজ প্রক্রিয়া থাকা উচিত কি?

১৩. সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণ বিষয়ে তদন্ত/ব্যবস্থাগ্রহণ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কি?

১৪. বিচারক-আইনজীবী অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিরসনে বার এসোসিয়েশন/কাউন্সিল যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি?

১৫. সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন আইনজীবীদের পেশাগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে কি?

১৬. আইনজীবী নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং আচরণগত শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভূমিকা কি সন্তোষজনক?

১৭. সুপ্রিম কোর্টে মামলার জট কমাতে আপনার সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব থাকলে লিখুন:

১৮. সুপ্রিম কোর্টের পরিবেশ এবং আইনপেশা নারীবান্ধব কি?

১৯. বিচারিক কার্যক্রমে আধুনিক বিষয়াদি যেমন, ফরেনসিক সায়েন্স, ডিজিটাল এভিডেন্স, মামলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি?

২০. এজলাস কি আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

২১. সুপ্রিম কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক কি?

২২. আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু নিরাপদ?

প্রশ্নমালা: দ্বিতীয় অংশ

নিচের প্রশ্নমালার উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে এবং আপনার মন্তব্য দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত

- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (এটর্নি, পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
- ☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
- ☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারিদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সৎ এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আদালতের ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণ কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে

☐ আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত

☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন না

☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে

☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

☐ আইনজীবী

☐ বিচারক

☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ

☐ মামলার পক্ষ

☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আপনার মতে মামলার বিলম্ব/দীর্ঘসূত্রিতার কারণ কী?

১৭. সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৮ সুপ্রিম কোর্টের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে লিখুন:

১৯. আপনার অন্য কোন মতামত:

পরিশিষ্ট ১১
প্রশ্নমালা: সহায়ক কর্মচারি

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা

☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

☐ নারীবান্ধব

☐ নারীবান্ধব নয়

☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত

☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে

☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে

☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে

☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক

☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত

☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. আপনার দায়িত্ব পালনে প্রধান অন্তরায় কী (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ পর্যাপ্ত দাপ্তরিক উপকরণ নেই

☐ মামলার সংখ্যা খুব বেশি

☐ মামলার পক্ষদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর চেষ্টা

☐ দপ্তরে স্থান সংকুলান হয় না

☐ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব

☐ নিরাপত্তার অভা

☐ সমন্বয়ের অভাব

☐ অপ্রতুল কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ সংখ্যায় অপ্রতুল

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের নিয়োগ কিভাবে হওয়া উচিত?

- ☐ জেলা জজ নিয়োগ দেবেন
- ☐ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে
- ☐ আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণ কতটুকু অনুকূল?

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনার অভিমত কী?

- ☐ প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত
- ☐ প্রশিক্ষণ হয় না বললেই চলে
- ☐ প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু নিরাপদ?

- ☐ পুরোপুরি নিরাপদ
- ☐ মোটামুটি নিরাপদ
- ☐ একদমই নিরাপদ নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৭. এজলাস কতটুকু নিরাপদ?

☐ পুরোপুরি নিরাপদ

☐ মোটামুটি নিরাপদ

☐ একদমই নিরাপদ নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৮. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

☐ আইনজীবী

☐ বিচারক

☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ

☐ মামলার পক্ষ

☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সাথে আইনজীবী সহকারিদের সম্পর্ক কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

☐ সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক

☐ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

☐ অসহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক

☐ পারস্পরিক সন্দেহমূলক সম্পর্ক

অন্য কোন মন্তব্য:

২০. নারী স্টাফদের জন্য আদালতের কর্মপরিবেশ কতটুকু অনুকূল?

☐ পুরোপুরি অনুকূল

☐ মোটামুটি অনুকূল

☐ একদমই অনুকূল নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

আপনার অন্য কোন মতামত:

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

৩১ জানুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কার্যালয়
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০